ইতিহাস

দ্বি-বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -১

Historiography in Theory and Practice

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৫) ডঃ বিদ্যুৎ পাতর সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) অধ্যাপক তপতী চক্রবর্তী (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) -সদস্য।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,

শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ বিদ্যুৎ পাতর (সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২১ ।

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

SEMESTER- 1

COR-101	4 CREDITS	100 MARKS	120 HOURS

COR-101: Historiography in Theory and Practice

BLOCK-1: Meaning, scope and importance of History

Unit-1: Meaning and Scope of History.

Unit-2: Truth, Fact and Evidence

BLOCK-2: Objectivities and bias in History; Causation in History

Unit-3: Causation.

Unit-4: Objectivity and bias in History

BLOCK-3: History and its auxiliary subjects: Is history a science, social science, or Arts?

Unit-5: History and Sciences

Unit-6: History and its auxiliary disciplines.

BLOCK-4: Major Theories of Historical Writing

Unit-7: Cyclical, Comparative, Positivist.

Unit-8: Marxist, Post-Marxist.

Unit-9: Post-modernist.

BLOCK-5: Major Thinkers

Unit-13: Von Ranke (1795-1886), Oswald Spengler (1880-1936), Marc Bloch (1886-1944),

Arnold Toynbee (1889-1975).

Unit-14: F.Braudel (1902-85), E.Hobsbawm (1917-2012), E.P.Thompson (1924-93).

BLOCK-6: Themes in Indian History

Unit-15: Dalit, Gender, New Cultural Histories and HISTEM.

Unit-16: Significance of regional History.

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক ১

Meaning and Scope of History

বিন্যাসক্রম ঃ

উপ-একক - ১

১.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.১.১.১ ঃ সূচনা

১.১.১.১.২ ঃ ইতিহাসের সংজ্ঞা

১.১.১.১.৩ ঃ ইতিহাসের স্বরূপ ও আলোচনার পরিধি

১.১.১.১.৩.১ ঃ ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে ও পরে ইতিহাসের স্বরূপ

১.১.১.১.৩.২ ঃ ঊনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

১.১.১.১.৪ ঃ উপসংহার

১.১.১.১.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.১.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

১.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.১.২.১ ঃ ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

১.১.১.২.২ ঃ উপসংহার

১.১.১.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.১.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

Meaning and Scope of History

১.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) 'ইতিহাস' কি বা 'ইতিহাস' বলতে কি বোঝায় — ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে জটিলতা ও সমস্যার কারণ।

(২) ইতিহাসের স্বরূপ ও পরিধি—যুগে যুগে এই পরিধির সম্প্রসারণ।

(৩) ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগের পূর্বে ও পরে ইতিহাসের প্রকৃতি।

(৪) উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব।

১.১.১.১.১ ঃ সূচনা

ইতিহাস শব্দটি এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দ থেকে। এর অর্থ হল ঃ ''অতীতে যা ঘটেছে''। ইংরেজী 'History' অর্থে 'ইতিহাস' কথাটি ব্যবহার করা হয়। History শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রীক 'Historia' শব্দ থেকে। 'Historia' শব্দটির অর্থ হল 'সযত্ন অনুসন্ধান'। ইতিহাসের জনক বলে পরিচিত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস প্রথম 'History' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর পর থেকেই এই শব্দটি প্রচলিত হয়ে আসছে।

লাতিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রীক 'Historia' শব্দ অর্থাৎ 'সযত্ন অনুসধান' এই দুই থেকেই 'History' শব্দটির উৎপত্তি।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের অর্থ কি?

২। 'History' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

১.১.১.১.২ ঃ ইতিহাসের সংজ্ঞা

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস কি? ইতিহাস কাকে বলে? নিছক অতীতের কাহিনীকেই কি ইতিহাস বলা যাবে? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞা বা প্রকৃতি কি? এই বিষয়ের সন্ধান মনে হয় অন্তহীন। ইতিহাসের প্রকৃতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও উপকারিতার বলয় নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কোনো সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবেত্তা নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হন। তাঁদের লেখনীতে

ইতিহাস কি? ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞাই বা কি? এই সব বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোন একটি একক লেখায় পাওয়া যায় না। কারণ এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পেতে হলে ইতিহাস নিয়ে আরো অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বিষয়টির বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ লাভ করে। এ অভিমতসমূহ পৃথক পৃথকভাবে একদিকে যেমন আমাদের বিষয়ে আংশিক ধারণা দেয়, অন্যদিকে এগুলো আবার বিষয়টির উপর সমকালীন ভাব ও চিন্তাজগতের ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনও বটে। কিন্তু বর্তমানকালে ইতিহাস বলতে আমরা যা বুঝি তার সামগ্রিক প্রকাশ কোনো একক লেখায় পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব ইতিহাস বিষয়ে আধুনিক ধারণা নিতে হলে নানা অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইতিহাসের সঠিক ব্যাখ্যা বা নিখুঁত সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা ও অসুবিধা রয়েছে। এইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, ''To define history definitely or accurately is a preposterous proposition.''

ইতিহাসের চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণে যে অতীতে কখনো সম্ভব হয়নি বা ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা কম, তার জন্য দায়ী অনেক কারণ হয়েছে। প্রথমতঃ ইতিহাসের লক্ষ্য বা আদর্শের প্রকৃতি ঘন ঘন পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের বিষয়বস্তু, আলোচনার সীমা থেমে থাকে না, তা অনবরত সম্প্রসারিত হতে থাকে। প্রথম কারণটির ব্যাখ্যা করলে বলা যায়, ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা কখনই একমত হতে পারেননি। এর কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের লক্ষ্য ও আদর্শেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আবার ইতিহাসের লক্ষ্যও বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে পৃথক পৃথকভাবে ধরা দিয়েছে। দ্বিতীয় কারণের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়, ইতিহাসের বৌদ্ধিক সীমার মধ্যে যে সব বিষয় পড়ে, তাদের সংখ্যা বা আলোচ্য বিষয় কখনই অটুট থাকতে পারে না। কারণ যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুরোনো বিষয় নতুন আঙ্গিকে বা নতুন অনেক বিষয় ইতিহাসের আলোচনায় ঢুকে পড়ে এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব নানা সমস্যা ও জটিলতা ইতিহাসের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

যেহেতু ইতিহাসের লক্ষ্য, আদর্শ, বিষয়বস্তু ও আলোচনার সীমা সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে সেহেতু এর সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের প্রকৃত সংজ্ঞা কি?

২। ইতিহাসের চূড়ান্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে না পারার দুটি কারণ কি?

১.১.১.১.৩ ঃ ইতিহাসের স্বরূপ ও আলোচনার পরিধি

তবুও বিগত বিভিন্ন শতাব্দীতে প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ অতীতের নানা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তাদের যে সব মতামত ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের উপহার দিয়েছেন, সেগুলোর আলোচনা থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ধরা যাবে। যদিও এই মতামতের ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য ও চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তথাপি তাদের মতামত ও সংজ্ঞাগুলিকে একত্রিত করলে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্ক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে ইতিহাসের ব্যাপক

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে ইতিহাসের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ইতিহাসের সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে ইতিহাসকে মূলতঃ মানুষের কাহিনী বলেই মনে করেন। কিন্তু এই সরল ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। বিষয়টি সম্পর্কে আরো গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তবেই আমরা ইতিহাসকে সঠিকভাবে জানতে পারব।

বৈচিত্র্য সম্পর্কেও ধারণা গঠন করা সম্ভব হতে পারে। ইতিহাসের সরল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেকে তাকে মূলত মানুষের কাহিনী বলেই মনে করেছেন। কারণ তাদের মতে, মানুষই ইতিহাসের মূল নায়ক এবং তাদেরকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের যাবতীয় গঠনা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য এই সরল ব্যাখা যথেষ্ট নয়। আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা বা আলোচনার বিষয়বস্তুকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ এই সংজ্ঞাগুলির সতর্ক বিবেচনার মাধ্যমেই একমাত্র জ্ঞানলাভ করা সম্ভব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কে, যার সাহায্যে ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে লক্ষ্য বা বিবেচনা করেছেন।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের মূল নায়ক কারা?

২। ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা কিভাবে সম্ভব?

কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইতিহাসের শিক্ষামূলক বা উপদেশমূলক ভূমিকাটির উপর গুরত্ব আরোপ করেছেন। ডায়োনিসিয়াস সুপ্রাচীনকালেই ইতিহাসের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, ''History is philosophy drawn from examples''। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করা দার্শনিক শিক্ষাই হলো ইতিহাস। ডায়োনিসিয়াস মনে করতেন ইতিহাস একান্তভাবেই শিক্ষামূলক ও নীতিবিরোধসংক্রান্ত মূল্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আবার ফ্রান্সিস বেকন ইতিহাসের পাঠ থেকে জ্ঞানার্জন, সংযম বা পরিমিতিবোধ লাভের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, ''History is a discipline which makes man wise.'' অর্থাৎ ইতিহাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা বা মানুষকে জ্ঞানী করে। তাঁর মতে, এই জ্ঞান ইতিহাসের তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান নয়, এর অর্থ হল সংযম বা পরিমিতিবোধ, যা কেবলমাত্র ইতিহাস পাঠ করলে অর্জন করা যায়। ইতিহাসের চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে অনেকটা ফ্রান্সিস বেকনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন র‍্যালের মতে, ''সমস্ত ইতিহাসেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো বিগত দিনের উদাহরণ বা ঘটনাবলী থেকে সেই শিক্ষা দেওয়া, যে শিক্ষা আমাদের ইচ্ছা এবং কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে''। র‍্যালে ইতিহাসের এই শিক্ষামূলক দিকটির উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডায়োনিসিয়াস-এর মতে দৃষ্টান্ত থেকে গ্রহণ করা দার্শনিক শিক্ষাই হল ইতিহাস। "ফ্রান্সিস বেকনের মতে ইতিহাস হল জ্ঞান বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা যা মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে। কিন্তু এই জ্ঞান ইতিহাস তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান নয়, এর অর্থ হল সংযম বা পরিমিতি বোধ, যা কেবল মাত্র ইতিহাস পাঠ করলে অর্জন করা যায়।

প্রশ্ন

১। 'History is a discipline which makes man wise' এটি কার উক্তি? এর প্রকৃত অর্থ কি?

২। ''History is philosophy drawn from examples'' এটি কার উক্তি? এর প্রকৃত অর্থ কি?

৩। ঐতিহাসিক র‍্যালে ইতিহাসের কোন দিকটির উপর বেশি জোর দিয়েছেন?

আবার লাইব্‌নিৎস (Leibnitz) বা লেকির (Lecky) মতো ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, ইতিহাসের মূল ভিত্তি হলো একান্তভাবেই ধর্ম বা ধর্মসংযুক্ত নীতিবোধ। তাঁদের মতে, ইতিহাস বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনের

মধ্যে, মানুষের নানা ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে ধর্মই বার বার প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তবে লাইব্‌নিৎস ইতিহাসের মূল ভিত্তি হিসেবে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানযুক্ত ধর্মের উপর জোর দিলেও (যেমন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টান ধর্ম ইত্যাদি), লেকি কিন্তু জোর দিয়েছেন নৈতিক মূল্যবোধ বা নীতিবোধের উপর। তাঁর মতে, নৈতিক বিপ্লবই ইতিহাসে বড় বড় বিপ্লবের উদ্ভব ঘটাতে পারে।

লাইব্‌নিৎস বা লেকির মতে ধর্ম ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান পতন ঘটালেও নৈতিক বিপ্লবই একমাত্র বড় বিপ্লব ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের মূলভিত্তি হিসেবে কারা ধর্মের কথা বলেন?

আবার আরেক দল ঐতিহাসেক তাঁদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'Personality cult' বা ব্যক্তিত্বের পূজাবাদে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন। এই মতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকদের মতে, পৃথিবীর বহু দেশের ইতিহাসের সিংহভাগ অধিকার করে রয়েছেন বিখ্যাত যোদ্ধা, সাম্রাজ্যবিজেতা , দক্ষ প্রশাসক বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ঐতিহাসিক মহান ব্যক্তিত্ব। এই দলের ঐতিহাসিকদের মতে, ১৭৯৯ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের ইতিহাস একান্তই ফরাসি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে ইতিহাস, কারণ সে সময় ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনিই। এই মতের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন উনিশ শতকের খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (Thomas Carlye)। তাঁর মতে, এই পৃথিবীতে মানুষের অর্জিত সাফল্যের মূলে রয়েছে কয়েকজন মহান্ ব্যক্তিত্বের মহান কার্যকলাপের ইতিহাস। কার্লাইল আরো মনে করেন, একটি দেশের সামাজিক জীবনের অগ্রগতি পেছনে বিখ্যাত, মহান ব্যক্তিবর্গের সামাজিক জীবনযাত্রার সমষ্টিগত ফলাফল গুরুত্ব হয়ে দেখা দিয়েছে। কার্লাইলের ব্যক্তিপূজাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন আর. ডবলিউ. এমার্সন (R.W.Emmerson). তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন— ''Thers is properly no history but only biography''অর্থাৎ ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা কেবল ব্যক্তির জীবনী। একথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিগণ তাঁদের অনন্য কৃতিত্ব ও জীবনাদর্শের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে জাতীয় জীবন ও সমসাময়িক ইতিহাসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে গেছেন। তবে একইসঙ্গে ইতিহাসকে এই সংকীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখলে সঠিক হবে না। কারণ সমাজ গঠনে বা ইতিহাস পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তর সাধারণ মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনেক সময়েই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই ইতিহাস আমাদের ভুললে চলবে না।

টমাস কার্লাইল ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের কার্যকলাপের কথা বলেন। কিন্তু ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ রাখলে চলবে না কারণ সমাজ গঠনে বা ইতিহাস পরিবর্তনে অনামী বৃহত্তম সাধারণ মানুষের একটা গুরুত্বপূর্ণ বড়ো ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র হিসেবে কারা 'personality cult'-এর কথা বলেন?

২। ইতিহাস পরিবর্তনে বা সমাজ গঠনে সাধারণ মানুষের কতটা ভূমিকা রয়েছে?

আবার ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে নেতিবাচক এবং নৈরাশ্যজনক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ভলতেয়ার (Voltaire), গিবন (Gibbon) বা জেমস জয়েসের (James Joyce)-এর মতো দার্শনিক-ঐতিহাসিকগণ। ভলতেয়ার বলেন,

"History is just the portrayal of crimes and fortunes" অর্থাৎ ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিবল বলেছেন যে, ইতিহাস হল মানব জাতির দুর্ভাগ্য, মূর্খতা ও অপরাধের নথিবদ্ধ বিবরণী। ইতিহাসের চরিত্র বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই হতাশার ও অন্ধকারজনিত বিবরণীর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে জেমস জয়েসের লেখায়। তিনি বলেন, "History is a nightmare from which I am trying to awaken". ইতিহাস তার কাছে এক দুঃস্বপ্ন, যা কাটাবার তিনি অনবরত চেষ্টা করে গেছেন। এইসব লেখকদের বিবরণ ও মন্তব্য থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে যে, অতীতের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, অমানবিক নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদির ঘটনা পড়ে তাঁরা এতই বিচলিত ও মর্মাহত হয়েছেন যে ইতিহাসের কেবল মন্দ দিকটাই তাদের মনে গেঁথে গেছে, ভাল দিকটা তাঁদের লেখায় স্থান লাভ করেনি। এর ফলে তাদের ইতিহাস এক খণ্ডিত ও অর্ধসত্য উপস্থাপিত করেছে।

কিছু দার্শনিক ঐতিহাসিক অতীতের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, ধ্বংসলীলা, নিষ্ঠুরতা অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা পড়ে এতটাই বিচলিত যে তাদের মতে ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী। এর অর্থ ইতিহাসের কেবল মন্দ দিকটাই তারা দেখেছেন, ভাল দিকটা নয়, একারণে তাদের ইতিহাসটা অর্ধসত্য ও অখণ্ডিত ইতিহাস।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে কারা নেতিবাচক এবং নৈরাজ্যজনক সংজ্ঞা প্রদর্শন করেন?

২। 'History is just the portrayal of crimes and fortunes' এটি কার উক্তি? এর অর্থ কি?

১.১.১.১.৩.১ ঃ ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে ও পরে ইতিহাসের স্বরূপ

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে (Age of Enlightmenment) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসচর্চা প্রণালী ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাসচর্চা প্রণালীর সূচনা ঘটে। বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ারের নেতৃত্বে একদল ঐতিহাসিক আধুনিক ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন করেন। প্রধানতঃ মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক ইতিহাসচর্চার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী এক নতুন ইতিহাসচর্চা ইউরোপে বিকশিত হতে থাকে। এর ফলে ইতিহাসের স্বরূপ, বিষয়বস্তু, পরিধির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইতিহাসের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হতে থাকে। ভলতেয়ার ও রবার্টসন ইতিহাসকে মধ্যযুগীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চার দিকে টেনে নিয়ে যান; জ্ঞানদীপ্ত ঐতিহাসিকরা এই নতুন আলোকে তাদের ইতিহাস লেখা শুরু করেন। সাহিত্য ও ধর্মের মোড়ক থেকে মুক্ত হয়ে ইতিহাস বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত হল। রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস বদলে হল মানব সমাজের অগ্রগতির ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কাহিনী। ইতিহাসের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হল।

ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অর্থাৎ ধর্ম ও সাহিত্য ভিত্তিক ইতিহাস চর্চা প্রণালী ও বিষয় বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক অর্থাৎ বিজ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর ইতিহাস চর্চা প্রণালীর সূচনা ঘটে।

প্রশ্ন

১। Enlightenment-এর যুগে ইতিহাস চর্চার কি পরিবর্তন ঘটেছিল?

উনিশ শতকে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠল। তাদের মধ্যে শুরু হল বিতর্ক। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিল। একদল ঐতিহাসিক বললেন, ইতিহাস কেবলমাত্র ঘটনা বর্ণনা করেই তাদের কাজ শেষ করবে। তাদের মতে, মূলতঃ তথ্যের উপস্থাপনাই ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। তবে এই তথ্য হবে পরীক্ষিত সত্য। তাই তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। 'কঠিন সময়' (হার্ড টাইমস্) উপন্যাসে গ্র্যাডগ্রিণ্ড বলেছিলেন, 'আমি যা চাই তা হলো তথ্য।... জীবনে শুধু তথ্যই চাই।' উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের পর তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। ইতিহাসকে নৈতিক রূপ দেওয়ার প্রতিবাদ হিসেবে জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে (Ranke) মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, 'আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো।' এই ধুয়ো তুলে লড়াই-এ এগিয়ে গিয়েছিলেন তিন প্রজন্মের জার্মান, ব্রিটিশ, এমনকি ফরাসি ঐতিহাসিকরা। র‍্যাঙ্কে ছিলেন জার্মানির সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ঐতিহাসিক। বৌদ্ধিক অনুসন্ধিৎসা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সম্পর্কে আগ্রহ র‍্যাঙ্কেকে উনিশ শতকের প্রধান ঐতিহাসিক করে তুলেছে। সাধারনভাবে আধুনিক ঐতিহাসিকের মধ্যে তাঁকেই প্রথম আধুনিক মনে করা হয়। র‍্যাঙ্কে তাঁর ইতিহাসচর্চায় সবক্ষণই 'objectivity of History' বা বস্তুগত বা বিষয়গুলি ইতিহাসের প্রতি ও তথ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বা ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তিনি এক নতুন পদ্ধতি নিয়ে আসেন। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিক উপাদানগুলির যথাযথ ও সযত্ন ব্যবহ্যর। Objective ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে তিনি মৌলিক উপাদানগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আগে করতেন। চিরাচরিত গল্পগাথাকে তিনি বাতিল করেন। যা প্রমাণিত নয়, তা অপ্রাসঙ্গিক বলেই তিনি মনে করতেন। কোনোরকম কল্পনাভিত্তিক, অনুমানভিত্তিক ইতিহাস রচনা তার কাছে ছিল সম্পূর্ণ করিত্যজ্য। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা। এর ফলে তাঁর ইতিহাস critical বা বর্ণহীন। তিনি কোনো ভাবাবেগ বা জাতীয়তাবাদী ঝোঁককে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর শেষ কথা হল, ''The strick presentation of facts is the supreme law of historical writing''. অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। ঐতিহাসিক কখনও কোন ঐতিহাসিক ঘটনাক বা তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা করে আপন সিদ্ধান্ত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

উনিশ শতকে ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ নিয়ে ইতিহাস রচনা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত পার্থক্য দেখা দেয়। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কথা বললেও ঐতিহাসিক কিন্তু কখনও কোন ঘটনার বা তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে আপন সিদ্ধান্ত পাঠকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না।

প্রশ্ন

১। একজন Objectivitist ঐতিহাসিকের নাম কর।

২। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে Objectivitist দের মূল বক্তব্য কি?

১.১.১.১.৩.২ ঃ ঊনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব

ঊনিশ শতকের শেষ পর্ব ও বিশ শতকের শুরু থেকে একদল ঐতিহাসিক মূল্যায়নধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। এঁর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'উপলক্ষ্যগত' মন্ময় (Subjective) ব্যাখ্যার দিকগুলির উপর জোর

Subjectivitist-দের মতে ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক সত্যঘটনার পরিবেশন নয়, বরং তার মূল্যায়ন ও সঠিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দরকার।

দিতে চেয়েছেন। ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয়, এমনকি তা শুধু সত্য ঘটনা হলেও নয়, বরং মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যার উপস্থাপনা। এই বক্তব্যের ও ঐতিহাসেক রচনার দৃষ্টিকোণ থেকেই ইতিহাসের নতুন নতুন সংজ্ঞা, প্রকৃতি আবার ধরা পড়ল।

প্রশ্ন ১। Subjectivitist-দের মূল বক্তব্য কি?

বিশ শতকের ইতিহাসচর্চার ও ইতিহাসদর্শনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যুগবিভাজন সম্পর্কে ধারণা বা অনুভূতিবোধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রভৃতি যুগবিভাগগুলি সম্পর্কে সময়-সচেতনতা এবং অতীতের পুনরুদ্ধার বা পুনগঠন করতে গিয়ে ঐতিহাসেক যে অনিবার্যভাবে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যানধারণার প্রতিফলন ঘটনা, সে সম্পর্কে অনুভূতি। নতুন শতকের গোড়ার দিকে এই ধ্যানধারণা ও ইতিহাস দর্শনের মশাল গিয়ে পৌঁছল ইতালিতে। সেখানে ইতিহাসের এই দর্শনের প্রস্তাবনা করলেন বেনেদেত্তো ক্রোচে (Beneditto Croce)। ক্রোচে ঘোষণা করলেন, সব ইতিহাসই 'সমসাময়িক ইতিচহাস'। ''All history is 'contemporary history'"। তার মানে ইতিহাস মূলত বর্তমানের চোখ দিয়ে ও তারই সমস্যার নিরিখে অতীতকে দেখা এবং ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়, বরং মূল্যায়ন। তিনি যদি মূল্যায়ন না করেন তাহলে কোন্‌টা নথিবদ্ধ কররা উপযক্ত তা তিনি জানবেন কি করে? ঐতিহাসিকের চেতনায়, ধ্যানধারণায় ও মননে অতীত পুনঃসৃষ্টি হয় এবং এই পুনঃসৃষ্ট অতীতের কথাই ঐতিহাসিক লেখেন। যেহেতু একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলেও একওকজন ঐতিহাসকের মনে অতীতের পুনঃসৃজন ভিন্ন ভিন্ন, সেহেতু ইতিহাস রচনাও নানা ধরনের হতে বাধ্য। ঐতিহাসিক যেহেতু তাঁর সময়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতির থেকে মুক্ত নন, সে কারণে অতীত সম্পর্কে তাঁর রচনার সব সময়েই একটি সমসামনিকত্বের বা সমকালীনতার ছাপ থাকে।

যুগবিভাজন সম্পর্কে ঐতিহাসিকের লেখা পুরোপুরি অনুভূতিগত ব্যাপার। কেননা সময় সচেতনতা এবং অতীতের পুনরুদ্ধার বা পুণগঠন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক গণ অনিবার্যভাবে তার সময়ের পরিবেশ ও সমস্কৃতিতে এসে পড়ে।

প্রশ্ন ১। ক্রোচের মতে ইতিহাস কি?

বেনেদেত্তো ক্রোচের ইতিহাসের মূল্যায়নধর্মী, ব্যাখ্যানির্ভর মতবাদের জোরালো সমর্থন তাঁর সমসাময়িককালে ও পরবর্তীকালে অনেক লেখকের লেখার প্রতিফলিত হয়েছিল। নিছক তথ্যের উপস্থাপনা নয়, এর মূল্যায়ন—এই মতবাদের অন্যতম প্রথম সার্থক প্রবক্তা হিসেবে ক্রোচে অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ১৯১০ সালে বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক কার্ল বেকার বললেন, 'ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনো তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি তা সৃষ্টি করেন।' (''The facts of history do not exist for any historian till he creates them''.) একইভাবে মাইকেল

কার্লবেকারের মতে ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোন তথ্য থাকে না তিনি তা সৃষ্টি করেন। মাইকেল ওক্‌শট্‌-এর মতে ইতিহাস মূলত ঐতিহাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিষয় ঐতিহাসিক ব্যতীত তা কেউই তৈরি করতে পারে না।

ওক্‌শট্ (Michael Oakeshott) মত প্রকাশ করেন যে, ''History is the historian's experience, it is made by nobody save the historian, to write history is the only way of making it''. অর্থাৎ ইতিহাস মূলতঃ ঐতিহাসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। ঐতিহাসিক ব্যতীত কেউই একে 'তৈরি' করতে পারেন না এবং ইতিহাস নির্মাণ করার একমাত্র উপায় সেটি লিখে ফেলা।

ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনে ক্রোচে যথেষ্ট গ্রাহ্য হতে শুরু করেন ১৯২০-এর পরেই। এর কারণ হিসেবে E.H. Carr বলেছেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঐতিহাসিকদের দিকে তথ্যের কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে ১৯১৪-র আগের বছরগুলোর চেয়ে যেন কম উদারতা দেখা গেল। অতএব, যে দর্শন তথ্যের মর্যাদা ছোট করতে চাইল তার দিকেই লেখকদের ঝোঁক পড়ল বেশি। অক্‌স্‌ফোর্ড-এর দার্শনিক ও ঐতিহাসিক R.G. Collingwood (আর.জি. কলিংউড্) এর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল ক্রোচের। তাই ব্যাখ্যানির্ভরতা বা ব্যাখ্যা প্রবণতা ইতিহাসরচনার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে কলিংউডের অসমাপ্ত রচনাবলীতে। 'Subjective history' বা 'Subjective attitude to history' তাঁর রচনায় পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কলিংউড দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ''History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian'' অর্থাৎ ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের মননে অতীত ঘটনার বা অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাভিনয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, তাঁর মতে, ঐতিহাসিক যে অতীতের মানুষের বিবরণ রচনায় ব্রত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ধারণা যদি ঐতিহাসিকের মনে জাগ্রত না হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখা সম্ভব হতে পারেনা। এই কারণে যে সমস্ত গবেষক বা লেখক শুধুমাত্র একটি গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ ও সংকলন করে তার নিজের গ্রন্থটি রচনা করে দায়িত্ব শেষ করেন, তাদের তিনি 'ব্যর্থ' ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। তাঁর কাছে 'সব ইতিহাসই চিন্তার ইতিহাস' আর 'ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার 'পুনঃরূপায়ণ', যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন। ঐতিহাসিকের মনে অতীতের পুনগঠন ইন্দ্রয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এটি স্বয়ং কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রক্রিয়া নয় এবং শুধু তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে এটি গড়ে ওঠেনি। তার বদলে পুনগঠনের প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করে তথ্যের নির্বাচন ও ব্যাখ্যান। এর ফলেই সেগুলো পরিণত হয় ঐতিহাসিক তথ্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে বেশি ঝুকে পড়ে। কারণ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লিখতে গেলে অতীতের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও ধারণা ঐতিহাসিকের মনে জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন। আসলে ইতিহাস মানে ঐতিহাসিকের মনে সেই চিন্তার পুনঃরূপায়ন যার ইতিহাস তিনি চর্চা করছেন।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতিহাস চর্চার কি পরিবর্তন দেখা গেল?

২। E.H. Carr-এর একটি বই এর নাম লেখ?

৩। R.G. Colingwood-এর একটি বই এর নাম লেখ। তিনি কোন গোষ্ঠীর সমর্থক?

ইতিহাসের 'subjectivity' মতবাদের গোষ্ঠীর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক R.G. Collingwood এর মতবাদকে অতিরিক্ত দার্শনিকতার দোষে দুষ্ট বলে অভিযুক্ত করেছেন। এই ঐতিহাসিকদের মতে এর কারণ হলো, ইতিহাস নিয়ে তিনি খুব কমই লিখেছেন এবং সে অর্থে তিনি পেশাদার ঐতিহাসিকের মধ্যে পড়েন না, বরং ইতিহাস-দার্শনিক বলাই তাঁকে যুক্তিসঙ্গত হবে। ব্যাখ্যা প্রবণতার প্রতি তাঁর অতিরিক্ত গুরুত্ব

আরোপ তাঁকে একটি অবাস্তব অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে, যেখানে বলা যায়, যত অসম্ভবই হোক না কেন, উপস্থাপিত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই মূল্যের দিক থেকে সমান এবং ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্য বলে কোনো কিছু থাকতে পারেনা। এই বিশ্বস বা যুক্তি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের সত্য নিরূপণের জন্য ঐতিহাসিরদের সমস্ত প্রচেষ্টার যথার্থ্যকেই বাতিল করে দেয়।

E.H. Carr তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যা ইতিহাসের মূল উপাদান মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও কতগুলি বিপদের কথাও বলেছেন। যদিও ইতিহাস একান্তভাবে ও অনিবার্য ভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যানির্ভর ও তথ্যবিশ্লেষণের ব্যাপারে, তথাপি ঐতিহাসিককে সব তথ্যের উপর মনযোগ না দিয়ে তথ্য নির্বাচন করেনিতে হয়। তা সত্বেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বা সততার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রের আদর্শকে কোন ভাবেই পরিত্যাগ করা যায় না। আসলে ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য দুয়েরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ আবার ঐতিহাসক ছাড়া তথ্যেরাও মৃত ও অর্থহীন।

এর বিরোধিতার সুর লক্ষ্য করা গেছে E.H.Carr (ই. এইচ. কার) এর মন্তব্য। তিনি তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও কতকগুলি বিপদের কথাও বলেছেন। যদিও ইতিহাস একান্তভাবেই ও অনিবার্যভাবেই ব্যক্তিগত ব্যাখ্যানির্ভর এবং তথ্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে ঐতিহাসিককে সব তথ্যের উপর মনোযোগ না দিয়ে তথ্য নির্বাচন করে নিতে হয়, তা সত্বেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বা সততার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আদর্শকে কোনোভাবেই পরিত্যাগ করা যায় না। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে what is history? বা ইতিহাস কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কার নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা অনুভুতি ব্যক্ত করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য দেওয়া হলো। কার-এর মতে, মানুষ কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের সম্পর্ক—ঐতিহাসিকের সঙ্গে তার বিষয়ের সম্পর্ক। ঐতিহাসিক তাঁর তথ্যের বিনীত দাস বা অত্যাচারী প্রভু—কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক—সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন জানেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কী করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যানের সঙ্গে তথ্যকে গড়ে-পিটে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে— এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের তখনকার মতো বাছাই করা দিয়ে, আর তখনকার মতো একটা ব্যাখ্যান যার সাহায্যে ঐ বাছাই করা হয়েছে—অন্যরা এবং তিনি নিজেও যা বাছাই করেছেন তাই দিয়ে। তিনি যখন কাজ করতে থাকেন তখন বাছাই ও বিন্যাস—এই দুয়েরই সূক্ষ্ম ও বোধহয় আংশিকভাবে অচেতন পরিবর্তন ঘটে। এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমান ও অতীতের মধ্যেকার পরস্পর সম্বন্ধও জড়িয়ে থাকে, কারণ ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ আর তথ্যগুলো অতীতের। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য— দুয়েরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ। ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। অতএব 'কাকে বলে ইতিহাস'? এই প্রশ্নে ঐতিহাসিক কার বলেন ''It is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the past and the present'' অর্থাৎ ইতিহাস হলো ঐতিহাসিক ও তার সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে এক অন্তহীন দেওয়া নেওয়া বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সংলাপ। এই সব কারণেই একই শ্রেণীর তথ্য একাধিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলেও তাঁদের উপনীত সিদ্ধান্তের মধ্যে এতো পার্থক্য দেখা যায়। আর এটিই হলো ইতিহাসের প্রকৃত আকর্ষণ।

প্রশ্ন ১। What is History-তে Carr-এর মূল বক্তব্য কি?

১.১.১.১.৪ ঃ উপসংহার

আগাথা ক্রিস্টি তাঁর 'The moving finger' নামক রহস্যোপন্যাসে দেখিয়েছেন—একটি ছোট মেয়ে স্কুলের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছে, ''এত রকমের বাজে জিনিসও শেখানো হয়। ধর— ইতিহাস। প্রত্যেক বইতে আলাদা বর্ণনা।'' উত্তরে প্রবীণ অভিভাবক বলেছিলেন ''That is its real interest'' এখানেই ইতিহাসের বিশেষত্ব। এর স্বরূপ, লক্ষ্য, আদর্শ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ''It is a movement in time''. সময়সীমার মধ্যে ইতিহাস একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন থেমে নেই, এ নিয়ত প্রবহমান ও গতিশীল। এই গতিশীলতাই ইতিহাসের প্রাণ। ইতিহাসে ধারাবাহিকতা আছে এবং ঐতিহাসিক ও গবেষকের কর্তব্য হলো ইতিহাসে প্রবহমানতা, পরিবর্তন এবং স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির রূপ ও প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি এদের মধ্যে কিছু কিছু অস্তিত্ব বজায় রাখে, আবার কিছু কিছু বিলীন হয়ে যায়।

তবে ইতিহাসে কল্পনার কোনো স্থান নেই, নেই কবির মতো ভাবাবেগের স্থান, ইতিহাস নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যকেই প্রকাশ করে। ইতিহাস বিজ্ঞানের মতই প্রশ্ন করে কি? কেন? এবং কিভাবে? ইত্যাদি। তারপর যুক্তি, বোধ, বাস্তবতার প্রয়োগে রচিত হয় ইতিহাস।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্‌গণ ইতিহাসের অগ্রগতি বা প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন যুগে মানবসমাজের বিবর্তনের মাপকাঠিতে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে, ইতিহাস একটি লিপিবদ্ধ বিবরণী যাতে মানুষের জীবন বা সমাজের কাহিনী থাকবে। যে সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ অতিক্রম করে বিবর্তিত হয়েছে সেই পরিবর্তনের কথা থাকবে, যে সব চিন্তা বা আদর্শ মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত করেছে তার বিবরণ থাকবে এবং সকলের শেষে যে বাস্তব প্রেক্ষাপট বা অবস্থা সেই মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে বা বাধা দিয়েছে তার বিবরণও থাকবে। ইতিহাস বলতে বোঝায় 'total history' বা সামগ্রিক ইতিহাস। এতে মানুষের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ ও তার সমাজের পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসেবে এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এসেছে সংস্কৃতির (culture) কথা। ইতিহাসের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক নিবিড়। সংস্কৃতি হল মানুষের সেই সব বস্তুগত এবং বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিগত ফলাফল; যার মাধ্যমে সে তার জৈবিক ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারে।

১.১.১.১.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। What is history–E. H. Carr
কাকে বলে ইতিহাস?—(বঙ্গানুবাদ—স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত)

২। Mare Bloch—The Historian's Craft

৩। R. G. Collingwood—The Idea of History

৪। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

৫। সুশোভন সরকার, (ক) প্রসঙ্গ ইতিহাস

(খ) ইতিহাসের ধারা

৬। মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।

৭। সুকান্ত পাল—ইতিহাস ও ইতিহাস দর্শন।

৮। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী—ইতিহাস নানাবিধ।

১.১.১.১.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি নিরূপণ করো। এক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও জটিলতার কারণগুলি উল্লেখ করো।

২। উনিশ ও বিশ শতকের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের স্বরূপ ও সীমা কিভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন?

৩। ''Historical objectivity'' বলতে কি বোঝায়? ইতিহাসকে 'objective' করতে হলে কোন পথে বা উপায়ে করা যেতে পারে?

৪। বিংশ শতকে মূল্যায়নধর্মী ইতিহাসের উদ্ভব ও গুরুত্ব বিচার করো।

৫। ঐতিহাসিকদের প্রধান সংজ্ঞার ভিত্তিতে ইতিহাসের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব আলোচনা করো।

৬। ''To define history definitely or accurately is a preposterous proposition''— তুমি কি একমত?

উপ-একক - ২

Debate among historians about the relative importance of facts and interpretations in History

১.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

(২) 'objective' ইতিহাসের গুরুত্ব

(৩) 'subjective' ইতিহাসের গুরুত্ব

(৪) আধুনিককালে ইতিহাসচর্চা কিভাবে করা যুক্তিযুক্ত।

১.১.১.২.১ ঃ ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক

উনিশ শতকের শেষ পর্বে এবং বিশ শতকে একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস রচয়িতাদের কাছে এসে পড়েছিল। প্রশ্নটা হলো, ইতিহাসের পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে ঘটনাগত সত্যতা রক্ষা ছাড়া ঐতিহাসিকের আরও কিছু মহান দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? বিশ শতকের শুরু থেকে একদল ঐতিহাসিক মনে করতে থাকেন যে, ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয়, এমনকি তা শুধু সত্য ঘটনা হলেও নয়, বরং এর সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা। এই চিন্তাধারা ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দেখা দিল বিতর্ক। বিতর্কের বিষয় ঃ ইতিহাস লেখার পদ্ধতি। প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে এবং তাঁর সমর্থকগোষ্ঠীর ঐতিহাসিকগণ বললেন, ইতিহাস কেবল তথ্য দিয়েই তার কাজ শেষ করবে। মূলতঃ তথ্যের উপস্থাপনাই ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ। তবে এই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সৎ। নির্মোহ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করবেন, যা হবে এক পরীক্ষিত সত্য। এই মতামতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বেনেদেত্তো ক্রোচে এবং তার প্রবল সমর্থকগোষ্ঠীয় ঐতিহাসিকগণ বললেন, ঐতিহাসিক শুধু তথ্য উপস্থাপন করেই তার কাজ শেষ করবে না, তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণও তার অন্যতম প্রধান কাজ।

বিশ শতকের শুরু থেকে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক দেখা দেয়। ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক ঘটনা পরিবেশন নয় বরং এর সঙ্গে প্রয়োজন ঘটনার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার। তার সাথে ঐতিহাসিককে হতে হবে নিরপেক্ষ ও সৎ।

প্রশ্ন

১। বিশ শতকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা যায়?

২। ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিককে কি রকম হওয়া প্রয়োজন?

উনিশ শতকের প্রায় গোটা সময়টাই ইতিহাসচর্চা র‍্যাঙ্কের পথ ধরেই চলেছিল। তথ্যের দিক থেকে উনিশ শতক ছিল এক মহান যুগ। 'কঠিন সময়' (হার্ড টাইমস্) উপন্যাসে গ্র্যাডগ্রিণ্ড বলেছিলেন, 'আমি যা চাই তা হলো তথ্য। জীবনে শুধু তথ্যই চাই। উনিশ শতকের ঐতিহাসিকরা মোটের উপর তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে র‍্যাঙ্কে মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, 'আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো।' উনিশ শতকে এই বীজমন্ত্রই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে বস্তুগত বা বিষয়গত (objective) দিকের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হল। এই 'objective history'-এর সার্থক প্রবক্তা র‍্যাঙ্কের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কাজ হল 'strict presentation of facts' অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা। ইতিহাস রচনায় তথ্য একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইতিহাসে কল্পনার বা আবেগের কোনো স্থান নেই। ঐতিহাসিক কেবলমাত্র সঠিক তথ্য থেকে সংগৃহীত সত্য ঘটনাবলী পাঠকদের কাছে তুলে ধরবেন। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পাঠকদের, ঐতিহাসিকদের নয়।

*উনিশ শতকের ইতিহাস ছিল তথ্যের দিক থেকে এক মহান যুগ। এই সময় র‍্যাঙ্কের মতে ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ ছিল **'Strict presentation of fact'** অর্থাৎ একনিষ্ঠা সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপন করা। বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার পাঠকদের ঐতিহাসিকদের নয়।*

প্রশ্ন ১। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে 'Strict Prsentation of fact' কি?

ঐতিহাসিক বিউরীও (Bury) প্রায় এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর মতে, ''History is a Science, no less and no more'' অর্থাৎ ''ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নয়।'' ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখতে হবে, কিন্তু তা কখনও সীমা লঙ্ঘন করে যাবে না। সুতরাং তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর হতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লষণের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন, বিশ্লষণ বা মূল্যায়ন করতে গেলেই ঐতিহাসিক তাঁর সীমা লঙ্ঘন করবেন, কখনও বেশি বলবেন, কখনও কম বলবেন। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি এবং ঐতিহাসের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে।

বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যা নিভর ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধবাদী ঐতিহাসিকেরা এ ধরনের ইতিহাসচর্চার আরও নানা বিপদের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে, তথ্যের বিশ্লেষণ শুরু হলে, তা কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের চোখে একই ঘটনা নানাভাবে ধরা পড়বে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক একই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবেন। এর ফলে বিভিন্ন মতাদর্শ গোষ্ঠীর বক্তব্যে তার নিজস্ব মতাদর্শ বড় হয়ে দিতে পারে। এর ফলে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় নিরপেক্ষতা, সততা, নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাস রচনার স্বচ্ছতা থাকবে না।

বিউরির মতে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান। তবে ইতিহাস লেখার সময় তার সীমালঙ্ঘন না করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইতিহাস রচনা করা প্রয়োজন। তা না হলে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছতা থাকবে না।

প্রশ্ন ১। History is a science, no less and no more এটি কার উক্তি ও এর অর্থ কি?

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাতদর্শ গোষ্ঠী ইতিহাসচর্চায় গোষ্ঠীগত মতাদর্শকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একই ঘটনাকে ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ভিন্ন চোখে বিচার-বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি ও অর্ধসত্য ধরা পড়েছে। খণ্ডিত ইতিহাসচর্চার রূপটিওধরা পড়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কে দায়ী এই প্রশ্নে ঐতিহাসিকেরা নানাভাবে বিভক্ত। কেউ জার্মানিকে দায়ী করেছেন, কেউ রাশিয়াকে, কেউ আমেরিকাকে, আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গ-ফ্রান্স তোষণ নীতিকেই এর জন্য দায়ী বলে মতামত দিয়েছেন। এর কারণ হল, ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার সময় ঐতিহাসিকেরা তার দেশ, দেশপ্রেম, তার মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে পারেন না। এর ফলেই ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি নজরে পড়ে। এইসব কারণেই বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকগণ এই বিপদের কথা ভেবে শুধু তথ্যের উপস্থাপনা করেই নিজেদের কাজ শেষ করেছেন। তাঁদের মতে, একমাত্র 'objective' দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস রচনাই এইসব বিভ্রান্তি বা বিকৃতি দূর করতে পারে।

আধুনিককালে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটা গোষ্ঠীগত মতাদর্শ বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এর ফলে একই ঘটনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর চোখে ভিন্ন ভিন্ন দেখাচ্ছে। এ কারণে বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকরা শুধু তথ্যের উপস্থাপনা করে নিজেদের কাজ শেষ করছেন।

প্রশ্ন ১। আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার বিভিন্ন গোষ্ঠীগত মতাদর্শটা কি?

অন্যদিকে লর্ড অ্যাক্টন (Lord Acton) প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যানির্ভর ইতিহাসচর্চার দিকটিকে জোরালো সমর্থন করেছেন। এঁরা ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'উপলক্ষ্যগত' (subjective) দিকগুলির উপর জোর দিতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা না করলে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরের রহস্য উন্মোচিত হতে পারে না। এই বিতর্কের সূত্র ধরে 'value judgement' কথাটি প্রযুক্ত হতে থাকে। অর্থাৎ বিতর্কটি এই ধরনের রূপ গ্রহণ করে যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তথ্যের 'value judgement' বা মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না? লর্ড অ্যাকটন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া ইতিহাসচর্চা অর্থহীন ও আকর্ষণহীন। অ্যাক্টনের মতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবদান হল মানুষের মধ্যে সুস্থির চেতনার জাগরণ ঘটানো। তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই তা একমাত্র করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ইতিহাসকে 'নীরস শুষ্ক কাষ্ঠ' থেকে রেহাই দিতে হবে ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন ছাড়া কোনো পথ নেই। তবে তারা এটাও মনে করেন যে, তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে সততা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে আসল সত্য মানুষের সামনে উপস্থাপিত করার মহান দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য ঐতিহাসিকদের। ঐতিহাসিককে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হলে তাদের তথ্য বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিতে হবে বলে বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন

***Subjectivist* তথা *Lotd Action*-এর মত ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণধর্মী বা ব্যাখ্যানির্ভর ইতিহাস চর্চার দিকটিকে জোড়ালো সমর্থন করেছেন। এদের মতে ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন ছাড়া ইতিহাস চর্চা অর্থহীন ও আকর্ষণহীন। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবদান হল মানুষের সুস্থির চেতনার জাগরণ ঘটানা।**

জগৎ বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক থুডিডিডিস। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে বিশ্লেষণ ও নৈতিকতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তথ্য উপস্থাপনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সমাজকে নৈতিকতার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'Value judgement' কথাটির অর্থ কি?

ঊনিশ শতকে ইউরোপে দৃষ্টিবাদী বা Positivist ঐতিহাসিকেরা আরও এক ধাপ এগিয়ে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমতুল্য বলে ঘোষণা করেন। কোৎ, বার্কলে প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণ করে তার থেকে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বের করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। কেউ কেউ আবার বলেন, ''History is social physics'' অর্থাৎ তাদের বক্তব্য হল, বিজ্ঞান যেমন কতকগুলি সূত্র অনুযায়ী চলে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র দিয়ে যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি ইতিহাসেরও সূত্র বা নিয়মাবলী রয়েছে। ইতিহাসের নিয়মবিদ্যা বা সূত্র নির্ণয় করে তা দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করা যায় এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে চালিত করা যায়। অতএব ঐতিহাসিক তথ্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই ঐতিহাসিক সূত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং তা রাষ্ট্র ও সমাজের নানা উপকার সাধন করতে পারে।

Positivitist বা দৃষ্টিবাদীদের মতে ইতিহাস হল বিজ্ঞানের সমতুল্য 'History is social physics' বিজ্ঞানের ন্যায় ইতিহাসও কতগুলি সূত্র বা নিয়মাবলী মেনে চলে যে নিয়মবিদ্যা রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস চর্চায় Positivitist ঐতিহাসিকদের যুক্তি কি?

বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার প্রবক্তারা মনে করেন যে একমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা মূল্যায়নের ফলেই কোনো তথ্যের গুরুত্ব ও নানা দিক উন্মোচিত হতে পারে। কোনো বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিবরণ দিলেই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। এই বিবরণ পাঠক সমাজের কাছে অনেক প্রশ্ন জাগাতে পারে। কারণ বিপ্লব বা বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের মনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি হতে পারে। ঐতিহাসিকের কাজ পাঠক সমাজের সেই কৌতূহল দূর করা। কোনো ঘটনা বা বিদ্রোহ ঠিক কি কারণে ঘটেছিল তা সবার জানা দরকার। ঐতিহাসিকই কেবলমাত্র কারণের গভীরে প্রবেশ করে অন্তর্নিহিত কারণগুলি খুঁজে বের করতে পারেন। এই কারণগুলি জানতে পারলেই পাঠক সমাজের কাছে ইতিহাসের আকর্ষণ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে একসময়ে ঐতিহাসিকেরা সামরিক ও রাজনৈতিক কারণকে বড়ো করে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায়

বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস চর্চার প্রবক্তাদের মতে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বিবরণ দিয়েই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ নয়। ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ হল বিপ্লব বা বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকের মনে জাগ্রত নানা কৌতূহল দূর করা। একমাত্র তথ্যের বিশ্লেষণ বা গভীর অনুসন্ধানের ফলেই তা দূর করা সম্ভব।

আরও অনেক কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ আধুনিক ঐতিহাসিকদের ইতিহাসচর্চায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। একমাত্র তথ্য বিশ্লেষণের ফলেই এবং গভীর অনুসন্ধানের ফলেই তা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্দুদেশের রাজা দাহির আরবীয় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কি কারণে পরাস্ত হয়েছিলেন? সাধারণভাবে জানা যায় মুসলমানদের সামরিক শক্তির তুলনায় তাঁর সামরিক শক্তি দুর্বল ছিল বলে তার পরাজয় ঘটে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা তথ্য বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন যে সামাজিক দিক থেকে রাজা দাহিরের পূর্বেই পতন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের একটা সংঘাত সবসময়েই ছিল। রাজা দাহির ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সিন্ধু দেশের বৌদ্ধরা রাজার প্রতি তাদের সমর্থন তুলে নিয়েছিল। রাজা দাহিরের পরাজয়ের এই সামাজিক ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমেই।

প্রশ্ন ১। বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাস চর্চার প্রবক্তারা ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের উপর জোর দেন?

ঐতিহাসিক কার (Carr)-এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল এই যে, কেউ যদি সত্যিই ঐতিহাসিক হন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে, যে দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিবিদরা 'প্রদান' ও 'প্রতিদান' বলেন সে দুটি একসঙ্গে চলতে থাকে এবং আসলে তারা একই প্রক্রিয়ার দুটি অংশ। আর কেউ যদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন এবং আরেকটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে সেই ঐতিহাসিক দুটি বিপ্রবণতার একটিতে পড়ে থাকেন। হয়, তিনি অর্থহীন, তাৎপর্যহীন 'কাঁচি ও আঠা' মার্কা ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার-কাহিনী বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি আরও বলেন, এর ফলে অতীতের তথ্যকে শুধু একধরনের লেখায় নক্‌শা করার কাজে ব্যবহার করা হবে, যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের সঙ্গে তাঁর তথ্যের সম্পর্ক— সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো গবেষণারত ঐতিহাসিক যেমন আছেন, তিনি যখন চিন্তা করেন ও লেখেন তখন যদি কি করছেন তা ভাবার জন্য থামেন, তাহলে ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে তথ্যকে গড়ে-পিঠে নেওয়ার একটি নিরন্তর প্রক্রিয়ায় তিনি নিযুক্ত থাকেন। এটা আগে, ওটা পরে— এমন ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য—দু-এরই দরকার দুটিকেই। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক চলতে পারেন না, তিনি ব্যর্থ হবেন। আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন।

অর্থনীতিবিদরা যেমন দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থাৎ 'প্রদান' ও 'প্রতিদান'-কে একসাথে চলার কথা বলেন। ঐতিহাসিক তেমনি ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্যের এই দুয়ের কথা বলেন। কারণ তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যরাও মৃত ও অর্থহীন।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও তথ্যের গুরত্ব কতখানি?

১.১.১.২.২ ঃ উপসংহার

অতএব কার (Carr)-এর বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, তথ্যকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্য ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হয়েছে। আবার একইসঙ্গে তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক তার কাজে ব্যর্থ হবেন। তাই বিশ্লেষণপন্থী ও বিশ্লেষণবিরোধী ঐতিহাসিকদের বিতর্কের জের টেনে বলা যায়, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধে যুক্তি থাকলেও কতকগুলি বিষয়ে উভয়েরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সত্য ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন এই মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি নীরস তথ্য পর পর উপস্থাপনা ইতিহাসের আকর্ষণ ও ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কমিয়ে দেবে। আবার বিশ্লেষণপন্থী ঐতিহাসিকদেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ, চিন্তাধারা ও বিশ্বাস তথ্য বিশ্লেষণের সময় জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রাপ্ত তথ্যের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাঁর বিশ্বাস, মতাদর্শের ঝোঁক অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হওয়ার প্রবণতা থাকবে। এই আশঙ্কার কথাই বিশ্লেষণ বিরোধী ঐতিহাসিকেরা জোরের সঙ্গে বলে থাকেন এবং তাদের বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। সব সত্ত্বেও বলা যায়, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মধ্যেই সত্যতা আছে। আবার দুপক্ষেরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সতর্ক ও সততা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসচর্চা করতে হবে। তা না হলে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হবে, আর হয়তো বা কোনো ঐতিহাসিক সত্যকে লঘু করে দেখাবার ঝোঁক দেখা দিবে। অতএব ঐতিহাসিক যে পক্ষেরই হোক না কেন, তাঁকে ঐতিহাসিক সত্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পাঠক সমাজের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তবে আধুনিক যুগে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যাখা বা বিশ্লেষণই বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে। একইসঙ্গে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নানা মতাদর্শের ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের বিকৃতি ঘটছে। ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ; বিশ্বাস, ধ্যানধারণা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের সময় চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এর ফলে সেই ইতিহাসের তথ্যে বিকৃতি ধরা পড়ছে, ইতিহাসচর্চা হচ্ছে খণ্ডিত ও অর্ধসত্য। ইতিহাসের এই বিপদ সম্পর্কে সমগ্র ঐতিহাসিক সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে।

১.১.১.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — অমলেশ ত্রিপাঠী

২। প্রসঙ্গ ইতিহাস — সুশোভনচন্দ্র সরকার

৩। ইতিহাসের ধারা — সুশোভনচন্দ্র সরকার

৪। ইতিহাস নানাবিধ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

৫। What is History? — E. H. Carr
বঙ্গানুবাদ ঃ কাকে বলে ইতিহাস — অনুবাদক ঃ স্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র দত্ত

৬। ইতিহাস ও ইতিহাসদর্শন — সুকান্ত পাল

৭। P. Geyl — Debates with Historians.

৮। G. R. Elton — The Practice of History

৯। P.L. Gardiner — The Philosophy of History

১.১.১.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। তথ্য ও বিশ্লেষণের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক হয়েছে তা আলোচনা করো। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তুমি কোন্‌টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করো?

৩। ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বক্তব্য আলোচনা করো।

৪। আধুনিককালে বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার গুণাগুণ বিচার করো।

একক ২

Collection and Selection of Data : Evidence and its Transmission

বিন্যাসক্রম ঃ

১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.২.১ ঃ সূচনা

১.১.২.২ ঃ ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহ ও নির্বাচন

১.১.২.৩ ঃ প্রামাণ্য তথ্য ও লিখন পদ্ধতি

১.১.২.৪ ঃ উপসংহার

১.১.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কি বোঝায়

(২) তথ্যের উৎসসমূহ ও নির্বাচন পদ্ধতি

(৩) তথ্যের লেখার নিয়মবিদ্যা — গ্রহণ ও বর্জন নীতি

(৪) বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি ও গুরুত্ব।

১.১.২.১ ঃ সূচনা

জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো ইতিহাসচর্চার নিজস্ব গবেষণা ও লিখন পদ্ধতি আছে। সাধারণভাবে বলা হয় সাক্ষ্য বা প্রামাণিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করেন। তবে তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণজনিত জটিলতার নিরিখে ঐতিহাসিকগণ যথোপযোগী ইতিহাস লিকন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে সকলকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

১.১.২.২ ঃ ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচন

একজন ঐতিহাসিক কিভাবে ইতিহাস লেখারা কাজে অগ্রসর হবেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সচরাচর দেখা যায় ঐতিহাসিক তাঁর কাজকে সরাসরি দুই পর্যায় ভাগ করে নেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি গবেষণাধীন বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় পাঠে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী স্বীয় নোটখাতায় লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রক্রিয়া সমাপ্তির পর তিনি উৎসসমূহ রেখে দেন, সংগৃহীত নোট নিয়ে বসে পড়েন এবং প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত লিখে কাজ শেষ করেন।

ইতিহাস রচনার এ পদ্ধতিটি খুব একটা সুবিধাজনক বা গ্রহণীয় বলে মনে হয় না। সঠিক পদ্ধতি হিসেবে নির্বাচিত বিষয়ের উপর প্রধান উৎসসমূহের গভীর অনুশীলনের পর ঐতিহাসিকের মনে যখন বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার জন্ম নেয় তখনই লেখা আরম্ভ করা প্রয়োজন। এরপর তথ্যানুসন্ধান, পড়া ও লেখা পর্যাক্রমে চলবে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকাতালে লেখা বাড়ানো হয়, বাদ দেওয়া হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ঢেলে সাজানো হয়। লেখা পড়াকে পথনির্দেশনাদেয় এবং নিয়ন্ত্রণও ফলপ্রসূ করে। ঐতিহাসিক যতই লেখার কাজে অগ্রসর হন ততই তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর আর কি খোঁজা দরকার এবং পাওয়া যায় তার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তার কাছে বেশি করে প্রতিভাত হয়। তথ্যানুসন্ধান ও লিখন, যে দুটি প্রক্রিয়াকে অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন (input) ও উৎপাদিত (output) দ্রব্য বলতে পারা যায় তা পর্যায়ক্রমে ঘটনা থাকে। এটা একই প্রক্রিয়ার দুটি দিক মাত্র। একাজ হল 'প্রদান' ও 'প্রতিদান'। কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক যাদি তাদের আলাদা করতে চেষ্টা করেন বা আরেকটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন, তাহলে তিনি দুপ্রকারের ভ্রান্তির কোনো না কোনোটিতে পড়ে যাবেন। হয়, তিনি অর্থহীন, তাৎপর্যহীন জোড়াতালির ইতিহাস লিখবেন, নইলে লিখবেন প্রচার কাহিনী বা রহস্য উপন্যাস বা ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ ধরনের কাজে অতীতের তথ্যাবলীকে শুধু নক্শা করার কাজে ব্যবহার করা হবে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোনো সম্পর্ক নেই।

যেহেতু ইতিহাস উৎসভিত্তিক সে কারণে বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাস গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে উৎসের অনুসন্ধান করতে হয়। ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ হল তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং তা যাচাই করে ব্যাখ্যা করা। কার অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয়।

এখন প্রশ্ন হল, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে কিকি নিয়মবিদ্যা অনুসরণ করেত হবে? কিভাবে তিনি উৎসব সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হবেন? উৎস গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করবেন? ইতিহাস গবেষণায় প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উৎসের (source) অনুসন্ধানে লাগতে হয়। ইতিহাস উৎসভিত্তিক, উৎস ছাড়া ইতিহাস হয় না। উৎসও আবার নানা ধরনের—(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যেমন লিপি, মুদ্রা, জীবাশ্ম, হাড়গোড়, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবাপত্র, সৌধচিহ্ন, ইত্যাদি।(খ) মৌখিকভাবে হস্তান্তরিত বিশ্বাস বা প্রথা যেমন অতিকথন, রূপকথা, কাহিনীমালা, পালা, গান ইত্যাদি, (গ) ছবি ভিত্তিক উপাত্ত যেমন নক্শা, মানচিত্র প্রভৃতি, (ঘ) দলিল, দস্তাবেজ, প্রত্নলেখ ইত্যাদি। লিখিত বিবরণ-এর মধ্যে অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে আরম্ভ করে সকল সন্ধি, চুক্ত, দিনলিপি, মুদ্রিত পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সংবাদপত্র, চিঠি এবং মহাফেজখানায় রক্ষিত আরও নানা ধরনের উৎস।

এইসব উৎস থেকে ঐতিহাসিকের কাছে নানা তথ্য আসে। তিনি সেগুলো জড়ো করেন, বাড়ি নিয়ে যান, রান্না করেন এবং তাঁর পছন্দ অনুযায়ী যে কোনোভাবে পরিবেশন করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পদক্ষেপ হলো যাচাই করা তথ্যের সংগ্রহ, এরপর তথ্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তথ্য যাচাই করে নেবার পর ব্যাখার কাজে অগ্রসর হতে হবে। কারণ অতীতের সব তথ্যই ঐতিহাসিক তথ্য নয় বা ঐতিহাসিকের সেগুলোকে ঐভাবে বিবেচনা করেনা না।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ কি।

১.১.২.৩ ঃ প্রামাণ্য তথ্য ও লিখন পদ্ধতি

ঐতিহাসিক তথ্য বলতে কি বোঝায়? এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। লোকচলতি মতে এমন কিছু মৌলিক তথ্য আছে যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান এবং বলা যায় যে, সেগুলো ইতিহাসের মেরুদণ্ড তৈরি করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো বড় যুদ্ধের সন্ তারিখ সম্পর্কে বা কোনো বড় ঘটনার সন্ কারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকের 'নির্ভুল হওয়াটা কর্তব্য, কোনো সদ্‌গুণ নয়।' এটি তাঁর কাজের প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু মূল কাজ নয়। ঠিক এইভাবে কাজের জন্য ঐতিহাসিককে 'ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞা' বলে যা পরিচিত তার উপর নিভরশীল হতে হয়। যথা প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নলেখবিদ্যা, মুদ্রাতত্ত্ব, কালানুক্রম ইত্যাদি। মাটির বা মার্বেল পাত্রের টুকরোর উৎপত্তি ও পর্ব নির্ধারণ, কোনো দুর্বোধ্য প্রত্নলেখের পাঠোদ্ধার বা কোনো তারিখ সঠিক প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশদ জ্যোতিবিজ্ঞানভিত্তিক গণনা—এই সবেরই জন্য একজন বিশেষজ্ঞের যে বিশেষ দক্ষতা লাগে তা ঐতিহাসিকের থাকার দরকার নেই। যেমন পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। এটি একটি সর্বজনগ্রাহ্য তথ্য। এইসব তথ্যকথিত ভিত্তিস্থানীয় তথ্য— যা সব ঐতিহাসিকের কাছেই সমান— সাধারণতঃ ইতিহাসের নয়, বরঞ্চ ঐতিহাসিকের কাঁচা মালের পর্যায়ে পড়ে। ঐতিহাসিকের মহান দায়িত্ব হল, বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। তথ্য নিজেই কথা বলে এটি ঠিক নয়। তথ্যরা একমাত্র তখনই কথা বলে যখন ঐতিহাসিক তাদের ডাক দেন, তিনিই ঠিক করেন কোন্ তথ্যকে তিনি বলতে দেবেন, কোন্ ক্রমে বা কোন্ প্রসঙ্গে পলাশীতে যে ১৭৫৭ সালে যুদ্ধ হয়েছিল তা জানার পাটকদের আগ্রহী হওয়ার একমাত্র কারণঃ ঐতিহাসিক এটিকে ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা বলে মনে করেন। অধ্যাপক ট্যালকট্ পারসন্‌স একবার বলেছিলেন, বিজ্ঞান হলে 'বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানাত্মক বোধশক্তির নির্বাচনমূলক পদ্ধতি'। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসও তাই। ঐতিহাসিককে ঘটনা বাছাই করতেই হয়। ইতিহাসের তথ্য ও অতীত সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যের মধ্যে অনেক ফারাক আছে। অল্পসংখ্যক তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য বাছাই করে সেগুলোকে ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত করা এবং প্রচুর তাৎপর্যহীন তথ্যকে অনৈতিহাসিক বলে বাদ দেওয়া— এই দুই দায়িত্বই হল ঐতিহাসিকের। মধ্যযুগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ব্যারাক্লো মন্তব্য করেছিলেন, 'যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সঠিকভাবে বলতে গেলে তথ্যবিত্তিক নয়, বরঞ্চ এক সারি স্বীকৃত অভিমত।'

ঐতিহাসিক বিউরী প্রাচীন ও মধ্যযুগ—এই দু-যুগই নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসের বিভিন্ন নথি নানারকম ছিদ্রে ভরা'। এর বড় কারণ হল তথ্য বাছাই-এর ক্ষেত্রে নানা ভ্রান্তি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হবে। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের গ্রীস সম্পর্কে আমাদের জানা ইতিহাসে দোষত্রুটি থাকার প্রধান কারণ এই নয় যে এর অনেক টুকরো দুর্ঘটানাক্রমে হারিয়ে গেছে। আসল কারণ হল ঃ এই ইতিহাসটা তৈরি হয়েছে মোটামুটি এথেন্স শহরের ছোট একদল লোককে নিয়ে। এথেন্স-এর একজন নাগরিকের চোখে পঞ্চম শতকের গ্রীগ কেমন ছিল আমরা তার অনেক কিছুই জানি, কিন্তু স্পার্টা, করন্থ বা থিবস্-এর নাগরিকের কাছে তা ছিল সে বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। পার্সিয়া, দাস বা অন্যান্য অনাগরিক বাসিন্দাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এর কারণ এ ধরণের ইতিহাস আগের থেকেই আমাদের জন্য নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয়েছে। আর তা হয়েছে, যতটা দুর্ঘটনাক্রমে, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু মানুষের মাধ্যমে, যাঁরা সচেতন বা অবচেতনভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্‌বুদ্ধ ছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে শুধু সেইসব তথ্যই সংরক্ষণযোগ্য যেগুলো তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে। ঠিক একইভাবে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের তথ্য বলতে আমরা যা জানি তার প্রায় সবই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কালপঞ্জিকারেরা বাছাই করে গেছেন। পেশাগতভাবে এঁরা ধর্মের তত্ত্ব ও চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ফলে ধর্মকে তাঁরা চূড়ান্ত মনে করতেন ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ব্যাপার নথিবদ্ধ করেছেন, তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেননি। আর ঊনিশ শতকের ঐতিহাসিকেরা নীরস তথ্যভিত্তিক ইতিহাস আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তথ্যের বিষয়ে ঊনিশ শতকের লেখকদের অন্ধভক্তি পরিণত হয়েছিল দলিল দস্তাবেজের প্রতি অন্ধভক্তি। এঁদের তথ্যের মন্দিরে দলিল-দস্তাবেজ ছিল বিগ্রহস্বরূপ। কিন্তু এই সমস্ত দলিল ফতোয়া, চুক্তিপত্র, খাজনার হিসাব, সংসদীয় বিবরণ, সরকারি পত্রালাপ, ব্যক্তিগত চিঠি ও দিনপঞ্জী খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, দলিল লেখক যা ভেবেছিলেন, কোনো দলিলই তার থেকে বেশি কিছু জানাতে পারে না— যা ঘটেছিল বলে তিনি ভেবেছেন, যা হওয়া উচিত বা হতে পারে বলে তিনি ভেবেছেন। এর কোনোটারই কোনো অর্থ হয় না যতক্ষণ না ঐতিহাসিক এদের বিচার করে অর্থ উদ্ধার করেন। দলিলে পাওয়া যাক বা না যাক, তথ্যকে যে-কোনোরকমে ব্যবহারের পূর্বে ঐতিহাসিককে তো তা মাপসই করে নিতে হবে। অতএব ইতিহাস লিখন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল সংশ্লেষণ। গবেষণাহীন বিষয়ের উপর উৎস জোগাড় এবং উৎসের ব্যাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর যে বিপুল তথ্যের পাহাড় তখনও থেকে যায়, তার বর্জন। তার সবগুলো ইতিহাসে অন্তভুক্ত করা যায় না। শেষ ধাপে ঐতিহাসিককে তার বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী বাছাই করে নিতে হয়। নির্বাচন, তথ্য গ্রহণ-বর্জনের এ পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাধীন বিষয় যত জটিল, ব্যাপক ও বিস্তযত হবে, ঐতিহাসিকের পক্ষে গ্রহণ বর্জনের পালাও তত কঠিন হয়।

ঐতিহাসিকের মহান দায়িত্ব হল বিভিন্ন তথ্যের নির্বাচন ও বিন্যাস। ঐতিহাসিক প্রচুর পরিমাণে তথ্য জোগাড় করেন। কিন্তু তার সবগুলো ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত করনে না। গবেষণাধীন বিষয়ের উপর উৎস জোগাড় এবং উৎসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পর শেষ ধাপে ঐতিহাসিককে তার বিষয়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক তথ্যবলী বাছাই করে নিতে হয়।

গ্রহণ-বর্জন করে ইতিহাস প্রণয়নের সময় ঐতিহাসিককে তথ্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত ও তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা দিকে নজর দিতে হবে। তথ্যের সঠিকতা ও মৌলিকত্ব যাচাই-এর মাধ্যমে উৎসের ভিতর কোনো জালিয়াতি, জুয়াচুরি, ভাঁওতাবাজি প্রভৃতি থাকলে তা খুঁজে বার করতে হবে। অনেক সময় লিপিকার, নকলনবিশ বা অনুবাদকদের গাফিলতির জন্য প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে বেশ ভুল ভ্রান্তি প্রবেশ করে। উৎস ব্যবহারের পূর্বে খুব সাবধানে ঐতিহাসিককে এ সকল অপূর্ণতা দূর করতে হবে।

উৎস বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য ধাপ হল অভ্যন্তরীণ সমালোচনা। লিখিত উপাদানের মূল্যায়নে ঐতিহাসিককে সর্বদা উৎস প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবাদর্শ ও উদ্দেশ্য (motivation) সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং বর্ণিত বক্তব্য সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে। এজন্য গবেষণাধীন জনগোষ্ঠার ধ্যানধারণা, যুগধর্ম, উপাদানের ভাষা প্রভৃতি ঐতিহাসিকের আয়ত্তে আনতে হবে, বা যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিরে উৎস প্রণেতা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন তা অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন। উৎসের বভীরে প্রবেশ করে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত এটা একান্ত দরকার। উদাহরণস্বরূপ রাজনীতিবিদদের দিনলিপির কথা বলা যায়। এসব উৎস দারুণ সন্দেহের চোখে দেখতে হয়, কারণ এটা অনেকটা সর্বজনস্বীকৃত যে মানুষ সহজাতভাবে নিজেদের কৃতিত্ব গাঁথা সবাধিক সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে তুলে ধরে এবং অপযশ ও দুর্বল দিকগুলো যথাসম্ভব আড়ালে রাখে। সরকারি নথিপত্রের বেলায়ও ঠিক একই কথা খাটে। এসব কাগজপত্রে কিছু বিষয় গোপন ও কিছু বিষয় প্রকাশ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সরকার যখন কোনো বিষয়ে স্বীয় অবস্থায় ব্যাখ্যা, বা বৈদেশিক নীতির পরিবর্তনের যথার্থতা বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দলিলাদি জনসমক্ষে প্রকাশ করে তখন ব্যাপারটি প্রকটভাবে দেখা যায়। মোট কথা, উৎস ব্যবহারের পূর্বে ঐতিহাসিককে প্রতিটি দলিল প্রণেতার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান এবং আশ্বাস, বিশ্বাস, পছন্দ, অপছন্দ ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে উৎসের সঠিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কখনও সম্ভব হয় না।

ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং বর্তমানে ও অতীতের মধ্যেকার এক অন্তহীন সংলাপ।

পরিশেষে ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মূল্যায়নে আমাদেরকে বাহ্যত দুই বিপরীতমুখী পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে যায়। অনেকটা উভয় সংকট পরিস্থিতিতে ইতিহাসের তরী বেয়ে নেওয়া দুষ্কর বলেই মনে হয়। একদিকে ইতিহাসকে তথ্যের নৈর্ব্যক্তিক সংকলন বলে দেখানো হয়েছে, যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের চাইতে তথ্যের প্রাধ্যান্য বেশে। অন্যদিকে দেখানো হয় ইতিহাস ঐতিহাসিকের মানসিকতার নিরিখে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিবেদন, যেখানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যাবলীকে স্বীয় আয়ত্তে আনেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন। এক ধারণা মতে, ইতিহাসের ভরকেন্দ্র আছে অতীতে, আবার অন্য ধারণা মতে, এর ভরকেন্দ্র আছে বর্তমানে। অবশ্য উভয় ধারণার কোনোটিই এককভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের পরিস্থিতি যত বিব্রতকর বলে মনে হচ্ছে তত নয়। ঐতিহাসিকের এ বিপজ্জনক অবস্থা মানব প্রকৃতিরই প্রতিফলন। প্রথম শৈশব ও অতিবৃদ্ধ অবস্থায় ছাড়া মানুষ পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে না ও নিঃশর্তভাবে তার অধীন হয় না। অন্যদিকে, সে কখনোই পরিবেশ থেকে পুরোপুরি স্বাধীন থাকে না ও তার নিঃশর্ত প্রভুও হয় না। পরিবেশের সাতে মানুষের যে সম্পর্ক, ঐতিহাসিকের সাথে তার বিষয়বস্তুর সম্পর্কও ঠিক তেমনি। ঐতিহাসিক তথ্যের হাতে ক্রীড়নক বা তথ্যের স্বেচ্ছাচারী প্রভু— এই দুই-এর কোনোটাই নন। ঐতিহাসিকের সঙ্গে তথ্যের সম্পর্ক— সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক। যে কোনো কর্মরত ঐতিহাসিকই জানেন যে তার ইতিহাস লেখা চলাকালে তিনি অনবরত তথ্যের সাথে ব্যাখ্যার এবং ব্যাখ্যার সাথে তথ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন। এ অবস্থায় একটি থেকে অন্যটির প্রাধ্যান্য বেশি এমনটি ভাবাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের সহায়ক বিজ্ঞান কি কি?

২। ইতিহাস রচনায় তথ্যের গুরুত্ব কি?

১.১.২.৪ ঃ উপসংহার

তাই ইতিহাস লিখনের সময় ঐতিহসিকের কাজ আরম্ভ হয় বিভিন্ন তথ্যের ও ব্যাখ্যার নির্বাচনের মাধ্যমে। তার কাজ যখন অগ্রসর হতে থাকে তখন পারস্পরিক প্রভাবের কারণে ব্যাখ্যা, নির্বাচন ও তথ্যবিন্যাসে সুক্ষ ও সম্ভবতঃ অচেতন পরিবর্তন এসে যায়। যেহেতু ঐতিহাসিক বর্তমানের এবং তথ্য অতীতের অংশ, তাই ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও তথ্যের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বর্তমান ও অতীতের পারস্পরিক সম্বন্ধকেও সংশ্লিষ্ট করে। ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের তথ্য পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয়। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক শিকড়হীন ও বিফল। আবার ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। এভাবে বলা যায়, ইতিহাস হচ্ছে ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং বর্তমান ও অতীতের মধ্যেকার এক অনন্তহীন সংলাপ। সচেতন বা অবচেতন যেভাবেই হোক না কেন ঐতিহাসিকের লেখায় সমসাময়িককালে তার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হবেই।

১.১.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কাকে বলে ইতিহাস?—ই. এইচ. কার
(বঙ্গানুবাদ ঃস্নেহোৎপল দত্ত ও সৌমিত্র পালিত)

২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।

৩। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—অমলেশ ত্রিপাঠী।

৪। ইতিহাস ও ঐতিহাসদর্শন—সুকান্ত পাল।

৫। ইতিহাসের ধারা—সুশোভনচন্দ্র সরকার।

৬। প্রসঙ্গ ইতিহাস—সুশোভনচন্দ্র সরকার।

১.১.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসের তথ্য ঐতিহাসিক কোন্ পদ্ধতিতে গ্রহণ করবেন?

২। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লিখনপদ্ধতি কি হওয়া উচিত?

৩। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎস ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৪। তথ্য সংগ্রহ ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে?

৫। ইতিহাসের তথ্য ও তার সঙ্গে ঐতিহাসিকের সম্পর্ক আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক ৩

Causation in History

বিন্যাস ক্রম ঃ

উপ-একক-১

১.১.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.৩.১.১ ঃ সূচনা

১.১.৩.১.২ ঃ ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা

১.১.৩.১.৩ ঃ ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া— নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের গুরুত্ব

১.১.৩.১.৪ ঃ দৈবঘটনা বা 'আপতন'-এর (Chance)গুরুত্ব

১.১.৩.১.৬ ঃ উপসংহার

১.১.৩.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.৩.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক-২

১.১.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.১.৩.২.১ ঃ 'ইতিহাসবাদ' কথাটার অর্থ

১.১.৩.২.২ ঃ ইতিহাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা —বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক

১.১.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.১.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উপ-একক - ১

Causation in History

১.১.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাস 'কার্যকারণ' কথাটির অর্থ।

(২) প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইতিহাসে 'কার্যকারণে'র প্রভাব ও গুরুত্ব— কিছু দৃষ্টান্ত।

(৩) নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদ কথাটির অর্থ ও গুরুত্ব—নির্ধারণবাদের কিছু দৃষ্টান্ত।

(৪) ঘটনার আকস্মিকতা ও ইতিহাসে এর প্রভাব— কিছু দৃষ্টান্ত।

(৫) কার্যকারণ ও ফলাফল।

১.১.৩.১.১ ঃ সূচনা

ইতিহাসচর্চা হলো কারণ-এর চর্চা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্যকারণ খুঁজে বার করা। ঐতিহাসিক অবিরত প্রশ্ন তোলেন কেন এই ঘটনা ঘটল? কিভাবে ঘটল? আর যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি এর কোনো সদুত্তর পাচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি থামতে পারেন না।

১.১.৩.১.২ ঃ ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা

ঐতিহাসিক ঘটনার কারণ খুঁজে বার করার ইচ্ছাটি অতি প্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ইতিহাসের জনক প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে ইতিহাস ঘটনার কার্যকারণের উপর বেশেষ জোর দেন। তাঁর রচনার গোড়াতেই তিনি নিজের উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন। ''গ্রীক ও বর্বরদের কাজকর্মের স্মৃতি সংরক্ষণ, 'এবং বিশেষত, আর সব কিছু ছাড়াও, তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের কারণ দেখানো।' হেরোডোটাস গ্রীক ও পারসিকদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধের কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাই তিনি শুধু ঘটনাবলীর বর্ণনায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে ঘটনাগুলোর সম্ভাব্য কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। থুকিডিডিসের কার্যকারণ সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা ছিল না বলে অভিযোগ করা হয়। অষ্টাদশ শতকে আধুনিক ইতিহাসতত্ত্বের গোড়াপত্তন শুরুর লগ্নে ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu) তাঁর প্রণীত ''Considerations on the causes of the greatness of the Romans and of their Rise and Decline''

ইতিহাস চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার গভীরে নিহিত কার্য-কারণ খুঁজে বার করা। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে ইতিহাসে অতীত কাহিনী পুনগঠনের অর্থই হলো পরম্পরার বর্ণনা করা। কার্য কারণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ার যুক্তি প্রদর্শনের সময় কোন কারণটি প্রাধান্য পাবে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা আবির্তিত হয়।

-নামক ইতিহাস গ্রন্থের শুরুতেই নীতি হিসাবে ধরে নেন, 'প্রতিটি রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের উত্থান, অবক্ষয় ও পতনের মূলে কিছু সাধারণ, নৈতিক বা বাস্তব কারণ সক্রিয় থাকে, আর যত কিছু ঘটুক না কেন তা এসব কারণের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।' এরপর 'Spirit of Laws' গ্রন্থে তিনি বিষয়টি আরও বিকষিত ও বোধগম্য করে তোলেন। তাঁর মতে 'এ পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ডের দৃশ্যমান ফলাফল অন্ধ নিয়তি সৃষ্টি করেছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক ও অসম্ভব'। বরং সবকিছুর পশ্চাতে কারণ লুকিয়ে আছে।

মন্টেস্কুর পর দু'শতাধিক বছর ধরে ঐতিহাসিক ও ইতিহাস-দার্শনিকরা ঐতিহাসিক ঘটনার কার্যকারণ খুঁজে বার করার চেষ্টায় রত হন। এ কারণগুলি কখনও অধিবিদ্যামূলক, কখনও অর্থনৈতিক, আবার কোনো সময় মনস্তাত্বিক বলে ভাবা হত। মোটের উপর ঘটনার প্রতি যে ধরনের কারণই আরোপ করা হোক না কেন এটা এখন স্বীকৃত সত্য যে ইতিহাসে অতীত কাহিনী পুনগঠনের অর্থই হলো কারণ ও ফলাফলের নিরিখে ঘটনা পরম্পরার বর্ণনা কার। দার্শনিক ভলতেয়ার যথার্থই বলেন যে, ঘটনার মূলে নিহিত কারণ বিশ্লেষণ ব্যতীত শুধু বর্ণনামূলক ইতিহাসের কোনো তাৎপর্য নেই। এটা আমাদের কোনো কাজে আসে না এবং আসতে পারে না।

কারণ-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে ঐতিহাসিকের এগিয়ে যাবার প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, তিনি সাধারণতঃ একই ঘটনার জন্য একাধিক কারণ নির্দেশ করবেন। অর্থনীতিবিদ মার্শাল একবার লিখেছিলেন, 'কোনো কারণের ফলের সঙ্গে অন্যান্য নানা কারণের ফল মিলেমিশে থাকে— কোনো একটি কারণের ফল বিবেচনা করার বিষয়ে লোকেদের তাই সর্ব উপায়ে সচেতন করে দেওয়া উচিত যে তাঁরা যেন সেইসব কারণকেও হিসেবে ধরেন।' ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় কেন সমাজতান্ত্রি বিপ্লব ঘটে, এর উত্তরে মূলত একজন ঐতিহাসিককে ঘটনার বহু কারণ নিয়ে গবেষণা চালাতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, বলশেভিক বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা করার সময় একজন ঐতিহাসিককে রাশিয়ার উপর্যুপরি সামরিক পরাজয়, যুদ্ধের চাপে রুশ অর্থনীতিতে বিপর্যয়, বলশেভিকদের সফল প্রচার, কৃষি সমস্যা সমাধানে জারতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতা, পেট্রোগ্রাডের কল-কারখানায় দরিদ্র ও শোষিত সর্বহারাদের সমাবেশ, আর লেনিনের কর্মদক্ষতা—সংক্ষেপে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি নানা কারণের উল্লেখ করতে হবে।

ঐতিহাসিকের কারণ উদ্‌ঘাটন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোল তাঁর সৃজনশীলতা। তাঁর কাজ হোল কারণগুলিকে কিছুটা ক্রমপরম্পরায় সাজিয়ে দেওয়া, যাতে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক স্থির হয়। কোনী কারণ বা কারণ পর্যায়কে 'শেষ বিচারে' বা 'চূড়ান্ত বিশ্লেষণে' চূড়ান্ত কারণ বা সব কারণের কারণ গণ্য করা হবে তা স্থির করার জন্যই সম্ভবতঃ এটা করতে হবে। একজন খাঁটি ঐতিহাসিক তার বিষয়টিকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিককে চেনা যায় তাঁর আহুত কারণগুলি দিয়ে। রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের কারণ হিসেবে গিবন মনে করতেন বর্বরতা ও ধর্মের বিজয়। উনিশ শতকের ইংরেজ হুইগ ঐতিহাসিকেরা ব্রিটিশ শক্তি ও সমৃদ্ধির কারণ দেখিয়েছিলেন এমন সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ যা সাংবিধানিক স্বাধীনতার নীতিঘুলিকে ধারণ করে। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গিবন ও উনিশ শতকের বৃটিশ ঐতিহাসিকদের সেকেলে বলে মনে হয়, কেননা কার্যকারণ নির্ধারণে তাঁরা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গণ্য করেননি। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অর্থনৈতিক কারণসমূহের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। আসলে কার্যকারণ নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রদর্শনের সময় কোন্ প্রাধান্য পাবে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা আবর্তিত হয়।

আধুনিককালে বিজ্ঞান একইসঙ্গে 'বৈচিত্র্য ও জটিলাতা' একত্ব ও সরলতা'র দিকে ধাবমান। ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রেও এ নিয়মটি সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক গবেষণার পরিধি সদা বিস্মৃত ও গভীরতর করে 'কেন' এই প্রশ্নের অধিক থেকে অধিকতর উত্তর খুঁজে বের করছে।

সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আইনসংক্রান্ত ইতিহাস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি রাজনৈতিক ইতিহাসে জটিলতার বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন এবং মনস্তত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের কলাকৌশল ঐতিহাসিকের উত্তরের গণ্ডি ও সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। ঐতিহাসিক অতীতকে অনুধাবনের আগ্রহে বৈজ্ঞানিকের মতো যুগপৎভাবে তাঁর উত্তরের সংখ্যাধিক্য সরলী করতে, এক উত্তর অন্য উত্তরের অধীন করতে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটনাপ্রবাহ ও কারণাদির মধ্যে কিছু না শৃঙ্খলা উপস্থাপিত করতে বাধ্য। ঐতিহাসিককে কারণের সরলীকরণ ও বৃদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই গবেষণা কাজ চালিয়ে নিতে হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও দ্বৈত তথা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন

১। কার্য-কারণ সম্পর্কে মন্টেস্কুর মত কি?

২। ঐতিহাসিকের কারণ উদ্‌ঘাটন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য কি?

১.১.৩.১.৩ ঃ ইতিহাসের কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া—নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের গুরুত্ব

এ পর্যয়ে ইতিহাসে কার্যকারণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়ায় দুটি আকর্ষণীয়, কিন্তু বিভ্রান্তিকর বা 'মোহন ফাঁদ' বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এদের একটি হলো (ক) নির্ধারণবাদ (Determinism)বা নিমিত্তবাদ ও অন্যটি অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা, পরিভাষায় যাকে বলে আপতন (chance) বা 'ক্লিওপাট্রার নাক'। (Cleopatras nose)

(ক) নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের সংজ্ঞার্থ হল ঃ এমন এক ধরনের বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটনা তার সবেরই এক বা একাধিক কারণ আছে বেং সেই কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো তাহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারত না। আরও সহজ করে এর অর্থ বোঝালে বলা যায়, নির্ধারণবাদ অর্থ হল, তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো। নির্ধারণবাদ শুধু ইতিহাসের সমস্যা নয়, সমগ্র মানবীয় আচার আচরণেরই সমস্যা। প্রত্যেক ঘটনার মূলে কোনো না কারণ নিহিত আছে বলে কথিত স্বতঃসিদ্ধটি আমাদের চারদিকে কি ঘটছে তা বোঝার পূর্বশর্ত। মানুষের াচরণ কার্যকরণ দ্বারা নির্দিষ্ট এবং এ কারণগুলো সনাক্ত করা সম্ভব— অনুরূপ ধারণা ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রায় অসম্ভব।

সাধারণ মানুষের মত ঐতিহাসিকও বিশ্বাস করেন যে মানুষের প্রত্যেক কাজেরই এক বা একাধিক কারণ আছে যা নীতিগতভাবে নির্ণয় বা অবধারণ যোগ্য। অনুরূপ ধারণা না করলে দৈনন্দিন জীবনের মত ইতিহাসচর্চা ও অসম্ভব হয়ে পড়বে। ঐতিহাসিকের বিশেষ কাজ ও দায়িত্ব হল এ সকল কারণ অনুসন্ধান করা। এর দ্বারা হয়তো

মনে হবে যে, তিনি মানবীয় আচরণের স্থিরকৃত (Determined) দিকটার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী। কিন্তু এতে করে তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ব্যাপারটি বাদ দেন না। কোনো ঘটনার অনিবার্যতার প্রশ্ন নিয়েও তিনি মাথা ঘামান না। সাধারণ লোকের মতো অনেক সময় ঐতিহাসিক অসার বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় কোনো ঘটনাকে অনিবার্য বলে বর্ণনা করেন। এর দ্বারা তিনি আসলে বোঝাতে চান যে বর্তমান পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন না হলে ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা অত্যধিক বেশি। বাস্তবিকপক্ষে ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কোনো ঐতিহাসিক তা অনিবার্য বলে ভাবেন না। ইতিহাসে কোনো ঘটনাই অনিবার্য নয়। ঐতিহাসিকদের 'অনিবার্য', 'অবশ্যম্ভাবী', 'অপরিবার্য' ইত্যাদি শব্দ পরিহার করে চলা উচিত।

ইতিহাসের কার্যকরণ উদ্ঘাটনা প্রক্রিয়ায় দুটি মতবাদ প্রচলিত—(ক) নির্ধারনবাদ বা নিমিত্তবাদ (খ) অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা পরিভাষায় যাকে বলে আপাতন যা ক্লিওপাট্রার নাক। নির্ধারণবাদের অর্থ হল, তথ্যগুলো একই থাকলে যা ঘটবেই। কিছুতেই এক অন্যথা হতে পারে না।

'অনিবার্যতা' বিষয়ক সমস্যাটি খুবই অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন বলে মনে হয়। তবুও যে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে সমসাময়িককালে এর অনুশীলন চলছে তার জন্য বিষয়টির মূলে নিহিত উদ্দেশ্য বা প্রেরণা খুঁজে বের করা দরকার। অনুরূপ চিন্তাচেতনার প্রধান উৎস হিসাবে মানুষের আবেগপ্রবণতা বা 'যদি এমন না হয়ে তেমন হত' চিন্তাধারাকে চিহ্নিত করা যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিটি শুধুমাত্র সমসাময়িক ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতীত ইতিহাস যেমন 'গোলাপের যুদ্ধ' (১৪৮৫) আওমরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬) ইত্যাদির বেলায় অনুরূপ চিন্তা ভাবনা মনে জাগে না। এগুলো আমরা চূড়ান্ত বলেই ধরে নিই। এখানে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হলো— শুধু কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা। এজন্য কেউ ঐতিহাসিককে নির্ধারণবাদী বলে অভিযুক্ত করে না এবং উইলিয়াম বা আমেরিকান বিদ্রোহীরা পরাজিত হলে কি ঘটতে পারত সে বিষয়ে বিকল্প চিন্তাভাবনা তুলে না ধরায় কেউ তাকে দোষারোপও করে না। কিন্তু নির্ধারণবাদী বা নিমিত্তবাদের সাথে কল্পকথার কোনো সংশ্রব নেই। আসলে ইতিহাসে অনুমানের কোনো স্থান নেই। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে নিয়ে বা তার ফলাফলকে নাকচ করে দিতে কেহ আগ্রহী নয় বা এগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করারও কিছু নেই। এ জন্য ঐতিহাসিক, যখন ঐ সকল বিষয়ে যবনিকা টানেন তখন কেউ তার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু সামসাময়িক ইতিহাসের বড় সমস্যা হলো এই যে, প্রতিটি ঘটনা ঘটার বিকল্প পথগুলো জনগণের মনে থাকে এবং তাদের পক্ষে ঐতিহাসিকের মতামত গ্রহণ করা কঠিন হয়। এটি সম্পূর্ণভাবে আবেগপ্রবণ ও অনৈতিহাসিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এ ধরণের 'মাহন ফাঁদ' বা চিন্তা-চেতনা থেকে আমাদেরকে চিরকালের মত মুক্তি পেতে হবে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসের কার্যকরণ উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়ায় প্রচলিত দুটি মতবাদের নাম কি?
২। নির্ধারণবাদ কি?

১.১.৩.১.৪ ঃ দৈবঘটনা বা 'আপতন'-এর (Chance) গুরুত্ব

(খ) আপতন (Chance) বা 'ক্লিওপাট্রার নাক' (Cleopatras nose) বা অপ্রত্যাশিত বা দৈব ঘটনা তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনার সংগ্রহ বা সংকলন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে

ঘটনাপ্রবাহ দৈবক্রমে যুগপৎভাবে ঘটে যায় এবং ঘটনার কারণ হিসেবে একমাত্র অভাবিত পূর্বপ্রেক্ষিতের উপর জোর দেয় হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে একটিয়াম (Actium) যুদ্ধের ফলাফল ঐতিহাসিক বর্ণিত কারণের প্রতি আরোপ না করে ক্লিওপাট্রার প্রতি এন্টোনিওর মোহাচ্ছন্নতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ১৯২৩ সালের শরতকালে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ এবং স্টালিনের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ট্রট্স্কির পরাজয়কে কেবল হেমন্তকালে হাঁস শিকারে গিয়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার উপর আরোপ করা হয়। ঐতিহাসিকের পক্ষে বিপ্লব ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আগাম বলা সম্ভব, কিন্তু হেমন্তকালে বন্য হাঁস শিকারে গিয়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলশ্রুতি কি হতে পারে তা পূর্বে বলা অসম্ভব। নির্ধারণবাদ বা নিমিত্তবাদের সাথে এর কোনো সংযোগ নেই। ক্লিওপাট্রার জন্য এন্টোনিওর মোহাচ্ছন্নতা বা ট্রট্স্কির ঠাণ্ডা লেগে জ্বর অতি সাধারণভাবে কার্যকারণসূত্রে নির্ধারিত। রমণীর সৌন্দর্য ও পুরুষের মেহাচ্ছন্নতা বা পুরুষের সৌন্দর্য ও রমণীর মোহাচ্ছন্নতা প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ ঘটনা। তবুও বিশ্লেষণের অভাবজনিত কারণে বা বিশ্লেষণের প্রতি অনীহার জন্য অনেকের নিকট আকস্মিক বা দৈব ঘটনাগুলিই বেশি প্রাধান্য পায়। যে সব ব্যক্তি দৈবক্রম বা আকস্মিকতা বা ভাগ্যকে (Fortune) ইতিহাসে বিশ্লেষণের সময় বেশি গুরুত্ব দেয় তারা ঠিক কাজ করেন না।

ঘটনার আকস্মিকতা ইতিহাস প্রক্রিয়াকে কতটুকু প্রভাবিত করে তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। সাধারণভাবে দেখা যায় মন্টেস্কু প্রথম ব্যক্তি যিনি আকস্মিকতার অহেতুক প্রবাব থেকে ইতিহাসচর্চার রীতিনীতিকে রক্ষা করার প্রয়াস চালান। তার মতে যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপার, যেমন যুদ্ধের আকস্মিক ফলাফল একটি রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন করে তবে মনে করতে হবে যে সেখানো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে করে একটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ই রাষ্ট্রটির অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট বলে প্রমাণিত হয়। অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতি বর্তমান না থাকলে একটি মাত্র যুদ্ধের জয়-পরাজয় চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে সক্ষম হতো না। তাই একটি আকস্মিক ঘটনার ফলাফলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে উচিত হবে না। কার্ল মার্কসের মতে আকস্মিক ঘটনা ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করে, কিন্তু ঘটনা প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারে না। আবার কোনো কোনো মতে অজ্ঞতার জন্যই আমরা ঘটনার আকস্মিকতার উপর বেশি জোর দিই। সহজভাবে যা বুঝি না তা আকস্মিক বলে আমরা চালানোর চেষ্টা করি। আবার কায়ক্লেশ সাধ্য অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিহার করার উদ্দেশ্য অনেকে দুর্ঘটনাকে প্রাধান্য দেয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠে। মোট কথা যারা ইতিহাসকে আকস্মিক ঘটনার সংকলন বলে ধরে নেয় তাদেরকে অলস বা নীচু মানের বুদ্ধিজীবী বলে আখ্যায়িত করা যায়। আন্তরিক ইতিহাস গবেষকরা তথাকথিত আকস্মিক ঘটনাবলীকে মোটেও আকস্মিক মনে করে না। তার এগুলোকে যৌক্তিক ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঘটনা প্রবাহের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে পর্যলোচনা করে। অবশ্য এর দ্বারাও ইতিহাসে আকস্মিকতার ভূমিকার যথেষ্ট ব্যাখ্যা মিলে না। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টির ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আপারন বা ক্লিওপাট্রার নাক তত্ত্ব অনুসালে ইতিহাসকে কেবল আকস্মিক ঘটনার সংগ্রহ বা সংকলন বলে অভিহিত করা হয়। এখানে ঘটনা প্রবাহ দৈবক্রমে যুগোপৎ-ভাবে ঘটে যায় এবং ঘটনার কারণ হিসাবে একমাত্র আভাবিত পূর্ব-প্রেক্ষিতের উপর জোর দেওয়া হয়।

গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে অনেক সময় সাধারণ ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। সকল ঘটনা ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। আবার ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক ঘটনার পার্থক্যও অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় নয়। যখনই কোনো ঘটনা প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তা ঐতিহাসিক ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে। কার্যকারণ বিষয়ক ঐতিহসিকের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপভাবে আবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক ও তার তথ্যের মধ্যেকার আবর্তনশীলতার মত ঐতিহাসিক কর্তৃক আরোপিত কার্যকারণ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে দ্বৈত ও পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া বর্তমান আছে। কার্যকারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাস প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার ধরণ স্থির করে, আবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ধরন ঐতিহাসিক দ্বারা আরোপিত কারণগুলি ঠিক করার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সার কথা হলো কারণাদির গুরুত্ব অনুসারে ঠিক করা বা কারণাদির মধ্যে আপেক্ষিক বা পারস্পরিক তাৎপর্য নির্ধারণ। ইতিহাসে আকস্মিকতাজনিত সমস্যার সূত্র এখানে পাওয়া যায়। ক্লিওপাট্রার সৌন্দর্য, লেনিনের অকাল মৃত্যু প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনা ইতিহাসের গতিধারাকে পরিবর্তিত করেছিল, এগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ বা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। অন্যপক্ষে যেহেতু এগুলো আকস্মিক ব্যাপার, তাই তারা ইতিহাসের যৌক্তিক বিশ্লেষণে বা তাৎপর্য অনুসারে ঐতিহাসিকের সাজানো কারণাদির মধ্যে স্থান পায় না। ঐতিহাসিকের জগৎ বৈজ্ঞানিকের জগতের মতো প্রকৃতি পৃথিবীর আলোকচিত্রতুল্য প্রতিলিপি নয়, বরং এটাকে কাজ চালানোর মতো একটি প্যাটার্ণ বা আদল বলা যায়, যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক মোটামুটি কার্যকরভাবে একে বুঝতে ও রপ্ত করতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক অতীত অভিজ্ঞতা থেকে ছেঁকে সিদ্ধান্ত বের করেন, অথবা নাগালের মধ্যেকার বা যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আওতাধীন অতীত অভিজ্ঞতাকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগান। এটা কার্যকারণ উদ্‌ঘাটনের নির্দেশক বলেও প্রয়োজনে আসতে পারে। ঠিক কি ঘটে, কেন ঘটে তা নিরূপণের জন্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্যাবলী স্তুপীকৃত করা হয়। তারপর গবেষণাধীন প্রতিপাদ্যের অনুকূলে ও প্রতিকূলে তথ্যাদির গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যৌক্তিক ও বিচার বুদিধ সম্পন্ন জ্ঞানের জাল তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় আত্মবাদী (subjective) ধারার বাড়াবাড়ির বিপদ থাকলেও ঐতিহাসিক এভাবেই কাজ করে থাকেন।

প্রশ্ন

১। দৈব ঘটনা বা আপাতন তত্ত্ব অনুসারে ইতিহাসকে কি হিসাবে অভিহিত করা হয়?
২। দৈব ঘটনা বা আপাতন তত্ত্বের দুটি উদাহরণ দাও।

১.১.৩.১.৫ ঃ উপসংহার

অতএব বলা যায় যে, ইতিহাস রচনা ঐতিহাসিক তাৎপর্যানুসারে ঘটনাবলীর এক নির্বাচন প্রক্রিয়া মাত্র। ট্যালকট পারসন্‌স যথার্থই বলেন, ইতিহাস শুধু বাস্তবতার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক নির্ধারণেই নয়, কারণসম্মত সম্পর্ক নির্ধারণেও 'নির্বাচনমূলক পদ্ধতি'। অনন্ত তথ্যের মধ্য থেকে ঠিক যেভাবে ঐতিহাসিক তার প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ঘটনার তাৎপর্য অনুসারে নির্বাচন করে থাকেন, ঠিক তেমনি সংঘটিত ঘটনার কারণ ও ফলাফলের অজস্র ক্রমের মধ্য থেকে তিনি শুধু সেগুলোই নির্বাচন করেন যেগুলো তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। আবার কারণগুলির প্রতি কোনো ঐতিহাসিকের গুরুত্ব আরোপের মান নির্ভর করবে সেগুলোকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে

খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যে। অন্যান্য কার্যকারণ-পরম্পরাকে আপতন (Chance) বলে বাতিল করতে হয়, কেননা তাদের কার্যকারমের সম্পর্কই যে শুধু পৃথক তা নয়, পরম্পরাটিও অপ্রাসঙ্গিক। এখানে ঐতিহাসিকের করার কিছু থাকে না। যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে এদের কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট করা যায় না বা মেলানো যায় না এবং অতীত ও বর্তমানের ক্ষেত্রে তা অর্থবহও নয়, বরং অপ্রাসঙ্গিক। ক্লিওপাট্রার নাকের সৌন্দর্য, লেনিনের অকাল মৃত্যু প্রভৃতির কিছু না কিছু ফল ছিল। কিন্তু এর থেকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সুন্দরীর প্রতি মোহাচ্ছান্নের জন্য সেনাপতিদের সামরিক পরাজয় ঘটে তবে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। ঠিক তেমনি ১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে সব সংঘাত হয়েছিল তার কারণ হলো, শিল্পায়নের হার বা শহরের লোকদের খাদ্য সরবরাহের জন্য আরও বেশি শস্য উৎপাদন করতে কৃষকদের উৎসাহিত করার সেরা উপায় ইত্যাদি নিয়ে আলাপ আলোচনা বা মতানৈক্য, বা এমনকি প্রতিদ্বন্দী নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষমতার লড়াই ও তাদের উচ্চাকাঙ্খা। এইসব কারণ নিয়ে তখনকার ঘটনা ব্যাখ্যাকরলে সে বক্তব্যকে যুক্তযুক্ত ও ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এগুলিই ছিল আসল কারণ এবং অন্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেও এগুলি প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতএব লেনিন-এর অকালমৃত্যু এই আপতিক ঘটনাটি কারণ নয়। এটিকে রাশিয়ার দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামের কারণ বললে ভুল ব্যাখ্যা হবে। এক্ষেত্রে হেগেলের সেই বহু উদ্ধৃত বাণীটির কথা বলা যায় ঃ 'যা কিছু যৌক্তিক তা-ই বাস্তব এবং যা কিছু বাস্তব, তা-ই যৌক্তিক'। বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে বহুবার এবং ভুল বোঝাও হয়েছে বহুবার।

যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থান ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। অপতিক কারণ গুলোর কোনো সাধারণী করন করা যায় না। আর যেহেতু সব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষ পর্যন্ত সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোন শিক্ষা, না পৌঁছানো যায় কোনো সিদ্ধান্তে।

ইতিহাসের কারণগুলি খুঁজতে গিয়ে ঐতিহাসিক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ও আপতিক কারণের মধ্যে পার্থক্য করেন। যুক্তগ্রাহ্য কারণগুলো দেশ, কাল ও অবস্থা-ভেদে প্রযোজ্য হতে পারে বলে সেগুলিকে শেষ অবধি ফলদায়ী সাধারণীকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে শিক্ষাও পাওয়া যায়। সেগুলো তাই আমাদের বোধ বিস্মৃত ও গভীর করার উদ্দেশ্যে কাজে লাগে। অন্যদিকে আপতিক কারণগুলোর কোনো সাধারণীকরণ করা যায় না, আর যেহেতু সব অর্থেই সেগুলো অনন্য তাই শেষপর্যন্ত সেগুলো থেকে না পাওয়া যায় কোনো শিক্ষা, না পৌঁছানো যায় কোনো সিদ্ধান্তে। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার ধারণাটি থেকেই ইতিহাসে কার্যকারণ নির্ণয়ে আমাদের পর্যালোচনার চাবিকাঠিটি পাওয়া যায়। এর সঙ্গে আবার মূল্যায়নের প্রশ্নটিও অবধারিতভাবেই জড়িয়ে আছে। ইতিহাসের ব্যাখ্যান, বিশ্লষণ সর্বদাই মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আর ব্যাখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কার্যকারণ নির্ণয়। এইখানেই ইতিহাসের দ্বৈত তথা পরস্পর-নির্ভর ভূমিকাটির কথা চলে আসে। আর এই ভূমিকাটি হলো, বর্তমানের আলোয় অতীতকে তথা অতীতের আলোয় বর্তমানকে আরও ভালো করে বুঝতে সাহায্য করা। যা কিছু এই দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধনে সহায় হতে পারে না, যেমন ক্লিওপাট্রার নাকের সৌন্দর্যের প্রতি অ্যান্টনির মোহ, ঐতিহাসিকের চোখে তা-ই মৃত ও নিষ্ফল। তবে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতেরও সম্পর্ক রয়েছে। ঐতিহ্যকে এক হাত থেকে অন্য হাতে তুলে দিয়েই ইতিহাসের সূচনা। আর ঐতিহ্য বলতে বোঝায় অতীতের অভ্যাসে ও শিক্ষা ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুবিধার জন্যই শুরু হয়েছিল অতীতে

বিবরণ রেখে যাওয়ার কাজ। 'ঐতিহাসিক চিন্তা', ওলন্দাজ ঐতিহাসিক হুইৎসিঙ্গা বলেছেন, 'সর্বদাই পরিণতিমূলক'। সার চার্লস স্নো রাদারফোর্ড সম্বন্ধে লিখেছেন যে 'সব বিজ্ঞানীর মতোই... তাঁরও মজ্জায় ছিল ভবিষ্যৎ, যদিও এর অর্থ নিয়ে তিনি মাথাই ঘামাতেন না।' তেমনি ভাল ঐতিহাসিকদের মজ্জায় থাকে ভবিষ্যৎ, সে নিয়ে তাঁরা ভাবুন আর নাই ভাবুন। 'কেন?' এই প্রশ্নটি ছাড়াও ঐতিহাসিক প্রশ্ন করেন 'কোন্ দিকে'?

প্রশ্ন

১। ট্যালকট পারশনস-এর মতে ইতিহাস কি?

২। ঐতিহাসিক কিভাবে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ও আপতিক কারণের মধ্যে পার্থক্য করেন?

১.১.৩.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। E.H. Carr—What is History?

২। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

৩। E. Sreedharan—A Textbook of Historiography 500 BC to AD 2000

৪। মমতাজুর রহমান তরফদার—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

৫। এম. দেলওয়ার হোসেন—ইতিহাসতত্ত্ব

১.১.৩.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'ইতিহাসচর্চা হলো কারণের চর্চা'—তুমি কি এই মত সমর্থন কর?

২। যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস রচনায় কার্যকারণের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। 'কার্যকারণের ইতিহাস' বলতে কি বোঝায়? কয়েকটি উদাহরণসহ ইতিহাসে কার্যকারণের ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। কার্যকারণের ইতিহাসে নির্ধারণবাদের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। কার্যকারণের ইতিহাসে আকস্মিকতাবদের কোন গুরুত্ব আছে কি?

উপ-একক - ২

Historicism

১.১.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটির এই অধ্যায়টি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাসবাদ কথাটির অর্থ।

(২) বিশ শতকে ইতিহাসবাদ নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক।

(৩) ইতিহাসবাদের গুরুত্ব।

১.১.৩.২.১ ঃ 'ইতিহাসবাদ' কথাটার অর্থ

'ইতিহাসবাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ ধরলে যা বোঝায় তা হল, ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস বা ধারণা। ইতিহাস যে নিয়মকে অস্বীকার করতে পারেনা এই তত্ত্বের উপর এখানে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এই তত্ত্বের আরও ব্যাখ্যা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ স্বতন্ত্র এবং অনন্য। এর অর্থ হল প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের আলাদা মূল্য আছে যা অন্য যুগে আরোপ করা যায় না। এই তত্ত্ব অবশ্য এটাও স্বীকার করে নেয় যে বিভিন্ন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে 'ইতিহাসবাদ' নিয়ে বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক যত জোরদার হয়েছে ততই উপরিউক্ত সংজ্ঞার দুর্বলতা প্রকট হয়েছে।

'ইতিহাসবাদ' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল ইতিহাসের নানা ঘটনা নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয় এই বিশ্বাস বা ধারণা। এই তত্ত্বের আরও ব্যাখ্যা হল যে, ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ স্বতন্ত্র ও অনন্য।

প্রশ্ন

১। ইতিহাসবাদ কথাটির আভিধানিক অর্থ কি?

২। 'ইতিহাসবাদ' তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা দাও?

১.১.৩.২.২ ঃ ইতিহাসবাদ নিয়ে চিন্তাভাবনা—বিশ শতকে ঐতিহাসিক বিতর্ক

'ইতিহাসবাদ' বিষয়ে অধ্যাপক পপার- এর নানা মূল্যবান লেখাগুলি দরুন শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ লুপ্ত হয়েগেছে। ১৯৩০-এর দশকে কার্ল পপারের 'দ্য লজিক অব সায়েন্টিফিক এনকোয়ারি' (The Logic of Scientific Enquiry) নামে বইটি প্রকাশিত হলে 'ইতিহাসবাদ' শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। E.H. Carr সহ অনেক প্রথিতযশা ইতিহাসবিদ এই শব্দটির ব্যবহার সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন

করেন। এমনকি কার নিজেও স্বীকার করেন যে, এই শব্দের সংজ্ঞার্থের ব্যাপারে সর্বক্ষণ জিদ ধরাটা নেহাতই পণ্ডিতপনা। কার্ল পপার পরে আরও দুই বই লেখেন। এই বইগুলো মূলতঃ মার্কসবাদ-বিরোধিতার ভিত্তির উপর রচিত। ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব মত অধ্যাপক পপার-এর অপছন্দ, তার সবগুলোকেই একযোগে ধরার জন্য তিনি 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পপার তাঁর 'ইতিহাসের দৈন্য' (The Poverty of Historicism) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে তিনি এমন সব 'ইতিহাসবাদী' যুক্তি আবিষ্কার করেছেন, যা কোনো জানা 'ইতিহাসবাদীই' কখনও ব্যবহার করেননি। কোনো কোনো মতবাদে বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে দেওয়া হয়, কোথাও আবার এ দুটিকে করা হয় সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক পপার-এর রচনায় এই দুই মতবাদই 'ইতিহাসবাদের' আওতায় পড়ে। পপার মনে করতেন হেগেলের এবং মার্কসের ইতিহাসদ্বন্দ প্রকৃতিগতভাবে নির্ধারণবাদী। হেগেলের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে পপার তাঁর গ্রন্থগুলি রচনা করেন। হেগেল ও মার্কস ছিলেন পপারের আক্রমণের মূল লক্ষ্য। 'ইতিহাসবাদ' এই নাম দিয়ে এঁদের দুজনকে পপার সমপর্যায়ভুক্ত করেন। ভবিষ্যৎ কথনের ব্যাপারটা হেগেল এড়িয়ে গিয়েছিলেন। পপারের 'ইতিহাসবাদের দৈন্য'-র ভূমিকায় ইতিহাসবাদকে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে যে, এ হলো 'সমাজবিজ্ঞানগুলির এমন এক পরিমার্গ, যাতে ধরে নেওয়া যায় যে, ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ কথনই তাদের মূল লক্ষ্য।'

*অধ্যাপক পপার এর নানা মূল্যবান লেখাগুলির দরুণ 'ইতিহাসবাদ' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। তিনি ইতিহাসবাদ এর সঙ্গে ঐতিহাসিকতা'র তফাৎ করেন। **M.C. Darcy** তার 'ইতিহাসবোধ ঃ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (১৯৫৯ পৃষ্ঠা ১১) 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করলেন দর্শনের অভিন্নার্থক হিসাবে।*

পপারের রচনাগুলির পূর্বে 'ইতিহাসবাদ' (Historicism) শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হতো জার্মান 'হিস্টোরিস্মুস' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে। অধ্যাপক পপার 'ইতিহাসবাদ'(Historicism)-এর সঙ্গে 'ঐতিহাসিকতা'(Historicism)-র তফাৎ করলেন।E.H.Carr এই প্রসঙ্গে বলেন যে, এভাবে শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তাতে পপার যোগ করলেন আরও খানিকটা বিভ্রান্তির উপাদান। ১৯৫৯ সালে অর্থাৎ এর পরবর্তী সময়ে এম,সি ডার্সি তাঁর গ্রন্থ 'ইতিহাসবোধ ঃ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয়' (দ্য সেন্স অফ হিসট্রি ঃ সেক্যুলার এ্যাণ্ড সেক্রেড), (১৯৫৯, পৃষ্ঠা ১১) 'ইতিহাসবাদ' শব্দটি ব্যবহার করলেন 'ইতিহাসের দর্শনের অভিন্নার্থক' হিসেবে।

ইতিহাসের 'কার্যকারণ' আলোচনাপ্রসঙ্গে নির্ধারণবাদের ভূমিকার কথা সবিস্থারে বলা হয়েছে। এই নির্ধারণবাদ, কথাটির অর্থ হল, এমন কোনো বিশ্বাস যে, যা কিছু ঘটছে তার সবেরই একবা একাধিক কারণ আছে এবং সেই কারণ বা কারণগুলি যদি অন্যরকম না হতো কাহলে এর চেয়ে আলাদা কিছুই হতে পারতো না। অর্থাৎ নির্ধারণবাদের মানে হল, তথ্যগুলো একই থাকলে, যা ঘটবেই, কিছুতেই এর অন্যথা হতে পারে না। অন্যরকম ঘটতে পারে বলে মনে করার অর্থ শুধু এই যে তথ্যগুলো আলাদা হলে তবেই অন্যরকম কিছু হতো।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির ধারণাটি বা ইতিহাসের অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্পর্কটি 'ইতিহাসবাদের' ধারণা থেকেই উদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ এই ধারণা থেকেই মনে কার হয় যে, অতীত কখনও লুপ্ত হয়না, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় অতীত ফিরে আসে।

প্রশ্ন

১। পপারের রচনার পূর্বে ইতিহাসবাদ শব্দটি কোন শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হত?

২। পপারের আক্রমণের মূল লক্ষ্যে কারা ছিলেন?

১.১.৩.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। কাকে বলে ইতিহাস?
What is History?—E. H. Carr

২। R.G. Collingwood—The Idea of History.

৩। অমলেশ ত্রিপাঠী—ইতিহাস ও ঐতিহাসিক।

৪। কার্ল পপার—The Poverty of Historicim.

৫। ইতিহাসতত্ত্ব—এম. দেলওয়ার হোসেন।

৬। এফ. স্টার্ণ (সম্পাদিত)—Varieties of History.

৭। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।

১.১.৩.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। 'ইতিহাসবাদ' শব্দের অর্থ কি? বিশ শতকে 'ইতিহাসবাদ' সম্পর্কে যে বিতর্ক ও সমস্য দেখা গিয়েছিল তা তুলে ধর।

২। 'ইতিহাসবাদ' সম্পর্কে কার্ল পপার-এর বক্তব্য আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক ৪

Objectivity of History

বিন্যাসক্রম ঃ

১.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.২.৪.১ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু

১.২.৪.২ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা

১.২.৪.৩ ঃ উপসংহার

১.২.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.২.৪.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু কি?

(২) নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা কি কি?

(৩) ইতিহাস চর্চায় ব্যাখ্যার দিকগুলি কতটা প্রয়োজনীয়?

১.২.৪.১ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু

তথ্যের ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবনচর্চাই হল ইতিহাস। এই অতীত জীবনের চর্চার কাজটি করেন ঐতিহাসিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁকে তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু হল তথ্যের ভিত্তিতে অতীত সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদান করা। সেক্ষেত্রে কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। এই ধরনের ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি হল তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা। জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কের মতে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হল আসলে যা ছিল তাই দেখানো। এক্ষেত্রে তথ্যসূত্রগুলি কঠোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলি প্রামাণ্য তথ্য কিনা যাচাই করে নিতে হবে। অতঃপর সেগুলির উপস্থাপনা করাই হবে ঐতিহাসিকের কাজ।

তথ্য উপস্থাপনায় ঐতিহাসিকের ভূমিকা হতে হবে নিরপেক্ষ, কোনরূপ ব্যক্তিগত আবেগ বা চিন্তাধারার প্রভাব ইতিহাস রচনার ওপর পড়লে সেই ইতিহাস আর অবিকৃত থাকবে না, এবং যথাযথ উপস্থাপনা করা যাবে না। এই ধারণা অনুসারে তথ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিকের চেতনা নিরপেক্ষ। তথ্য গ্রহণের পর ঐতিহাসিককে সেটির বিষয়ে ক্রিয়াশীল হতে হয়। এক্ষেত্রে কোনওরকম কল্পনা বা অনুমান সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাণভট্টের হর্ষচরিতে হর্ষবর্ধন দ্বারা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিবরণ পাওয়া গেলেও, যুদ্ধের কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবার অন্য তথ্যসূত্র থেকে আমৃত্যু শশাঙ্ককে গৌড়ের সিংহাসনে অসীন রূপে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও সূত্রেই হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্কের প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বিবরণ বা ফলাফল পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ওপর তথ্য পাওয়া যায়নি সেই বিষয়ের ওপর ঐতিহাসিক নীরব থাকবেন। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতে যদি তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন যে যুদ্ধযাত্রার বিবরণ থাকা সত্ত্বেও সভাকবির বিবরণে বিজয়ের উল্লেখ না থাকা হর্ষবর্ধনের চূড়ান্ত সামরিক বিপর্যয় ও মর্যাদাহানির ঘটনাকে লুকিয়ে যাওয়ার প্রয়াস, তাহলে নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চাকারী দের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা কেবল প্রমাণিত তথ্যকেই গুরুত্ব দেবেন। কেবলমাত্র পরীক্ষিত তথ্য হবে গ্রহণযোগ্য। সেই তথ্য পরপর সাজিয়ে উপস্থাপনাই হবে ঐতিহাসিকের একমাত্র কাজ। তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ ও চিন্তাসমন্বিত ব্যাখ্যা ইতিহাস রচনায় প্রবেশ করলে তা পাঠকদের প্রভাবিত করতে পারে।

এই ধরনের ইতিহাসচর্চা আধুনিক ইতিহাস রচনার এক নবযুগের সূচনা করলেও এর কিছু মূলগত সমস্যা থেকে যায়। যার ফলে বাস্তব প্রয়োগে এই ধারণার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাছাড়া কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনায় সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

১.২.৪.২ ঃ নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার সমস্যা

নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চা সর্বদা বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তথ্যের পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপনাকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু তথ্য বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলি কখনই সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকতে পারে না। পাশাপাশি এই বিষয়টিও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ঐতিহাসিক বহু তথ্যসূত্রের মধ্যে তাঁর আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু বেছে নেন, আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সেটি হয় Historical evidence। তাই এক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণের চেয়ে গুরত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ঐতিহাসিকের কাছে সেটির প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া।

যে-কোনো সাধারণ মানুষের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়া আর সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ দুটিকেই অতীতের তথ্য বলে মনে হলেও সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ঐতিহাসিকের কাছে ইতিহাসের তথ্যরূপে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই গ্রহণ বা বর্জনের কাজটি করেন ঐতিহাসিক। সুতরাং object তথ্য অপেক্ষা subject ঐতিহাসিক বেশি গুরুত্ব পান। যেহেতু ইতিহাসের তথ্য কখনই অবিকৃত থাকতে পারে না তাই সেক্ষেত্রে ইতিহাসে বর্ণিত তথ্য অপেক্ষা ঐতিহাসিকই আমাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। এইভাবে আমরা সমাধান করতে পারি যে সভাকবি হবার কারণে বাণভট্ট হর্ষবর্ধনের পরাজয় স্বীকার করতে অপারগ ছিলেন।

পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের সময় ঐতিহাসিকের মতই প্রাধান্য পায়। কার্ল বেকারের মতে, 'ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনও তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি সেগুলি তৈরি করেন।' কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহ আর তার উপস্থাপনা করলেই মানুষের অতীত জীবনচর্চার সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সেই কারণে R.G. Collingwood, মনে করেন, ''History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian.''

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত অভিযান করেন এবং সেই বিজিত রাজ্যগুলিকে 'গ্রহণ মোক্ষ অনুগ্রহ' দ্বারা সেই শাসকদের হাতে ফিরিয়ে দেন, অথবা অশোক যুদ্ধনীতি ত্যাগ করে ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে কেবলমাত্র তথ্যগুলির বিবরণ দিলেই ইতিহাসের সম্পূর্ণতা প্রকাশ পাবে না। বরং ঐতিহাসিক যদি যুক্তিগ্রাহ্য, নিজ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই দুটি ঘটনার পাশ্চাতে শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বা রাজ্যশাসনের সহায়ক নীতির প্রসঙ্গটি উপস্থাপনা করেন, তবে বিষয়টি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

১.২.৪.৩ ঃ উপসংহার

তবে এক্ষেত্রেও বলা উচিত যে ঐতিহাসিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে ব্যাখা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে Subjective History-র অবতারণার অর্থ এই হওয়া উচিত নয় যে ঐতিহাসিক যাই উপস্থাপনা করবেন তাই ইতিহাস। ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভূমিকা অপরিহার্য। বিভিন্ন ব্যাখ্যা ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীবনীশক্তির ন্যায় কাজ করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিককে যেমন তথ্যের যথার্থতার দিকে নজর রাখতে হবে, তেমনি যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেটিকে উপস্থাপিত করতে হবে। তবেই ইতিহাস রচনা সফল হবে।

১.২.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। What is History? — E.H. Carr

২। কাকে বলে ইতিহাস?—ই. এইচ কার

৩। ইতিহাস তত্ত্ব—এম দিলওয়ার হোসেন।

৪। ইতিহাস ও সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত।

১.২.৪.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। নৈব্যক্তিক ইতিহাসচর্চার মূল বিষয়বস্তু কি?

২। Objective ও Subjective ইতিহাসচর্চার মধ্যে কোন্‌টি বেশি যুক্তিগ্রাহ্য?

একক - ৫

Natural Sciences, Applied Sciences and Literature

বিন্যাসক্রম ঃ

১.২.৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.২.৫.১ ঃ ইতিহাস ও সাহিত্য

১.২.৫.২ ঃ ইতিহাস ও বিজ্ঞান

১.২.৫.৩ ঃ উপসংহার

১.২.৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.২.৫.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক

(২) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

(ক) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান

(খ) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

(৩) ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের গুরত্ব।

১.২.৫.১ ঃ ইতিহাস ও সাহিত্য

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শক। তবে ঐতিহাসিক বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন এবং এই অধিকার তার আছে। জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা একমাত্র সাহিত্যেই সম্ভব। তবে ঐতিহাসিকদের তাদের কাজে সাহিত্যকে দরকার। ঐতিহাসিক সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে পারেন না। আবার সাহিত্যিকের ঐতিহাসিক ঘটনার মাল-মশলা পাওয়ার জন্য ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে আসতে হয়। অনেক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে ইতিহাসচর্চায় মানসিকতা (Mentality) ও মেজাজের বিশ্রেষণ একটি প্রধান চেষ্টা। মানুষের মন ঠিকমত বুঝতে না পারলে ঘটনাকে ঠিকমত বোঝা যায় না। ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত যেমন সুবিদিত ও সমাদৃত, ঠিক তেমনি

ইতিহাস যে সাহিত্যও বটে এ বিক্তব্যকেও উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এই দুই বোধই বর্তমানের ইতিহাসচর্চায় লক্ষ্য করা যায়। তাই ঐতিহাসিকদের চেষ্টা ও সাহিত্যিকের সাধনার কোথায় সাদৃশ্য এবং কোথায় বৈসাদৃশ্য সেই সমস্যাটি উপলব্ধি করার বিশেষ দরকার আছে।

ইতিহাসের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক যে দিন দিন নিবিড় হচ্ছে তা সকলেরই প্রায় জানা। ইতিহাস নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলেও ঐতিহাসিককে দার্শনিক হতে হবে। ইতিহাস আবার বুহদিন ধরেই সাহিত্যের একটি অংশ হিসেবে চলে আসছে। সেজন্য ইতিহাসের ছাত্র, গবেষক ও ঐতিহাসিককে জ্ঞানের এই সব শাখার সঙ্গে নিজের কাজ তুলনা করে দেখতে হয়। তবেই একদিন ইতিহাসচর্চা যেমন সুস্পষ্ট হবে, ঐতিহাসিকও তার কাজে সার্থক হবেন।

এখন প্রশ্ন হল, ইতিহাস কী? বা ইতিহাস কাকে বলে? সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবনব্যাখ্যাই ইতিহাস। অর্থাৎ একক মানুষকে নিয়ে ইতিহাস মাথা ঘামায় না। একক মানুষের অস্তিত্ব থাকলেও যেহেতু ইতিহাসের কারবার সমাজবদ্ধ মানুষকে নিয়ে সেহেতু মানুষ সামাজিক হলেই কেবল ইতিহাস তার কথা ভাবে। আবার সামাজিক মানুষ যখন জীবনে একেবারে নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে থাকে। রিচার্ড কব (Richard Cobb) বলেছেন, ইতিহাস বিশেষ মানুষকে নিয়ে; তুলনায় বড়ো কাঠামো, বিশাল আন্দোলন এগুলি অনেকটাই মনগড়া কথা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেন, ঐতিহাসিকের বক্তব্য যদি বিশেষ মানুষকে ছাড়িয়ে না ওঠে তাহলে সে বক্তব্য ইতিহাস হয় না। অবশ্য কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই কাঠামো বস্তুটাকে এড়ানো সম্ভব নয়। বিশেষ মানুষগুলি স্থান ও কালের কাঠামোতেই ধরা থাকে। ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিশারী। বিশিষ্ট চরিত্রগুলি সাধারণ পরিবর্তনের স্রোতে কেমন করে পাল্টে যায় সেটা লক্ষ্য করা তাঁর কাজ। একদিকে জনসমষ্টির উপর জোর দিয়ে, বিশেষ মানুষগুলিকে বাদ দিয়ে সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসকে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে ইতিহাসের মধ্যেই সাহিত্যের বিশাল আকর্ষণ ঐতিহাসিককে শুধু যে মানবচর্চায় ধরে রাখছে তাই নয়, বিশেষ মানুষ, একলা মানুষের খোঁজে কিছুটা বিপথেও টানছে। তবে ইতিহাস কখনই একলা মানুষের জন্য নয়, সমাজবদ্ধ মানুষের জন্য।

আবার ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়েরই কাজ-কারবার মানুষকে নিয়ে। কিন্তু একক মানুষের জন্য ইতিহাস নেই। কিন্তু এই একলা মানুষটির হয়ে কথা বলার জন্য আছে সাহিত্য, ব্যক্তিমানুষের মূল্য থাকলেও ইতিহাস কিন্তু নেই। একজন ঐতিহাসিক একজন মানুষের মানসপ্রতিমা তৈরি করতে পারেন না। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না পারাটা অক্ষমতা বা অন্যায় নয়। আসলে এ কাজ ইতিহাস পরিপন্থী। এ কাজ হল সাহিত্যেকের। একজন সাহিত্যিক একজন ব্যক্তির মানবপ্রতিমা নির্মাণ করতে পারেন। তার মধ্য দিয়ে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের সঙ্গে সেতু তৈরি করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের পক্ষে এই না পারাটা অক্ষমতা বা অন্যায় নয়।

ইতিহাস অতীত নিয়ে কারবার করলেও ইতিহাসের অতীত কী বস্তু সে সম্পর্কে সদাসর্বদা ঐতিহাসিককে সতর্ক থাকতে হবে। সাহিত্যিক অতীতের যে কোনো ঘটনাকে তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা লেখার বস্তু করতে পারেন। কিন্তু অতীত ও ইতিহাসের অতীত এক নয়। ইতিহাসের অতীত সভ্য ও সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত। সেজন্য অতীতের সে সামান্য অংশ। অন্যদিকে সাধারণ অতীত প্রতি মুহূর্তের সৃষ্টি। গতকালও এখন অতীত, বিগত

মুহূর্তও এই মুহূর্তে অতীত। অবশ্য ঐতিহাসিক অতীতের এই দিককার সীমা কোথায় টানবেন তা নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেই বিতর্ক রয়েছে। তবে ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিককে হতে হয় নির্মোহ বিচারক। ইতিহাসের বিচার নিরপেক্ষ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তবে অতীতকে অগ্রাহ্য করে কি সাহিত্যিক, কি দার্শনিক তাদের কাজ করতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের সেই স্বাধীনতা নেই। তবে অতীত-আশ্রয়ী ইতিহাস কেমন করে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করবেন এ ব্যাপারে কিন্তু তিনি স্বাধীন। ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ বলেই ঐতিহাসিক বর্তমানের কোন প্রশ্ন মনে রেখে অতীতকে খোঁজ করতে পারেন। কিন্তু সেই প্রশ্নেই উত্তর কী হবে সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকের কোন স্বাধীনতা প্রায় নেই বললেই চলে। এখানেই ইতিহাসের সবচাইতে বড় জোর যে ইতিহাস তথ্যনিষ্ঠ। তথ্যের বাইরে এক্তিয়ার ঐতিহাসেকের নেই। কিন্তু তথ্য আবিষ্কার ও তথ্য নির্বাচন করেই ইতিহাস ফুরিয়ে যায় না। তথ্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দুটি দিক থাকে। একটি যুক্তির দিক, অন্যটি কল্পনার। দৃঢ় যুক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক যখন নির্বাচিত তথ্যগুলিকে সাজান, তখন তিনি মেজাজে বৈজ্ঞানিক। কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেজন্য নিজস্ব সহানুভূতিতে কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে ঐতিহাসিক হলেন সাহিত্যিক। কিন্তু সে কল্পনা সীমিত। কারণ মহৎ ঐতিহাসিকের কল্পনার অনুমানের কোন স্থান বা অধিকার নেই। এটি একমাত্র কবি বা সাহিত্যিকেরই আছে। তবে হেরোডোটাস থেকে ঐতিহাসিক পরম্পরায় কল্পনার বা অনুমানভিত্তিক ইতিহাস রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমে করা গেছে। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে গর্জে উঠেছিলেন উনিশ শতকের প্রথমে প্রবাদপ্রতিম্ জার্মান ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে। এর ফলেই কল্পনাশ্রিত বা অনুমানভিত্তিক ইতিহাসের পরিবর্তে ক্রমে নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানধর্মী ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবুও ইতিহাসের তথ্যে যে অসঙ্গতি আছে এ কথা আজ স্বীকৃত। ঐতিহাসিকের জীবন ব্যাখ্যার যে কল্পনা কাজ করে এই বক্তব্যও অনস্বীকার্য। শুধু ইতিহাসের কল্পনা এবং সাহিত্যের কল্পনা একজাতীয় নয়। ইতিহাস শেষপর্যন্ত ঘটনার মধ্যে থাকে। ঐতিহাসিক শেষ বিচারে দর্শক। কিন্তু সাহিত্য জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য তুলে ধরে। এ কারণেই সাহিত্যিক স্রষ্টা। ঈশ্বরের মতই অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এই দুই ধরনের মানুষই ঘটনার দর্শন। ঐতিহাসিক বাইরে থেকে ঘটনার বর্ণনা দেন আর সাহিত্যিক ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন দুটি যুক্তি থেকে ব্যাখ্যা করেন—একটি যুক্তির দিক, অন্যটি কল্পনার। যুক্তির মধ্যে দিয়ে তথ্যগুলির সাজালে তিনি বৈজ্ঞানিক. কিন্তু যেহেতু তাঁর তথ্য সামান্য এবং জীবন ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য কাজ সেজন্য নিজস্ব সহানুভূতির কিছুটা কল্পনা ঐতিহাসিক করে থাকেন। সেখানে ঐতিহাসিক হলেন সাহিত্যিক। ইদানীং ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব বাড়ছে। কিছুদিন হল ঐতিহাসিকের প্রশ্ন ইতিহাসকে মানুষের মন ও অনুভূতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সময় সচেতনতা ও পরিবর্নের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম ইতিহাস সেই জীবনে অবান্তর।

ইতিহাস উনিশ শতকে বেশি করে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে ছিল, কিন্তু ইদানিং ইতিহাসে সাহিত্যের প্রভাব বাড়ছে কিছুদিন হল ঐতিহাসিকের প্রশ্ন ইতিহাসকে মানুষের মন ও অনুভূতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এর আভাস পাওয়া যায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক থিওডোর জেলডিনের ফরাসী দেশের উপর লিখিত বিশাল ইতিহাস। দুখণ্ডে রচিত গ্রন্থের শিরোনামে লেখা আছে ঃ ‘উচ্চাশা, ভালোবাসা ও রাজনীতি’ এবং ‘বোধ, রুচি ও উৎকণ্ঠা’।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যের যে সত্যের প্রকাশ, ঐতিহাসিকের সে সত্য প্রকাশের ক্ষমতা বা অধিকার নেই। সাহিত্যিকের মত অবাধ বিচরণ ঐতিহাসিকের নেই। তবে ইদানীং ঐতিহাসিক যখন মানসিকতার সন্ধান করেছেন তখন সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাসের কোথায় মিল এবং কোনখানে পার্থক্য তাও ভাবা দরকার।

সাহিত্যিক যখন স্থির করেন যে তিনি ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করবেন তখন তাঁকে ইতিহাসের সাহায্য নিতে হয় এবং ইতিহাস বিশদভাবে পড়তে হয়। ঐতিহাসিক তথ্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ না করে তিনি উপন্যাস রচনা করেন। অধিকাংশ সময়ে সেই কাহিনী হয় অপ্রাকৃত, নয় আধুনিক। ইতিহাসের তথ্যগুলি অলঙ্কার রূপেই থাকে। সেই তথ্য ঠিক না ভুল সেই নিয়ে আলোচনা চললেই সাহিত্যিকের লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের তার বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে যে মেজাজ সাহিত্যিক তৈরি করেন, সে বস্তু উদ্ভট, নয় সাহিত্যিকেরই সমসাময়ি। তা সত্ত্বেও কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হতে পারে। এ ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাসের সার্থক কাহিনী বলেই স্বীকৃতি লাভ করে এবং অভিনন্দিত হয়। কারণ এই সব উপন্যাসে কাহিনীটিই পাঠককে ধরে রাখে, অতীতের তথ্যগুলি মঞ্চসজ্জা। জর্জ লুকাচ বা ই. এইচ-কারের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব এই ধরনের রচনাকে ঐতিহাসিক বলে স্বীকার করবেন না। লুকাচের মতে, বিগত যুগের পরিবেশ যখন উপন্যাসের বিশেষ চরিত্রগুলিকে তৈরি তরে তখনই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠ। এ ব্যাপারে অবশ্য একাধিরক অসুবিধা আছে। যুগের পরিবেশ ব্যক্তিকে তৈরি করলেও অনেক সময় যুগের পরিবেশ ছাপিয়েও বিশেষ ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে। মনে রাখা দরকার, সমাজে, একই শ্রেণীতে, একই পরিবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ থাকাটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ঘটনাটির মর্মোদ্ধার সাহিত্য যেমনভাবে করতে পারে, ইতিহাস তা একেবারে পারে না। অবশ্য একারণে ঐতিহাসিক ইতিহাসের কাঠামোকে অবহেলা করতে পরেন না।

ঐতিহাসিক মানসিকতার পরিবর্তন স্বীকার করেন, কিন্তু যেহেতু মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশের অধিকার তাঁর নেহ সেহেতু ঘটনার বর্ণনার মতন করে মানসিকতার পরিবর্তন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেত পারেন, তার বেশি তিনি করতে পারেন না। এ কাজ একমাত্র করতে পারেন সাহিত্যিক। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, সব সাবেকী সমাজের মৃত্যু চিন্তা বস্তুটা জোরালো। কিন্তু মৃত্যুভয় বস্তুটা কী, মৃত্যুচিন্তায় পীড়িত সমাজে মানুষ ঠিক কী ভাবে, এই কথা বলার বা কল্পনীর অধিকার ঐতিহাসিকের নেই। ইতিহাসকে অবলম্বন করে এবং সৃজনী কল্পনার সাহায্যে সেই কাজ করেন সাহিত্যিক। মানসিকতার পার্থক্য সার্থকভাবে বর্ণনা করতে পারলে সাহিত্যে ইতিহাসের ধম৪ আছে। সাহিত্য যখনই অন্য মানসিকতার সন্ধান এনেছে তখনই সাহিত্য ইতিহাসের পরিপূরক। সে হিসেবে উইলিয়ম গোলডিং এর লেখা বই 'দি ইনহেরিটরস্' অন্য মানুসকতার এক সার্থক সৃষ্টি এবং ইতিহাসধর্মী। এই রচনা একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক আলেখ্য। এই রচনাটিতে সৃষ্ট জগৎ সম্পূর্ণ নূতন। আদিম পৃথিবীকে আমরা এখানে আদিম চোখ দিয়েও দেখতে পাই।

আবার যদি কোন বিরল সাহিত্যিক অন্যযুগের মনকে তাঁর রচনায় ধরতে পারেন, পাঠক যদি সেই মনকে পৃথক বলে চেনেন, কিন্তু স্বাভাবিক বলে মানেন তাহলে সেই সাহিত্য নিঃসন্দেহে ইতিহাসধর্মী। তাবে এটুকুই শুধু সাহিত্যে ইতিহাসের ধর্ম নয়। অন্যভাবেও সাহিত্যে ইতিহাস আসে।

সময় সচেতনতা ও পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ইতিহাসের উপজীব্য। সাহিত্য অন্য এক অনন্ত জীবনের আভাস আনতে সক্ষম। ইতিহাস সেই জীবনে অবান্তর। কিন্তু ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্ক অন্য একটি সূত্রেও ভাবা

প্রয়োজন। সতীনাথ ভাদুড়ীর দুটি অনবদ্য রচনা— 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'একত্রে ভেবে নিলে উপরি উক্ত বক্তব্য বোঝা যাবে। সাহিত্যিকের একটা ক্ষমতা আছে তিনি ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন এবং 'জাগরী' উপন্যাসের সেই ক্ষমতার ব্যবহার স্পষ্ট। জাগরীর কাহিনীটির স্রষ্টা সতীনাথ ভাদুড়ী স্বয়ং, তিনি এই জীবনের ঈশ্বর। এই উপন্যাসের চারজন মানুষ— বাবা, মা ও দুই ছেলে চুড়ান্ত সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবনের তীত ঘটনাগুলিকে ব্যাকুল মনে ভেবে দেখছে। রাত ভোর হলে বড় আদরের বড় ছেলের ফাঁসি হবে তাঁরাও অপেক্ষা করছেন। এই রাত্রির প্রতীক্ষার কোনো ইতিহাস নেই, কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। সতীনাথ এই কাহিনীর স্রষ্টা। মনের গভীরে সকলেই আমরা এই রাতটিকে সত্য বলে মানি। কিন্তু এই সত্যের অধিকার সাহিত্যের, ইতিহাসের নয়। 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' ইতিহাস, সতীনাথ ভাদুড়ী ইতিহাস বলেই লিখেছেন। 'রামচরিতমানস' যেমন রামচন্দ্রের জীবন-বর্ণনা, হিন্দুমানসের প্রথম ইতিহাস, 'ঢোঁড়াই-এর কাহিনীও সেই গোত্রের রচনা। উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চল ও নিম্নবর্গের মানুষকে নিয়ে কাহিনী। এই কাহিনীতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা হলেও এই গল্পের জোর অন্যত্র। এখানে নিম্নজাতির মানুষদের জীবনযাত্রাই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। সতীনাথের সাবলীল রচনা সাহিত্যে দুর্লভ। 'ঢোঁড়াই' এর কাহিনীতে বর্ণনা স্বচ্ছন্দ, কারণ স্রষ্টা এখানে দর্শক। ঐতিহাসিকও ঠিক এইরকম উপাখ্যানই লিখতে চান। মালমশলা থাকলে লিখতেও পারেন। অন্যদিকে সতীনাথ ঢোঁড়াই ও রামিয়ার সম্পর্ক যেমন করে গল্পের একটি এবলম্বন হিসেবে তৈরি করেছেন, ঐতিহাসিকের আবার সেই অধিকার নেই। ঐতিহাসেক দর্শক মাত্র, স্রষ্টা নন। কিন্তু সাহিত্যিক যখন ঈশ্বরে ভূমিকা পরিত্যাগ করে দর্শকের ভূমিকাতে নেমে আসেন তখন সাহিত্য ও ইতিহাসের বিশেষ এক সাযুজ্য চোখে পড়ে। সেভাবে ভেবে দেখলে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' ইতিহাসধর্মী সাহিত্য।

যেহেতু ঐতিহাসিক চিরকালের বাইরের লোক, সেজন্য ইতিহাস সাধারণতঃ বড় সময়ের চৌহদ্দিতেই থাকে। ছোট সময়ে নেমে আসার চেষ্টা অবশ্য ইদানীংকালে ইতিহাস রচনায় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও সাহিত্য ও সাহিত্যিকই ঐতিহাসিকের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন। যত্রতত্র তাঁর অবাধ চলাফেরা। বড় সময়, বিশেষ মানুষের ছোট সময় ছেড়েও সাহিত্যিক একজন মানুষের ব্যক্তিগত সময়ে নেমে আসতে পারেন। টলস্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পীস' পড়লে মনে হয় দুই ভিন্ন ভিন্ন বই পড়ছি। তার কারণ ইতিহাসের মঞ্চসজ্জা নয়, তার কারণ, একই রচনায় দু-রকম সময়ের চমকপ্রদ ব্যবহার। টলস্টয় নেপোলিয়নের মস্কো অধিকারের কথা বলছেন, এক নিঃশ্বাসে প্রিন্স আন্দ্রের মৃত্যু বর্ণনা করছেন। দুটি ঘটনা দু রকম সময় দিয়ে তৈরি। ইতিহাসের যে অখণ্ড সময় টলস্টয় তৈরি করা চেষ্টা করেছেন, সেই সময় দিয়েও কিন্তু ঐতিহাসিক সব হিসাবে মেলাতে পারবেন না। আন্দ্রের মৃত্যুতে উত্তরণ, নাটাশার বড় হওয়া, পিয়েরের শেষ স্থিতি ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসের বাইরেই থাকে। তাই এখানে কাছে এলেও ইতিহাস কিন্তু সাহিত্য থেকে পৃথক থাকে।

সবশেষে বলা যায়, কিছু কিছু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস ও সাহিত্যের সম্পর্কটা নিকট এবং ইদানীংকার ঐতিহাসিক রচনায় সেই নৈকট্য ঘোষিত হচ্ছে। তবে ইতিহাস দিয়ে জীবনের সবটুকু ব্যাখ্যা করা চলে না। মানুষের জীবনের বড় ধারা, ছোট ধারা এবং ব্যক্তিজীবন সব কিছুই সাহিত্য দেখায়। ইতিহাস সব কিছু দেখায় না। এখানেই ইতিহাসের থেকে সাহিত্যের বাস্তবতা অনেক বড় ও বেশি।

প্রশ্ন ১। সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি?

১.২.৫.২ ঃ ইতিহাস ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক বিউরী (Bury) ১৯০৩ সালে কেম্ব্রিজের এক বক্তৃতায় বলেন, ইতিহাস 'একটি বিজ্ঞান, তার বেশিও নয়, কমও নয়।' (History is a science, no less and no more), এর অনেক আগে ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার ইতিহাস যে বিজ্ঞান একথা বলে গেছেন। সব ইউরোপীয় ভাষাতেই 'বিজ্ঞান' এর সমার্থক শব্দের মধ্যে ইতিহাসকে বিনা দ্বিধায় অন্তভুক্ত করা হয়। আঠারো শতকের শেষে, জগৎ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও তার নিজস্ব শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান— এই দুই ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যখন প্রচুর বিষয় জানা যাচ্ছিল, তখন থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে বিজ্ঞান মানুষের সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানকে আরও এগিয়ে দিতে পারে কিনা। গোটা উনিশ শতক জুড়ে আস্তে আস্তে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। ইতিহাসও ছিল তার একটি।

ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত আজ উপেক্ষণীয় নয়। এবং ইতিহাসকে বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞানেরমত ইতিহাসও প্রশ্ন করে কী? কেন? এবং কীভাবে এবং এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করে। তাই আমাদের আলোচনা করা দরকার যে ইতিহাস কী ধরনের বিজ্ঞান এবং কতটুকু বিজ্ঞান? বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিল কোথায়, আবার পার্থক্যই বা কোথায়। এধরনের আলোচনার পটভূমি হিসেব বিজ্ঞান বলতে ব্যাপক অর্থে কী বুঝায় সংক্ষেপে তা তুলে ধরা দরকার। প্রথমতঃ বিজ্ঞান বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি 'বিশেষ জ্ঞান' যা নিয়মনিষ্ঠ ভাবে অর্জন করা যায় এবং যা নিয়মানুভাবে সংশ্লিষ্ট। এটা কতকগুলো সত্যভিত্তিক বা কতক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ এই সত্য আমাদের সফল ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহায্য করে এবং দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মধারা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ এটা নির্ব্যক্তিক। যেকোন সংস্কারমুক্ত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক সত্যকে সত্য বলতে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। অতএব ইতিহাস বিজ্ঞান কী বিজ্ঞান নয় তা নির্ধারণ করার প্রয়াসে এই সব উপরিউক্ত চিন্তা চেতনা মনে জাগ্রত রাখা উচিত।

যেসব পদ্ধতিতে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক জগৎকে অনুধাবন করে তা প্রয়োগ কার হয়েছিল নানান মানসিক বিষয়ের অনুধাবনে। এইপর্যায়ের প্রথম দিকে বজায় ছিল নিউটনীয় ঐতিহ্য। প্রাকৃতিক জগতের মতো সমাজকেও ভাবা হয়েছিল একটি যান্ত্রিক ব্যাপারে। ১৮৫১ এ প্রকাশিত হার্বার্ট স্পেন্সর এর একটি বই, 'সামাজিক স্থিতিবিদ্যা' (সোসাল স্ট্যাটিক্স) কে এখনও মনে রাখা হয়। এরপর আর-একটি বৈজ্ঞানিক বিপ্লব আনলেন ডারউইন। আর সমাজবিজ্ঞানীরা জীববিদ্যা থেকে তাঁদের সূত্র নিয়ে সমাজকেও সপ্রাণ বলে ভাবেত শুরু করলেন। কিন্তু ডারউইনীয় বিপ্লবের প্রকৃত গুরুত্ব হোল তিনি বিজ্ঞানের মধ্যে নিয়ে এলেন ইতিহাস। এবার থেকে গতিহীন ও সময়হীন কোন ব্যাপারে নয়, বরঞ্চবিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয় হলো পরিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়া। ইতিহাস প্রগতিকে সুনিশ্চিত ও পরিপুরণ করল বিজ্ঞানে বিবর্তন।

ইতিহাসচর্চা ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি হল প্রথমে তথ্য জোগাড় করা, তারপর সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানের পদ্ধটিও ঠিক এইরকমই। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তার যন্ত্ররাতি, নানা সরঞ্জাম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং অবশেষে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত উপনীতহন। এদিক দিয়ে ইতিহাসচর্চাও যে নিজস্ব পদ্ধতিতে ও কলাকৌশলের মাধ্যমে এগিয়ে যায় তাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞা বলা খুবই যুক্তিসঙ্গত। ঐতিহাসিক মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডকে গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচিত করে বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে।

অবশ্য সাধারণের চোখে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের যুক্তিতে কোন প্রকার পেশাগত অনুশীলন ছাড়াই ঐতিহাসিকের কাজ সাধারণের বোধগম্য হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজকর্ম জটিল এবং নানা কলাকৌশল ও কারিগরী জ্ঞানে ভরপুর। এটা সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। একমাত্র যারা বিশেষজ্ঞ তারাই কেবল বুঝতে পারে। কিন্তু এ সঠিক নয়। সকলেই ইতিহাস লিখতে, পড়তে ও বুঝতে পারে না। জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও পেশাদার ঐতিহাসিক ও অপেশাদার পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, কোন সাধারণ পাঠককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি ও ঘটনাপ্রবাহের উপর ইতিহাস লিখতে দিলে তিনি বিপদে পড়বেন। কারণ তথ্য জোগাড়, তথ্য গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে তিনি হিমসিম খেয়ে যাবেন। কোন্‌টি ঐতিহাসিক তথ্য, কোন্‌টি নয় তা বোঝার জন্য তাকে পেশাদার গবেষক বা ঐতিহাসিক হতে হবে। শুধুমাত্র একজন পেশাদার ঐতিহাসিকই কাজটি সঠিক ও সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করতে পারবেন। অতএব দেখা যায় ইতিহাস পঠন-পাঠন ও লিখনে বিষয়টির নিজস্ব নিয়মকানুন ও পদ্ধতি বর্তমান। ঐতিহাসিক হতে হলে এবং ইতিহাস বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জনে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে এগুলো অবশ্যই রপ্ত করতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা সমীচীন হবে।

তথ্য অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকেরা যেসব প্রকল্প ব্যবহার করেন তাদের অবস্থানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ব্যবহৃত প্রকল্পের অবস্থানের লক্ষণীয় মিল আছে। উদাহরণ হিসেবে মাক্‌স্ ভেবর-এর প্রটেস্ট্যান্টবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্কের বিখ্যাত লক্ষণ নির্ণয়টির কথা ভাবা যেতে পারে। আজ এটিকে সূত্র বলা কারোর পক্ষেই উচিত নয়। যদিও আগের কোন যুগে এটিকে বোধহয় সূত্র হিসেবেই স্বাগত জানানো হত। এটি একটি প্রকল্প। ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানে এটি অনুপ্রেরণা এনেছে এবং অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি খানিকটা পরিমার্জিত হলেও এর মাধ্যমে এই দুই আন্দোলন সম্পর্কেই আমাদের বোধ, ধারণা আরও প্রসারিত হয়েছে। ঠিক তেমনি মার্কসের বিবৃতি উদ্ধৃতি করে উপরিউক্ত যুক্তি দেখানো যায়। মার্কস বলেন, ''হাতে চালানো কল এনে দেয় সামন্তপ্রভু সমেত এক সমাজ ঃ বাষ্পচালিত কারখানা এনে দেয় শিল্প পুঁজিপতি সমেত এক সমাজ।'' আধুনিক পরিভাষায় এটি কোনো সূত্র নয়, যদিও মার্কস হয়তো তেমন দাবিই করতেন। কিন্তু এটি একটি ফলদায়ক প্রকল্প যা আরও অনুসন্ধান ও নতুন বোধের পথ দেখায়। এইসব প্রকল্প ভাবনার অপরিহার্য হাতিয়ার। ঠিক তেমনি ইতিহাসকে বিভিন্ন পর্বে ভাগ করাটা কোনো তথ্য নয়, বরং একটি প্রয়োজনীয় প্রকল্প বা চিন্তার হাতিয়ার। ঐতিহাসিক যে প্রকল্প গ্রহণ করেন তাই দিয়ে তাঁর পক্ষপাত বিচার করা যায়।

ইদানীংকালে বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকেরা আশা পোষণ করেন যে, তাঁরা একটি টুকরো প্রকল্প থেকে ক্রমেই আর একটির দিকে এগিয়ে যাবেন, তাঁদের ব্যাখ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে আলাদা করবেন ও তাঁদের ব্যাখানকে

যাচাই করবেনতথ্য দিয়ে। তাঁরা উভয়ে যেভাবে কাজ করেন তার মধ্যে মূলগত কোন তফাত নেই। একজন ঐতিহাসিক ও একজন পদার্থবিদ পরস্পর নিঃসম্পর্কিতভাবে একই সমস্যাকে প্রায় ঠিকই একসঙ্গে সূত্রবদ্ধ করবেন তা সত্যিই মনে দাগ কাটার মত।

তবে গাণিতিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা এইসব পর্যায়ের নানান বিজ্ঞানের মধ্যে যেমন বিরাট পার্থক্য আছে, তেমনি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। এই পার্থক্যই ইতিহাসকে ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলার ক্ষেত্রে যে সব আপত্তি তোলা হয় তা হলো ঃ (১) ইতিহাস একান্তভাবেই অনন্য নিয়ে চর্চা করে, আর বিজ্ঞান চর্চা করে সাধারণ নিয়ে। (২) ইতিহাস কোন শিক্ষা দেয় না, কিন্তু বিজ্ঞান সাধারণকে অনেক শিক্ষা দেয়। (৩) ইতিহাস ভবিষ্যদবাণী করতে পারে না। (৪) ইতিহাস মূলতঃ বিষয়নিষ্ঠ, কারণ মানুষ নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করছে। (৫) ইতিহাসের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত নানান ব্যাপার জড়িয়ে থাকে, বিজ্ঞানে তা নেই। এখন ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই অভিযোগগুলি কতখানি সত্য তা পরীক্ষা করা যাক।

প্রথম অভিযোগটি হল ইতিহাস অনন্য ও বিশেষ নিয়ে চর্চা করে আর বিজ্ঞান চর্চা করে সাধারণ ও নির্বিশেষ নিয়ে। অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে কলিংউড এবং আরও কেউ কেউ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে এই একই পার্থক্যের কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক E.H. Carr-এর মতে, এই ধারণা একটি ভুল বোঝাবুঝির উপর দাঁড়িয়ে আছে। হবস্-এর বিখ্যাত প্রবচনটি এখনও প্রয়োজন। 'নাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নির্বেশেষ নয়, কারণ যেসব জিনিসের নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও একক।' প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি নিঃসন্দেহে সত্য, কোনো দুটি ভৌগোলিক গড়ন, একই প্রজাতির কোনো দুটি প্রাণী, দুটি পরমাণুও অভিন্ন নয়। তেমনি দুটি ঐতিহাসিক ঘটনাও অভিন্ন নয়। ঐতিহাসিক যে ভাষা ব্যবহার করছেন এই ব্যাপারটি তাঁকে, বিজ্ঞানীর মতোই, সাধারণীকরণের প্রতি দায়বদ্ধ করে দেয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল খুবই আলাদা ধরনের এবং দুটোই ছিল অনন্য। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা দুটোকেই যুদ্ধ বলেন। এখানে দুটি অনন্য ঘটনার সাধারণীকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক আসলে অনন্যোর প্রতি আগ্রহী নন, বরং সাধারণের মধ্যে যা অনন্য তাতেই তাঁর আগ্রহ। বিশ শতকের পরিস্থিতিতে যুদ্ধের নানান কারণ নিয়ে সাধারণীকরণের ব্যাপারটি ঐতিহাসিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। ইতিহাসের পাঠক ও ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করে চলেছেন। ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণকে তিনি তাঁর পরিচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেন—বা হয়তো তাঁর নিজের যুগেই। অতএব ইতিহাসের সাল সাধারণীকরণের কোন সামঞ্জস্য নেই এটা বলা ঠিক হবে না। সাধারণীকরণেই ইতিহাসের সমৃদ্ধি ঘটে। 'কেম্ব্রিজ আধুনিক ইতিহাস' (Cambridge Modern History)-এর একটি খণ্ডে Elton (এলটন) বলেছেন, 'ঐতিহাসিক তথ্যের সংগ্রাহকের থেকে ঐতিহাসিককে যা আলাদা করে দেয় তা হলো সাধারণীকরণ'।

ইতিহাস যে বিজ্ঞান এই মত আজ উপেক্ষণীয় নয়। এবং বিভিন্ন কারণে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়। বিজ্ঞানের মত ইতিহাসও প্রশ্ন করে কী? কেন? শুধু তাই নয়, ইতিহাস চর্চার ন্যায় বিজ্ঞানের পদ্ধতিও ঠিক একরকম। বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরিতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান ঠিক একই রকমভাবে ঐতিহাসিকও নিজস্ব পদ্ধতি ও কলাকৌশলের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার জন্য এগিয়ে চলে। কিন্তু ঐতিহাসিকরা কখনও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হতে পারে না। তবে তাঁরা ভবিষ্যৎ গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

অনন্য ও সাধারণের মধ্যে সম্পর্কই ইতিহাসের আলোচ্য। ঐতিহাসিক হিসেবে কেউ যেমন তথ্য ও ব্যাখানকে আলাদা করতে পারেন না, তেমনি আলাদা করতে পারেন না অনন্য ও সাধারণকে, বা এর কোনোটিকে অন্যটির তুলনায় অগ্রাধিকারও দিতে পারেন না।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের শিক্ষা কী? এই প্রশ্নটি সাধারণীকরণের প্রশ্নটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সাধারণীকরণের আসল কথা হলো, এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাস থেকে শেখার চেষ্টা করি, একসারি ঘটনা থেকে সংগৃহীত শিক্ষা প্রয়োগ করি অন্য একসারি ঘটনাতে। সাধারণীকরণের সময় সচেতন বা অচেতনভাবে এই কাজটিই করার চেষ্টা হয়।

মানুষ ইতিহাস থেকে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করে। প্রচুর পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্য দিয়ে তা প্রমাণ করাও কঠিন নয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী সব প্রতিনিধিরা একশ বছর আগের ভিয়েনা কংগ্রেসের শান্তি সম্মেলন থেকে নানা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের ঐ সব শিক্ষাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের, ১৮৪৮-এর বিপ্লবের, ১৮৭১-এর প্যারী কমিউনের নানান শিক্ষা রুশ বিপ্লবের নায়কদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভুরি ভুরি রয়েছে। তবে ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ কখনোই একতরফা প্রক্রিয়া নয়। অতীতের আলোয় বর্তমানকে শেখা মানে একইসঙ্গে বর্তমানের আলোয় অতীতকে দেখা। অতীত ও বর্তমানের পারস্পরিক সম্পর্কে মধ্য দিয়ে দুটির মধ্যে সম্পর্কের আরও গভীর এক বোধ সঞ্চারিত করাই ইতিহাসের শিক্ষা ও কাজ।

ইতিহাসের বিরুদ্ধে আরও একটি অভিযোগ ঃ ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষাই পাওয়া যায় না, কারণ ইতিহাস বিজ্ঞানের মত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। তবে এক্ষেত্রেও প্রশ্নটি গভীরভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। আগের মত ইদানীংকালে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির বিভিন্ন সূত্র নিয়ে কথা বলতে উৎসুক নন। বিজ্ঞানের যে সব সূত্র রয়েছে এবং যে সব সূত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলো আসলে প্রবণতা সংক্রান্ত বিবৃতি, অন্যান্য অবস্থা একইরকম থাকলে বা পরীক্ষাগারের পরিবেশে কী হবে সেই সম্পর্কে বিবৃতি। বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কী হবে সেই নিয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করার দাবি বৈজ্ঞানিক করেন না। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র দিয়ে প্রমাণ হয় না যে ঐ বিশেষ অ্যাপেলটি মাটিতে পড়বে, কেউ হয়তো সেটিকে ঝুড়িতে ধরে ফেলতে পারে। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন— আলো সরলরেখায় চলে—আলোকবিদ্যার এই সূত্রটি প্রমাণ করে না যে, একটি বিশেষ আলোকরশ্মি মধ্যবর্তী কোন বস্তুর মাধ্যমে প্রতিসারিত বা বিচ্ছুরিত হতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এইসব সূত্র মূল্যহীন বা নীতিগতভাবে বৈধ নয়। আজকের দিনে বিজ্ঞান এটা মনে রাখার বেশি পক্ষপাতী যে আরোহ শুধু যুক্তির দিকে দিয়ে নানারকম সম্ভাব্যতা বা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এবং বিজ্ঞান তার নানান ঘোষণাকে সাধারণ নীতি বা নির্দেশক—যাদের বৈধতা শুধু কোনো নির্দিষ্ট ক্রিয়াতে যাচাই করা যায়—সেই হিসেবে গণ্য করতে বেশি আগ্রহী। কোঁত যেমন বলেছিলেন, 'জ্ঞান থেকে আসে দূরদৃষ্টি, দূরদৃষ্টি থেকে কর্ম।' সাধারণ ও বিশেষ, সর্বজনীন ও অনন্যের ভেতর এই পার্থক্যের মধ্যেই ইতিহাসে ভবিষ্যদবাণীর সূত্রটি নিহিত আছে। ইতিপূর্ব আলোচনায় বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক সাধারণীকরণ করতে বাধ্য; এবং তা করতে গিয়েই তিনি ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য বিভিন্ন নির্দেশকের যোগান দেন। এইসব নির্দেশক নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী না হলেও একইসঙ্গে বৈধ ও উপযোগী।

তবে একথাও সত্যি যে, ঐতিহাসিক বিভিন্ন নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদবাণী করতে পারেন না, কারণ নির্দিষ্ট মানে অনন্য এবং তার মধ্যে আকস্মিকতার উপাদান এসে পড়ে। কারণ ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যদ্‌বাণী অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি একটি সাধারণীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্মের ক্ষেত্রে একটি বৈধ ও উপযোগী নির্দেশক। ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা (Prophet) নয়। তিনি কেবল কোনো ঘটনা বা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

তবে একইসঙ্গে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে তা মেনে নেওয়া প্রয়োজন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক মূলতঃ সাধারণ সত্য উদ্‌ঘাটনে নিয়োজিত থাকে এবং ভবিষ্যদ্‌বাণী করাও তার কাজের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক কোন ঘটনার ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারেন না। কারণ তিনি পৃথক পৃথক ঘটনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন এবং তাঁর কাজকর্মের পক্রিয়ায় কদাচিৎ সর্বজনীন সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায়। একাকী সংঘটিত বিষয়াদির ওপর মনোযোগ নিবন্ধ থাকার জন্যই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে ব্যর্থ হয়। তবে একথাও ঠিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাঁদের দুজনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি মূলতঃ আলাদা নয়।

ইতিহাসসহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে আলোচক ও আলোচ্য একই পর্যায়ভুক্ত থাকে এবং একে অপরের ওপর পারস্পরিকভাবে ক্রিয়াশীল। মানবিক আচরণের মধ্যে যে ইচ্ছে ক্রিয়াশীল থাকে সেই আচরণের বিভিন্ন রূপভেদ করার প্রয়োজন হয় সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ বা ঐতিহাসিকের, যাতে তিনি ঠিক ধরতে পারেন তাঁর অনুধাবনের বিষয়বস্তু যে মানুষ সে যখন সক্রিয় হয়েছে তখন তার কেন সক্রিয় হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। এতে পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিত—অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়—এই দুই এর মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয় যেটা একান্তই ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ব্যাপার। ঐতিহাসিক যা পর্যবেক্ষণ করেন তার প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়ে; ইতিহাস আগাগোড়াই আপেক্ষিকতায় ভরা। ইতিহাস সচেতন লোকেদের মধ্যে ইতিহাস কেন কদাচিৎ নিজের পুনরাবৃত্তি করে তার একটা কারণ এই যে, নাটকের কুশীলবরা দ্বিতীয়বার অভিয়নের সময়ে প্রথমবারের পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ থাকে এবং তাদের কার্যকলাপ প্রভাবিত হয় ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে। পর্যবেক্ষক ও পর্যবেক্ষিতের মধ্যে এবং ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া তা অবিচ্ছিন্ন ও অবিরতই পরিবর্তনশীল এবং এটাই ইতিহাসসহ বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে মনে হয়।

বিশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী তাঁদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে ভাষায় কথা বলেছেন তাতে বস্তুজগৎ ও ঐতিহাসিকের জগতের মধ্যে আরও বেশি লক্ষ্য করার মতো মিল পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, তাঁদের গবেষণার ফলাফলের মধ্যে নাকি একটি অনিশ্চয়তা বা অনির্ণেয়তার নীতি জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে আমাদের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ক্ষমতা সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে দেশ ও কালের দূরত্ব ও অতিক্রান্তির যে পরিমাপ, তা 'পর্যবেক্ষকের' গতির ওপর নির্ভরশীল। অতএব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের ন্যায় 'পর্যবেক্ষক' ও পর্যবেক্ষণের বিষয়টি এসে পড়ে। তবে তা সত্বেও এটা বলতে হবে যে কতকগুলি পার্থক্যের দরুন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁদের চর্চার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ভৌতবিজ্ঞানীর তাঁর বিষয়ে যুক্ত হওয়ার থেকে অন্য ধরণের।

ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে ইতিহাস সাধারণভাবে বিজ্ঞান থেকে আলাদা বলা হয়ে থাকে। কোনো অতি ঐতিহাসিক শক্তি তা যাই হোক না কেন, তার উপর ইতিহাসের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ভরশীল—এই বিশ্বাস ভুল। এতে ইতিহাস পূর্ণতা লাভ করে না। নৈতিকতার প্রশ্নে বলা যায়— ঐতিহাসিকের পক্ষে তাঁর গল্পের চরিত্রদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায় ঘোষণা করার দায়িত্ব নেই। ঐতিহাসিক ও নীতিবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। নৈতিক চরিত্র দিয়ে যদি ইতিহাসের ঘটনা বিচার করা হত তবে ইতিহাসে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী বা রাশিয়ার স্টালিনের মূল্যায়ন অন্যবাবে করা হতো। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নৈতিক রায়দান ঐতিহাসিকের কাজ নয়, বরং তাঁর এক্ষেত্রে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য কাজ রয়েছে। তবে ইতিহাসের এই নৈতিক রায়দানের ক্ষেত্রে যে বিচ্যুতি ঘটেনি তা নয়, ঐতিহাসিক অনেক সময়ই নৈতিক রায় সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। অতি-ঐতিহাসিক মূল্যায়নের কাঝে অনুগত্য স্বীকার করেন। তখন ইতিহাস তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেলে।

প্রশ্ন

১। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে।

২। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে বিভাজনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

১.২.৫.৩ ঃ উপসংহার

সবশেষে বলা যায়, বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের মধ্যে লক্ষ্য, পদ্ধতি নিয়ে যত বোঝাপড়া গড়ে উঠবে তত ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সব ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে তার অবসান হবে। বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক—এঁরা সবাই একই চর্চার বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত, মানুষ ও তার পরিবেশ, পরিবেশের উপর মানুষের এবং মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব। চর্চার উদ্দেশ্যটি একইরকম; পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের বোঝাপড়া ও পরিবেশের উপর তার প্রভুত্ব বাড়ানো। খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানী, ভূতাত্ত্বিক, মনোবিদ ও ঐতিহাসিকের মধ্যে পূর্বানুমান ও পদ্ধতিতে ব্যাপত পার্থক্য আছে। ব্যাখ্যা করতে চাওয়ার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং প্রশ্ন ও উত্তরের যে মূল কার্যপদ্ধতি—তাতে ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী দুজনেই একজোট। অন্য যে কোন বিজ্ঞানীর মতোই ঐতিহাসিকও একজন ব্যক্তি যিনি সারাক্ষণই 'কেন?' এই প্রশ্নটি করে চলেন এবং তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন।

১.২.৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাস ও সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত।
২। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—অমলেশ ত্রিপাঠী।
৩। ইতিহাস চর্চা—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। কাকে বলে ইতিহাস—ই. এইচ. কার।
৫। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক—মমতাজুর রহমান তরফদার।
৬। ইতিহাস তত্ত্ব—এম. দেলওয়ার হোসেন।

১.২.৫.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করো।

২। ইতিহাস ও সাহিত্যের কোথায় কোথায় মিল আছে?

৩। ইতিহাস ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায় কোথায়?

৪। ইতিহাস কী বিজ্ঞান?

৫। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মিল আছে?

৬। কোন্ কোন্ দিক দিকে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়?

একক ৬

History and other Disciplines

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.২.৬.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.২.৬.১ ঃ সূচনা

১.২.৬.২ ঃ ইতিহাস ও অর্থনীতি

১.২.৬.৩ ঃ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

১.২.৬.৪ ঃ ইতিহাস ও ভূগোল

১.২.৬.৫ ঃ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

১.২.৬.৬ঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১.২.৬.৭ ঃ ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যা

১.২.৬.৮ ঃ ইতিহাস ও ভাষাবিদ্যা

১.২.৬.৯ ঃ ইতিহাস ও দর্শন

১.২.৬.১০ ঃ ইতিহাস ও গ্রন্থপঞ্জী

১.২.৬.১১ ঃ সহায়ক প্রশ্নাবলী

১.২.৬.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতিহাস ও অন্যান্য নানা বিষয়ের সম্পর্ক

(২) ইতিহাসের উপর অর্থনীতির প্রভাব?

(৩) ইতিহাস ও রষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

(৪) ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব

(৫) ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

(৬) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক

(৭) ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক

(৮) ইতিহাস ও নৃতত্ত্বেবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক

(৯) ইতিহাস ও দর্শনের সম্পর্ক

১.২.৬.১ ঃ সূচনা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নানা প্রয়োজনে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে এবং যত দিন যাচ্ছে এই নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। ঠিক তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের অফুরন্ত প্রসারের ফলে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা একে অপরের পরিপুরক বা অনুপুরকের কাজ করছে। বর্তমানে জ্ঞানের কোন শাখাই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে দাবী করতে পারে না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংযোগের ফলে প্রত্যেকটি শাখাই পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে। বর্তমানে 'inter-disciplinary' শব্দটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক, ঐতিহাসিক সকলের কাছেই সুপরিচিত। বিভিন্ন শাখার মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে আধুনিককালের জ্ঞানচর্চার গতি প্রসারলাভ করছে এবং সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাসও অন্যান্য জ্ঞানের শাখাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাস তাই আজকে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা জ্ঞানের নানা শাখাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। আজ ইতিহাস বলতে বোঝায় রাজা-রাজাদের কাহিনী নয়। মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে যে সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন আবর্তিত হচ্ছে তা সবই ইতিহাসের অংশবিশেষ। আজ তাই ছাত্ররা 'total history' বা সামগ্রিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে।

জ্ঞানের স্বীকৃত শাখা হিসেবে ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের নানা শাখাগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলেছে।

প্রশ্ন ১। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাই কেন পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে?

১.২.৬.২ ঃ ইতিহাস ও অর্থনীতি

অর্থনীতির আলোচনাকে বাদ দিয়ে আজ গবেষক ও ঐতিহাসিকের দল ইতিহাসিকের দল ইতিহাসকে ভাবতে পারেন না। সাধারণভাবে সম্পদ সংগ্রহ, সম্পদ বিতরণ ও সম্পদ ভেআগ করায় যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকেই অর্থনীতি বলে অভিহিত করা যায়। ইতিহাসের যে বিরাট কর্মযজ্ঞ তা কখনও মানবজীবনকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। এই মানুষের জীবনধারনের জন্য একান্ত পয়োজন অর্থ। তাই মানুষের কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই বহুমুখী প্রয়োজন মেটাবার জন্য ধন-সম্পদ সংগ্রহে নিয়োজিত থাকে। আবার ইতিহাস গবেষণার একটা দিক হল মানুষের অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান চালানো। এ কারমে প্রাচানকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের আর্থিক চাহিদার প্রকৃতি বুঝতে পারলে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে মানবীয় কর্মকাণ্ডের সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ সহজতর হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ (Economic determinism) দ্বারাই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব। এ তত্ত্বের উদগাতা স্বয়ং কার্ল মার্কস। তবে সকলে হয়তো

প্রাচীনকাল থেকে শুরুর করে আজ পর্যন্ত মানুষের আর্থিক চাহিদার প্রকৃতি বুঝতে পারলে একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে মানবীয় কর্মকাণ্ডের সঠিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সহজতর হবে। একমাত্র অর্থনৈতিক নিমিত্তবাদ দ্বারই ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব। ইতিহাস অর্থনিতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় সরবরাহ করে থাকে।

বা এ তত্ত্বের সঙ্গে একমত হবে না এবং আধুনিককালের নানা ঐতিহাসিকের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধও সুস্পষ্ট। তবে এ কথাও সত্য যে, ইতিহাসচর্চার বা দর্শনের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই অর্থনৈতিক বিষয়াদিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সম্ভব নয়, বরং এই সব বিষয়াদি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে হয়। প্রাচীনকালের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনাতিতে উৎপাদনব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন উৎপাদিত দ্রব্য ও তার বিলিব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি মুখ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কোনো কোনো যুগে, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই অর্থনৈতিক বিষয়াদি মানুষের কর্মকামেড চুড়ান্ত নিয়ন্ত্রক ও নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে আসছে। কিছু কিছু আকর্ষনী উপাদান বাদ পড়লেও, শুধু অর্থনীতির নিরিখে আধুনিক ও সমসাময়িক সমাজের উদ্ভব ব্যাখ্যা করলে প্রায় চূড়ান্ত সত্যের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব। তা ছাড়া ইতিহাসের এমন কোনো যুগ নেই— কি প্রাচীন, কি মধ্য, কি আধুনিক, যখন মানব সমাজের উপর অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করা সম্ভব হত। এ কারণেই গবেষক এবং ঐতিহাসিককে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর অধিকতর জোর দিতে হয়। আর ও কাজে মুন্সিয়ানা দেখাবার জন্য ঐতিহাসিকদের সম্পদ তৈরি ও ব্যবহার প্রক্রিয়ার সাথে ভালভাবে পরিচিত হতে হয়। অর্থনীতি সম্পর্কে তার ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি এই কাজে যত দক্ষতা দেখান, তিনি একজন দক্ষ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের খ্যাতি অর্জন করেন। জটিল আধুনিক দগতে ঐতিহাসিকের জন্য অনুরূপ দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ১। কিসের দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লষণ সম্ভব?

অবশ্য ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকও একজন অর্থনীতির ছাত্র, গবেষকের কার্যক্রম সহজ করতে অনেক অবদান রাখতে পারে। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ও চালিকা শক্তির ধরণ একমাত্র ইতিহাসই ব্যক্ত করতে পারে এবং অর্থনীতিবিদদের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসে তাদের কাজকে সহজতর করে তুলতে পারে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপট পর্যাপ্তভাবে রপ্ত করা ছাড়া বর্তমান মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এর ফলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হতে বাধা। ইতিহাসই অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়োজিত গবেষকদের অতি প্রয়োজনীয় আর্থিক বিষয় সরবরাহ করতে পারে। দৃষ্ঠান্ত হিসেবে বলা যায়, প্রাচীন ভারতের সিন্ধুসভ্যতা বা বৈদিক সভ্যতার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বা মধ্যযুগের ভারতের মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, আধুনিককালে অর্থনীতির গবেষকদের নানা সুবিধা করে দেয়। তাছাড়া ইতিহাস অনেক ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রমাণাদির সাহায্যে অর্থনীতি ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্কের স্বরূপ অর্থনীতিবিদদের সামনে তুলি ধরে। মোটের উপর বলা যায়, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইতিহাস ও অর্থনীতি এই বিষয় দুটি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ তাই 'অর্থনীতির' বহু বি,য় ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠক্রমে অন্তভুক্ত করা হয়েছে এবং অন্যদিকে ইতিহাসের অনেক কিছু অর্থনীতির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য পাঠক্রমে ঢোকানো হয়েছে।

১.২.৬.৩ ঃ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

ইতিহাসকে মূল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার ফসল বলে অভিহিত করা যায়। (History is the root, political Science is the fruit) এই কথাটি ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন ও এই সঙ্গে যুক্তিযুক্তও। আবার অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঐতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করেন যে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বিষয়টি তার নিজের লেখার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান ও অপরিহার্য।

দীর্ঘকাল ধরে বেশির ভাগ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক বিষয়াদি ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। রাজনৈতিক সংগঠনের মূল কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে ইতিহাস রচনা খুবই নিম্নমানের ও অস্পষ্ট হবে। এজন্য ইতিহাসকে মূল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার ফসল বলা হয়।

'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বলতে কি বোঝায়? যে কোন রাষ্ট্র বিষয়ে জ্ঞান বা বিদ্যা হল 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সম্পর্কে জানা। দীর্ঘকাল ধরে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো, রাজনৈতিক বিষয়াদি ইত্যাদি ইতিহাস গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করছে। অথচ কমসংখ্যক ঐতিহাসিকেরই 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' সম্পর্কে নিয়মানুযায়ী ধারণা আছে। অবশ্য আইনসংক্রান্ত প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণাযুক্ত ইতিহাস প্রণেতাগণ রাজনৈতির প্রেক্ষাপটের মূল উদঘাটনে তৎপর ছিলেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ইতিহাসে অনেক অসঙ্গতি থাকত। কারণ তারা শুধু রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব বা রাজনীতিবিদদের জীবনর সংগঠিত ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রাজনৈতিক ঐতিহাসিকের স্বীকার করেন যে, রাজনৈতিক তত্ত্বের প্রকৃতি বিচার বা রাজনৈতিক সংগঠনের মূল কাঠামো সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান না থাকলে সেই বিষয়ে ইতিহাস রচনা খুবই নিম্নমানের ও অস্পষ্ট হবে। এ কারণে সার্থক ইতিহাসচর্চার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত দরকার।

প্রশ্ন

১। রাষ্ট্র বিজ্ঞান কাকে বলে?

২। History is the root, political Science is the fruit-এই কথাটি কেন ব্যবহার করা হয়?

অন্যদিকে ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লেখার সময়ে অনেক রাজনৈতিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এর মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিকরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কাছে ব্যাপক মৌলিক উপাদান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। আর এ সব তথ্যের আলোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ তথ্যগণ ও তত্ত্বগত আলোচনা জোরদার করতে পারেন। এর ফলে রাজনৈতিক ইতিহাস পরস্পরের সাহায্যে পরিপুষ্ট হবার সম্বাবনা থাকে।

১.২.৬.৪ ঃ ইতিহাস ও ভূগোল

ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক খুবই প্রাচীন। সূর্য এবং চাঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক, এই বিষয় দুটির সম্পর্ক ঠিক একই বললে অতিশযোক্তি হবে না। উচ্চমানের ইতিহাস রচনার জন্য, বিশেষববে সামরিক ও কুটনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য মোটামুটি ভাবে ভৌগোলিক জ্ঞান এবং মানচিত্রের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত

প্রয়োজন। এমনকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও একটি উপযুক্ত ভৌগলিক প্রেক্ষাপটে তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

উচ্চমানের ইতিহাস রচনার জন্য ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলের মতে, ইতিহাস বিশ্লেষণ মুখ্যত ভৌগোলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূগোলবিদরা সংশ্লিষ্টদেশ ও এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ জানতে পারেন এবং তা নিয়ে তাদের চিন্তাধারা পুনগঠনের সুযোগ পান।

এই ভাবাদর্শ থেকেই ইতিহাসের জনক গ্রীক ঐতিহাসিক হেরেডোটাস সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথে ভূগোল ও পরিবেশের নিবিড় সংযোগের কথা বেশ জোর দিয়ে বলেন। 'গ্রীক-পার্সিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে মিশরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি নীলনদের প্লাবন, পলিমাটি বেষ্টিত ভূমির কথা এবং এদের প্রবাবের কথা জোড় দিয়ে বর্ণনা করেন। বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক মিশেলের মতে, ইতিহাস বিশ্লেষণ মুখ্যতঃ ভৌগলিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়টির উপর আরও জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, ভৌগলিক ভিত্তি ছাড়া ইতিহাসের মানুষের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা নিরর্থক। এতে বাস্তবতার কোন স্পর্শ থাকে না। নিদিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়ে থাকে। ভূমির গঠন,উর্বরতা, উৎপন্ন দ্রব্য, জলবায়ু, প্রকৃতি নানাভাবে মানুষের কার্যক্রমের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এখন সাধারম রূপ নিয়েছে। ভারত ও ভারতবর্ষের লোকেদের উপর প্রকৃতি, জলবায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশের যে বিপুর প্রভাব রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুদূর অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস ও ভারতীয়দের জীবনযাত্রা ভূগোল ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ভারত উপমহাদেশ ও বাংলার ইতিহাসে ভৌগলিক প্রভাব কার না জানা।

অন্যদিকে ইতিহাসের বর্ণনা ও নানা ঘটনা থেকে ভূগোলবিদেরা সংশিষ্ট দেশ ও এলাকার ভৌগলিক বিবরণ যেমন জানতে পারেন তেমনি তা নিয়ে তাদের চিন্তাধার পুনগঠনেরও সুযোগ পান। তাই ইতিহাস ও ভূগোল পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন

১। কোন ঐতিহাসিক সর্বপ্রথম মানুষের কর্মকান্ডের সাথে ভূগোল ও পরিবেশের নিবিড় সংযোগের কথা বেশ জোর দিয়ে বলেছিলেন?

১.২.৬.৫ ঃ ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান

ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা উভয়ের মধ্যে বিষয়গত সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। আগষ্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। আবার তিনি ইতিহাসচর্চার বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। অতএব কোঁত ছিলেন একাধারে সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাস গবেষক। ঠিক একই কথা ভালভাবে প্রযোজ্য কার্ল মার্কসের ক্ষেত্রে। মার্কস ছিলেন একজন মহান সমাজবিজ্ঞানী, আবার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। অতএব সে দিক দিয়ে বিচার করলে তিনি একজন মহান ঐতিহাসিকও ছিলেন।

সমাজ বিজ্ঞানের জনক আগষ্ট কোঁত ইতিহাস চর্চার বিকাশের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে। জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুটি শাখার মধ্যে বিরামহীন ও ফলদায়ক লেনদেন অব্যাহত।

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান এই উভয় বিষয়টি সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যলোচনা করে থাকে। এক্ষেত্রে বিষয় দুটির মধ্যে পার্থক্য হল শুধু পদ্ধতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বিভিন্নতা। অবশ্য জ্ঞান অনুশীলনের ক্ষেত্রে এই দুই শাখার মধ্যে বিরামহীন ও ফলদায়ক লেনদেন অব্যাহত আছে।

অবশ্য অধুনা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য নজরে পড়ছে। সমাজবিজ্ঞানীগণ দু ধরনের কাজে নিয়োজিত আছেন। কাজকর্মের প্রথম ধাপে তারা মানুষের কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ এলাকাগুলো ধরে একটা ব্যাপক ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। এ কাজে তারা ইতিহাস থেকে মাল-মশলা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানের এই যে পদ্ধতি অর্থাৎ ইতিহাসের উরপর নির্ভরশীলতা— এই কথা সমাজবিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না। অবশ্য প্রত্যুত্তরে ইতিহাসও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সুবিধা নেয়। যেমন সমাজবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে তারা অনেক কিছু গ্রহণ করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপে অধুনা মানুষের সুক্ষাতিসূক্ষ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিয়ে বিশদ ও বিস্তারিত গবেষণায় ব্যস্ত আছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই ধরনের প্রক্রিয়ার উদ্ভট ঘটে। অনুরূপ জ্ঞানচর্চায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রাধান্যলাভ করে ও ফলপ্রসূ হয়। বিশেষ করে জমি জরিপ কৌশল ও প্রশ্নমালা পদ্ধতির মধে এ প্রক্রিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইতিহাস চর্চাকেও আরও অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ১। সমাজ বিজ্ঞানের জনক কে?

১.২.৬.৬ ঃ ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

ইতিহাস ও প্রত্মতত্ত্বের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। ইতিহাস লেখার সময়ে ঐতিহাসিক যে সব উপাদান ব্যবহার করে থাকেন তাকে সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক এই দুই প্রধান শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আবার প্রকারভেদ আছে যথা লিপিতত্ত্ব বা লেখমাল, হস্তলিপি বিজ্ঞন, মুদ্রা, স্মৃতি-সৌধাদির চিহ্ন বা ধ্বংসাবশেষ। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা অত্যন্ত প্রামাণ্য ও গ্রাহ্যযোগ্য। সাহিত্যিক উপাদানে অনেক সময় অতিশয়োক্তি থাকে বা নানা দোষ ত্রুটি থাকে। সে দিন দিয়ে তুলনামুলকভাবে প্রত্নতাত্ত্বির উপাদন অনেক বেশি নির্ভরশীল। ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নানা চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা সম্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বের বিরাট সাফল্যে সম্ভব হয়েছে। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের প্রচেষ্টায় এশীয় পুরতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, নানা দেশ থেকে জ্ঞানসম্পদ ও প্রত্নসংগ্রহের কাজ ত্বরান্তিত হয়েছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের জদ্দ্যোগে ভারতীয় পুরাতত্ব বিভাগের সংগঠনে ফলে

প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস হয়ে উঠল যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞান সম্মত ও নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিকেরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মালমশলা প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করেন। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলেই পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসের প্রাচীন অতীত ঐতিহ্য জানা সম্ভব হয়েছে। এজন্য বলা যেতে পারে, "Archaeology is the backbone of history".

সরকারি অনুদানে লুপ্ত বা বিস্মৃত প্রায় ইতিহাসের নানা স্মৃতির সন্ধান শুরু হয়েছিল। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাদের উদ্যোগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ইতিহাস রচনার সময় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটল। এর পূর্বে ঐতিহাসিকরা প্রধানতঃ আদর্শবাদী, কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য, পুরোহিত সমাজের ধর্মীয় পুঁথিপত্র, পুরণ, ধর্ম কথার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। তাই প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার ইতিহাসকে যুক্তিভিত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে এল। ইতিহাস হয়ে উঠল অনেক বেশি পরীক্ষিত সত্য, নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিকেরা নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের মালমশলা প্রত্নতত্ত্ব থেকে সংগ্রহ করতে পারলেন। অতএব প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় মিথিকেল ইমেজ বা কল্পনা প্রসূত আবছারূপের পরিবর্তন ঘটল। নিঃসন্দেহে পুরাতাত্ত্বিক এই ক্রিয়াকর্ম প্রত্ন আবিষ্কারের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। লক্ষণীয়, জাতীয় চেতনার উন্মেষের লগ্নে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা ও জাতীয়তাবাদী ঐইতহাসিকরা অতীত ভারতীয় জীবনের গৌরবময় চিত্রটা যেন লুফে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির গর্বিত রূপটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মধ্যবিত্তদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে ফলে আমাদের ইতিহাসের রচনায় জনতত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক রীতিপদ্ধতি অনুযায়ী বিশ্লেষণের প্রসার ঘটে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক মাল মশলাগুলি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপাদানমাত্র। তারা ইতিহাসে ব্যবহারের জন্য নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঐ উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসে পরিণত করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে সব তথ্য মৃত, অর্থহীন। নির্বাচন তথ্য যখন ঐতিহাসিকের অতীত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার স্পর্শ পায় এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশেষ মূল্য ও ঘটনার সম্পর্কের ভিত্তিতে বিন্যস্ত হয়, তখনই তার ইতিহাস রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস আমরা প্রধানত জানতে পারি বিভিন্ন ধরনের লিপিতত্ত্ব থেকে। এই সব লিপি ব্রাহ্মী ও ঘরোষ্ঠী ভাঙা লেখা ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাদের পাঠোদ্ধার করে ইতিহস পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। ইতিহাসের অনেক মাল-মশলা আমাদের হাতে এসেছে। মৌর্য পরবর্তী যুগ থেকে শুরু করে কুষাণ যুগ পর্যন্ত অনেক ইতিহাস আমরা মুদ্রা থেকে উদ্ধার করতে পারি। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদন প্রায় নেই বললেই চলে। গুপ্তযুগের রাজাদের কাহিনীও আমরা লিপি ও মুদ্রা উদ্ধার করতে পারি। প্রাচীন বাংলার সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রধান উপাদনগুলি প্রত্ন আবিষ্কারের ফলেই পাওয়া গেছে।

তবে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই এই উপাদানগুলিও ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সময় অন্য সূত্র থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। লিপি বা মুদ্রার পাঠোদ্ধার করে প্রথম যিনি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর প্রবণতা, সমসাময়িককালের মূল্যবোধ ও মানসিক গঠন এবং বর্তমানে দাঁড়িয়ে যে ঐতিহাসিক ঐ ঘটনাকে কাজে লাগাচ্ছেন, তাঁর মন ও পরিবেশ বিভিন্ন পর্যায়ের। সময়সীমার দুই প্রান্তে অবস্থিত এই দুই ব্যক্তির মানসিকতা কিছুতেই এক হতে পারে না। প্রথমে যিনি ঘটনাকে স্তম্ভে বা পাথরের উৎকীর্ণ করেছেন, তিনি হয়তো ঐ কাজটি করেছেন হয়তো বা বিশেষ কোনো তাগিদে, হয়তো প্রচারের উদ্দেশ্যে। অনেক সময় রাজ-রাজড়ারা তাদের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে লিপি বা মুদ্রার তাদের কীর্তিকলাপের কাহিনী অতিরঞ্জিত করতেন। অনেক সময় সভাকবিরাও তাদের প্রভুকে তোষণ করার জন্য প্রশস্তিমূলক লিপি বা পাথর উৎকীর্ণ

করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সমুদ্রগুপ্তের হরিষেণের 'এলাহাবাদ প্রশস্তির' কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও একথাও সত্য যে এগুলি আমাদের মূল্যবান উপাদান। প্রত্নতত্ত্ব থেকেই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণগুলির সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব নির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত কোনো তুলনামূলক আলোচনার মানদণ্ডের সাহায্যে। বিশেষ ধরনের কতকগুলি তথ্যের বিকৃতিথবা ঘটনার আদর্শচয়নও এড়াতে পারা যায় সামালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই।

সবশেষে বলা যায়, প্রত্ন আবিষ্কারই ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, অনেক দেশ—নগর, সভ্যতা, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজানাকে করেছে জানা। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের ফলেই পৃথিবীর অনেক দেশের ইতিহাসের প্রাচীন অতীত ঐতিহ্য জানা সম্ভব হয়েছে। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্য না পেলে ঐতিহাসিক ও তার তথ্য অনেকটাই পিছিয়ে থাকত। বলা যেতে পারে 'প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের মেরুদণ্ড' (Archaeology is the backbone of history).

প্রশ্ন ১। কত সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়?

১.২.৬.৭ ঃ ইতিহাস ও নৃতত্ত্ববিদ্যা

নৃতত্ত্ববিদ্যা নানা দিক দিয়ে ইতিহাস লিখনে ও পাঠে সাহায্য করতে পারে। অনেক অজানা বিষয় নৃতত্ত্ববিদ্যা ঐতিহাসিকদের কাছে পরিচিত করে তুলতে পারে। এর ভিত্তিতে গবেষক ও ঐতিহাসিকরা নতুন আলোকে ইতিহাস রচনা করতে পারেন। নৃতত্ত্ববিদরা তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের এক ব্যাপক অংশের মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হন। সমাজের নানা মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা প্রিশ্রম করে এবং নানা মানুষের সান্নিধ্যে এসে জানতে পারেন। আবার সামাজিক মানুষের এই সমস্ত বিষয় জানা ঐতিহাসিকদের কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিককে এই কাজে সাহায্য করেন নৃতত্ত্ববিদগণ। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের ধারণা ও ইতিহাসের মাল-মশলা সংগ্রহের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা। এরফলে ইতিহাসের ধারার কোন একটি সময়ে যে ধারণা ছিল যে আর্যদের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু হয়েছে, তা আজ ভ্রান্ত ধারণা হিসেবে প্রমাণিত। নৃতত্ত্ববিদার প্রাচীন প্রস্তরযুগ, মধ্য প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তর যাগের মানুষদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের অনেক উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন। পরস্পরের আদান-প্রদানের ফলে ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। আদিম ভারতীয় জনসমাজের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতিদের জীবনের নানা দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে নৃতত্ত্ববিদরা ঐতিহাসিকদের কাছে নানা তথ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এইসব নানা তথ্য আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেছে। ঐতিহাসিকগণ এইসব তথ্যকে নানা দৃষ্টিবঙ্গিতে বিচার করেছেন।

নৃতত্ত্ববিদরা তাদের কাজকর্মের মধ্যদিয়ে সমাজের নানা মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যদ্রব্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ জানতে পারেন। এই সমস্ত বিষয় জানা ঐতিহাসিকদের কাছেও একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিককে এই কাজে সাহায্য করে থাকেন নৃতত্ত্ববিদগণ। নৃতত্ত্ববিদদের দেওয়া তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে কিভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আদিবাসী-উপজাতিদের ইতিহাস আজ ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসের মূল্যবান বিষয়বস্তু। নৃতত্ত্ববিদরা বনভূমির সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের কিভাবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং বনিভূমিতে তদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ধারা কোন গতিতে এবং ছন্দে চলেছিল তার উপর নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাদের দেওয়া তথ্য থেকেই আমরা জানতে পারি যে মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্য কিভাবে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রাকৃতিক ও বনজ সম্পদের ব্যবহার ও সুপ্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণালাভের ক্ষেত্রে নৃতত্ত্ববিদরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। আজ এর ফলেই ঐতিহাসিকগণ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং ব্রিটিশদের আগমনের পর এর যথেচ্ছ ব্যবহার সম্পর্কে বিচার-বিশ্লষণ ঔপনিবেশিক বাতাবরণে করবার চেষ্টা করছেন। বনভূমিকে অগ্নিদগ্ধ করবার পর সেই জমিতে যে অস্থায়ী চাষাবাদ হত তার বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন নৃতত্ত্ববিদরা। এই ধরনের গবেষণা আজ ঐতিহাসিকদের নানাভাবে সাহায্য করছে। এইসব নানা দিক বিচার করে বলা যায় যে, 'Anthropology is living history'.

প্রশ্ন ১। নৃতত্ত্ববিদ্যা কিভাবে ইতিহাসকে সাহায্য করেছে?

১.২.৬.৮ ঃ ইতিহাস ও ভাষাবিদ্যা

যথার্থ ইতিহাস লেখার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ঐতিহাসিককে ইতিহাস লেখার জন্য নানা ভাষা শিখতে হয়। আবার এ কাজে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের সাহায্য করতে পারেন ভাষাবিদগণ। বিভিন্ন ভাষায় লেখা নানা উৎসবের, লিপির পাঠোদ্ধার করা ভাষাবিদগণের পক্ষেই সম্ভব।

ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক উৎসের বা উপকরণের সন্ধান, এইসব উৎস নানাভাষায় লেখা। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিপি বা লেখ একান্ত অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এইসব লিপি তামিল, তেলেগু, পালি, সংস্কৃত ও আরও নানাভাষায় লেখা রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় ভাষায়ও অনেক উৎস রচিত হয়েছে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করার জন্য সেইসব লিপির ভাষা জানা আবশ্যক। এ কাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন ভাষাবিদগণ। আবার যখন কোন ঐতিহাসিক মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস রচনার কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন তাকে সুলতানিযুগে প্রচলিত ভাষাসমূহ এবং মোগলযুগে প্রচলিত ভাষাসমূহ জানতে হবে। নচেৎ তিনি মূল উপাদানগুলির অধিকাংশ যা আরবি, ফারসি, উর্দু এবং আরও নানা আঞ্চলিক ভাষায় লেখা রয়েছে তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হবে না। আর এগুলির পাঠোদ্ধার না করে যিনিই ইতিহাস লেখেন তার ইতিহাস মোটেই বিজ্ঞানসম্মত, প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদালাভ করতে পারবে না। অতীতে যে সব প্রথিতযশা ঐতিহাসিকগণ মারাঠা, মোগল ও সুলতানি যুগের উপর কাজ করেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষালাভ করেছেন। যদুনাথ সরকার বা সুরেন্দ্রনাথ সেনের মত অতীতের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরা নানাভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং এর

ইতিহাস লেখার পদ্ধতির মধ্যে প্রধান হল প্রাথমিক উৎসের বা উপকরণের সন্ধান, এইসব উৎস নানা ভাষায় লেখা। একাজে ঐতিহাসিককে সাহায্য করেন ভাষাবিদগণ।

ফলেই তাঁদের ইতিহাস অনেক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসসম্মত হয়েছে। আধুনিককালের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকেরাও একই পদ্ধতি অবলম্বন করে নানা ভাষা আয়ত্ত করে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের ভারতের ইতিহাসের নানাদিক বিচার বিশ্লেষণ করে চলেছেন। এটা শুরু ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ নয়, সারা বিশ্বের প্রথিতযশা ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং পশ্চিমের দেশগুলি ঐতিহাসিকেরা ভাষাজ্ঞানের গুরুত্বের কথা প্রথম তাদের ইতিহাস রচনায় তুলে ধরেছেন। অতএব এই দুরূহ কাজে ঐতিহাসিককে অবশ্যই সাহায্য করতে পারেন নানা ভাষায় দক্ষ ভাষাবিদগণ। অতএব ইতিহাসের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক বঘীর, একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যারা ভাষাবিদ্যা অর্জন না করে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হন তাদের প্রধানতঃ দ্বিতীয় সারির উপাদানগুলির ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ফলে ইতিহাসের তথ্য ও বিশ্লেষণ সঠিক হওয়া সম্ভব নয়। সেরকম ইতিহাস যতার্থ ইতিহাসের পরিপন্থী।

প্রশ্ন ১। ভাষাবিদ্যা অর্জন না করে ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হলে ঐতিহাসিকদের কিসের উপর নির্ভর করতে হয়?

১.২.৬.৯ ঃ ইতিহাস ও দর্শন

ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও নানা বরিবর্তন নিয়ে আসে। অনেক সময় দর্শনের প্রভাবে বা দার্শনিকদের তত্ত্বের প্রভাবে রাজনীতি, সামাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটবার ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা গেছে। বেশ কিছুকাল ধরেই ইতিহাসের অবশ্য পাঠ্য বিষয় সূচীর মধ্যে অন্তভুক্ত করা হয়েছে ইতিহাসের দর্শন। ঐতিহাসিককে যেমন দার্শনিকদের মতাদর্শের শরণাপন্ন হতে হয়, তেমনি দার্শনিকদেরও তাদের মতাদর্শের প্রচার, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সার্থকতার জন্য ঐতিহাসিকদের দ্বারে উপনীত হতে হয়। একে অপরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। ইতিহাসকে দেখা বা চর্চার জন্য একটা দর্শন রয়েছে এবং সেই প্রকৃত দর্শনের ফলেই ইতিহাসচর্চা (Historiography) সার্থকরূপ লাভ করতে পারে।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা, দুধরেনর উপকরণের সাহায্যে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে যুক্তিবহ করে তোলেন। এক, দর্শনত্ত্ব এবং দুই, ঐতিহাসিক তথ্য বা বিষয় সমূহ। প্রথমটির জন্য ঐতিহাসিকের দরকার দার্শনিকের। দ্বিতীয়টির জন্য দার্শনিকের একান্ত প্রয়োজন ঐতিহাসিকের। কারন একজন ঐতিহাসিকই কেবলমাত্র পারে দার্শনিকের তত্ত্ব বা মতবাদকে ইতিহাসগতভাবে বিচার করতে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাজাতে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ঢেউ প্রহবমান ছিল। এই পরিবর্তন আলোকিত যুগের সূচনা করেছিল। এই নতুন চিন্তার বিশেষত্ব ছিল, দার্শনিকরা পূর্বের ভ্রান্ত দর্শন থেকে সরে এসে জনগণকে নতুন দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্তির যুগে মন্টেস্কু, ভলটেয়ার, রুশো ও ফিজিওক্রাটরা এমন এক যুক্তিবাদী মতবাদ নিয়ে এসেছিলেন যা মানুষকে পৌঁছে দেয় পূর্ণতায়। আগেকার দর্শন-চিন্তার মূলসূত্র ছিল মানুষ

স্বভাবত অপূর্ণ (imperfect). পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে তাঁর ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের দার্শনিকরা তাদের লেখার প্রচার করলেন যে পূর্ণতায় পৌঁছতে হলে মানবসমাজের প্রয়োজন যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ধর্মসম্পএর্ক সংশয়াবাদ। নতুন দর্শন প্রতিষ্ঠিত করল এই সভ্য যে, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। অর্থনীতি ও সমাজ আবর্তিত হল যুক্তিবাদী দর্শনের প্রভাবে। ইতিহাসের কোন ঘটনার আগমনে বা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি রচনায় দার্শনিকদের দর্শনতত্ত্ব মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল ইউরোপের ফরাসী বিপ্লব,রুশ বিপ্লব। ইতিহাসের অনেক শাসকের শাসনকার্যের অনুপ্রেরণার পশ্চাতে দার্শনিকদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কারমূলক কার্যাদি তাঁর গুরু বেন্তামের উপযোগিতাবাদ তত্ত্বের বা দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কার্ল মার্কসের দ্বন্দমূলক বাস্তুবাদ তত্ত্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে এক যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিবাদী ও শ্রমিক এই দুই শ্রেণীর সামাজির ও অর্থনৈতিক সংঘর্ষ কার্ল মার্কসের তত্ত্বের মূল কথা ছিল। অতএব যুগে যুগে দেখা গেছে যে দর্শন বা দার্শনিক তত্ত্বসমূহ ইতিহাসের নিয়ন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছে। তাই দর্শন ও ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সব সময়েই কাজ করে চলেছে। ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে দর্শনের বা দার্শনিকদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখের দাবী রাখে।

পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ঐতিহাসিকরা দুধরনের উপকরণের সাহায্যে তাদের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে যুকিতবহ করে তোলেন। এক, দর্শনতত্ত্ব এবং দুই, ঐতিহাসিক তথ্য বা বিষয়সমূহ। প্রথমটির জন্য ঐতিহাসিকের দরকার দার্শনিকের। দ্বিতীয়টির জন্য দার্শনিকের একান্ত প্রয়োজন ঐতিহাসিকের।

প্রশ্ন ১। ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক কি?

১.২.৬.১০ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাস অনুসন্ধান ৪ (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিত)
ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা'— অমিতা রায়।

২। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস— সুনীল চট্টোপাধ্যায় (প্রথম খণ্ড)

৩। ইতিহাস চর্চা— নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। কাকে বলে ইতিহাস—ই. এইচ. কার।

৫। ইতিহাসতত্ত্ব— এম. দেলওয়ার হোসেন।

৬। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক — মমতাজুর রহমান তরফদার।

১.২.৬.১১ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ইতিহাসের সঙ্গে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক আলোচনা কর।

২। ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। ইতিহাসের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪। ইতিহাস ও দর্শন পরস্পরকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

৫। 'প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাসের মেরুদণ্ড'—তুমি কি এই মত সমর্থন কর।

৬। ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্ক কেন নিবিড়?

৭। ইতিহাসের সঙ্গে নৃতত্ত্ববিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর। নৃতত্ত্ববিদ্যা কিভাবে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে?

৮। ইতিহাস লেখার জন্য ভাষাবিদ্যা আয়ত্ত করা কেন প্রয়োজন?

৯। ইতিহাস ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

১০। ইতিহাস ও দর্শন পরস্পরকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে?

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক ৭

Orientalist, Imperiailist, Nationalist, Theological

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৩.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৩.৭.১ ঃ প্রাচ্যবাদ (Orientalism)

১.৩.৭.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহসচর্চা (Imperialist Historiography)

১.৩.৭.৩ ঃ জাতীয়তাবাদী ইতিহাদচর্চা (Theological Historiography)

১.৩.৭.৪ ঃ ধর্মতত্ত্ব বা দিব্যতন্ত্র ইতিহাস চর্চা (Theological Historiography)

১.৩.৭.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৩.৭.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৩.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাচ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

(২) প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্য

(৩) এই চর্চার ফলাফল

(৪) এই চর্চর উদ্দেশ্য ও ফলাফল নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক

(৫) সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস বলতে কি বোঝায়

(৬) সাম্রাদ্যবাদের বিভিন্ন পর্ব

(৭) সাম্রাজ্যবাদের উত্তান ও পতনের কারণ—ঐতিহাসিক বিতর্ক

(৮) জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(৯) এই ইতিহাসচর্চার ধারা

(১০) এই ইতিহাসচর্চার ঐতিহাসিকদের নানা দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই ইতিহাসচর্চার প্রসার।

১.৩.৭.১ ঃ প্রাচ্যবাদ (Orientalism)

আঠারো শতকের অন্তিমপর্বে প্রাচ্যবিদ্যা কথাটি পণ্ডিত ও গবেষক মহলে পরিচিত লাভ করে। যারা এশিয়ার মানুষ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রধানত তাঁদেরই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত। প্রাচ্য সম্বন্ধে এই অনুসন্ধানের ভিত্তি স্থাপন করেন কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্স ও বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার। এঁরা এশিয়ার সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধানে ব্রতী হন। তাঁরা স্থানীয় ভাষা ও প্রাচ্যের পুরানো পবিত্র গ্রন্থগুলি ব্যবহার করেন। জ্ঞানদীপ্ত যুগের পৃথিবী সম্পর্কে আগ্রহের চিন্তাধারা তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও এশিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের দুর্বলতা ছিল। প্রাচ্য সম্পর্কে তাদে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি ইতিহাস, সাহিত্য, নৃতত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞনের বিভিন্ন শাখাকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, প্যারিস, ব্রাসেল্‌স, হাইডেলবার্গ, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যায় পড়াশোনা ও গবেষণা করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কিন্তু ১৯৭৮ সালে এডওয়ার্ড সঈদ (Edward Said)-এর Orientalist বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ও ফালফল সম্পর্কে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। তাঁর বক্তব্য হল গবেষক, ঐতিহাসিক ও পণিততেরা যেন প্রাচ্য বা Orient সম্পর্কে কতটা জানে ও তা কেমন করে জেনেছিল শুধু তার পুনঃপরীক্ষা করবে তাই নয়, কেন তারা জানতে চেয়েছিল সে সম্পর্কে ও চিন্তা করবে। সঈচ প্রাচ্যতত্ত্বের মাধ্যমে পশ্চিমী উৎকর্ষতা ও আধিপত্য প্রকাশের ধারণাকে উন্মোচিত করেন। বিদ্যাচর্চার এই মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির উপর ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাচ্য সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা হয়ে উঠেছিল প্রাচ্যের উপর শক্তির প্রকাশ। কারণ এই চর্চার মাধ্যমে জানা যায় অ-পশ্চিমী মানুষদের কীভাবে অবদমিত করা হয়েছিল। এদেশের বিভিন্ন ভ্রামণকাহিনী, ঐতিহাসিকগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা ব্যবহৃত ও হয়েছিল। সাম্রাজ্য শেষ হবার পরও নায়। উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে তথ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ইউরোপীয় পদ্ধতি, তত্ত্ব এবং শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় ও বিজিতদের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন Progress vs Stagnation, adulthood vs childhood এবং reason vs superstition এই পার্থক্যগুলির মধ্য দিয়েই ঔপনিবেশিক শাসনের যৌক্তিকতা প্রামণ করার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গদের বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এই গবেষকরা বিস্তারিত ভাবে দেখানোর চেষ্টা করতে থাকেন যে Orientalism

*আঠারো শতকের অন্তিম পর্বে যারা এশিয়ার মানুষ ও সমস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতেন প্রধানত তাঁদেরই প্রাচ্যতত্ত্ববিদ বলে মনে করা হত। **Edward Said** এর **'Orientalism'** বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্পর্কে বিতর্কের নতুন সূত্রপাত ঘটে। **Edward Said** তার **'Culture and Imperialism'** গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, গত শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্যবাহ পসিচমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। রোনাল্ড ইনডেন, গৌরী বিশ্বনাথন, সারা সুলেরি, জাভেদ মজিদ, জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যাঁরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জড়িত তারা দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে ব্রিটিশ রাজ উত্থানের পথ প্রস্তুত করেছিল। আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ঐতিহাসিকরা ও **post Orientalism** ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।*

কীভাবে ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনে সাহায্য করেছিল এবং প্রাচ্যের জ্ঞান সেখানকার আদর্শ ে মূল্যবোধকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত Culture and Imperialism গ্রন্থে সঈদ পুরানো বিতর্কে আবার ফিরে আসেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে গত দুই শতাব্দী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

পশ্চিমী পণ্ডিত মহলে সঈদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যে সব ধারণার উপর ভিত্তি করে তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা করেছিলেন সেগুলি পুনঃপরীক্ষা ও পুনঃবিবেচনা করা হতে থাকে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা ও চর্চাকে কেউ কেউ Post-Orientalism বলে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে এই শব্দটি এখনও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে Post-Orientalism ধারণাটিকে Post-syructuralism এবং new historicism প্রভৃতি সমালোচনামূলক তত্ত্বের সঙ্গে একীকরণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। হোমি ভাবা, সারা সুলেরি, মেরী লুই প্র্যাট্ এবং গায়ত্রী স্পিভাক্ প্রমুখ গবেষকরা প্রাচ্যতত্ত্বর নতুন পরিপ্রেক্ষিত, বিশে,ত্ন ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এ সম্পর্কে ব্রিটেনের থেকেও আমেরিকায়া আগ্রহ বেশি লক্ষ্য কার যা। পশ্চিমী ইতিহাসচর্চার মধ্য থেকেই Post-Orientalism এর বিরোধিতা এসেছে। জন ম্যাকেঞ্জি, ডেভিড কফ, বার্নার্ড লুইস্ প্রমুখ গবেষকরা মনে করেন কতকগুলি পছন্দের বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গেমেলাতে চেয়েছেন, যেগুলি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে মেলে না। ডেভিড ওয়াসব্রুক্ এবং রোজালিন্দ ও হ্যন্লন্ Post-Orientalism মতকে সমর্থন করে না। কারণ তাঁদের মতে, ক্ষমতার ভিত্তি বস্তুগত বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছিল।

ম্যাকেঞ্জি মনে করেন সঈদের Orientalism এবং Culture and Imperialism বই দুটি ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেনি। ম্যাকেঞ্জির এই বক্তব্য অনেকেই সমর্থন করেননি। ১৯৮০ সালে annales-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় ফরাসী ঐতিহাসিকদের Orientalism সম্পর্কে আগ্রহ লক্ষ্য কার যায়। রোনাল্ড ইনডেন, গৌরী বিশ্বনাথন, সারা সুলেরি, জাভেদ মজিদ, জ্ঞান প্রকাশ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক যাঁরা নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সঙ্গে জড়িত তাদের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসচর্চার নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছে। এরা দেখাতে চেয়েছেন কী ভাবে ব্রিটিশরা ভারতকে জানতে এবং তা কীভাবে ব্রিটিশ রাজ উত্থানেরপও প্রস্তুত করেছিল। আফ্রিকা, চীন, জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির ঐতিহাসিকরাও Post Orientalism ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ভি. ওয়াই. মুদিম্বের লেখা এবং জ্ঞান প্রকাশ সম্পর্কিত After Colonialism (১৯৯৫) গ্রন্থটি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে আরও গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। সঈদের বক্তব্যের সঙ্গে হয়তো অনেকেই একমত হবেন না, তবুও তিনি প্রাচ্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে বিতর্কের সূচনা করেছেন তার ফলে এশিয়ার ইতিহাসচর্চা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হবে।

প্রশ্ন

১। কাদের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বলে মনে করা হত?

২। Edward Said ওর লেখা দুটি বইয়ের নাম কী কী?

৩। নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর।

১.৩.৭.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চা (Imperialist Historiography)

সাম্রাজবাদী ইতিহাসকে প্রকৃত অর্থে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর কারণ হল দুটি। প্রথমতঃ জাতীয় ইতিহাসের মত সাম্রাজ্যীয় ইতিহাসকে কোন সঠিক ভৌগোলিক বা ক্রমকাল অনুযায়ী চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, পদ্ধতি ও কাঠামোগত কোন মিল নেই। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল দেখা যায়। সেটি হল যে তাঁরা সবাই সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝায়? ধ্রুপদী ঐতিহাসিকেরা রোমান সাম্রআজ্যের কথা বলেন। যেখানে একজন সম্রাট যার হাতে ক্ষমতা থাকত এমন একটি রাজনৈতিক প্রথা। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারত, চীন ও আমেরিকার রাষ্ট্র গঠনের মধ্যে কিছু মিল পাওয়া যায়। সাধারণ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাম্রাজ্য বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে বোঝায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যরও সমস্যা আছে। কারণ দেখা যায় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের উপর সার্বভৌমত্ব অধিকার না করেই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। একে অঘোষিত সাম্রাজ্যবাদ বা সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা যায়। ওয়াল্টার রডনি এবং আন্তেগুণ্ডার ফ্রাঙ্ক এবং অন্যান্যরা একে নয়া উপনিবেশবাদ বা স্বাধীন রাষ্ট্রের উপর সাম্রাজিক প্রভাব বিস্তার বলে বর্ণনা করেছেন। এজন্য সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক একচি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করা। ওকে সাম্রাজ্যবাদের একটি শিথিল ব্যাখ্যা বলে মনে করা যায়।

সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস সাধারণত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে। সাম্রাজ্যবাদ বলতে বোঝায় একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকর্তৃক একটি দুর্বল রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বিস্তার করা। 'Economic History Review' পত্রিকায় প্রকাশিত 'The Imperialism of Free Trade' প্রবন্ধে রোল্যাণ্ড রবিনসন ও জন গ্যালাহার মনে করেন উনিশশতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র আপাত কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন তাহ স্বার্থ পরোক্ষ উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্য দখলও অব্যাহত রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্ব বে-উপনিবেশীকরণ পর্বের সূচনা হয়।

১৫০০ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের কয়েকটি পর্ব চিহ্নিত করা যায়। ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং তাকে কেন্দ্র করে পঞ্চাদশ শতাব্দীর শেষে পর্তুগাল ও স্পেনের, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারকে সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পর্ব বলা যায়। এর পরের পর্বে হল্যান্ডে, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বাণিজ্যিক অগ্রগণ্য দেশগুলি আধিপত্য বিস্তার করে। সূত্রপাত ঘটে মার্কেনটাইলিজম যুগের। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে তারা বিপুল সম্পদ তৈরী করে। ১৫০০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে দেখা যায় উপনিবেশ স্থাপন। ১৮৮০ সালের পরে সাম্রাজ্যবাদের আর একটি পর্ব শুরু হয়। একে বলা হয় নয়া সাম্রাজ্যবাদ। উইরোপের শক্তিশালী দেশগুলি আফ্রেকা ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মতো পুরনো সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় জার্মানী,ইত্যালি, বেলজিয়ামের মত নতুন রষ্ট্রগুলি। এমনকি স্পেন ও পর্তুগালেরও পুনরার্বিভাব ঘটে। এই ঘটনাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নতুন পর্ব হিসাবে ঐতিহাসিকরা চিহ্নিত করেছেন। উনিশ শতকের প্রথমভাগের মার্কেন টাইল সাম্রাজ্য এবং ১৮৮০ দশকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ যুগের মাঝখানে একটি অস্পষ্ট পর্বের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই সময়ে আবাধ বানিজ্য প্রভাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে সাম্যবাদের কঠোরতা হ্রাস পায়।

তাহলে কী এই সনয়ে সাম্রাজ্যাবাদ পশ্চাদ অপসারণ করেছিল? তা সত্য নয়। কারণ উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে ইংল্যাণ্ড autonomy দিলেও এশিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমানা ক্রমশ বৃদ্ধিপেতে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমস্যা সত্ত্বেও ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করে।

১৯৫৩ সালে 'Economic History Review' পত্রিকায় রোল্যান্ড রবিনসন ও জন গ্যালাহারের লেখা 'The Imperialism of Free Trade' প্রবন্ধটি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার একটি নতুন পথ নির্দেশ করে। এঁরা মনে করেন, উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র আপাত কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। কারণ ব্রিটেন তার স্বার্থ পরোক্ষ উপায়ে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল এবং পিরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্য দখলও অব্যাহত রেখেছিল। উইলিয়াম রজার লুই সম্পাদিত 'Imperialism' গ্রন্থে রবিনসন ও গ্যালাহারের বিতর্ক সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্ব হল বি-উপনিবেশীকরন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই এই পর্বের সূচনা হয়েছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্থাপিত ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এরপর বি উপনিবেশীকরন শুরু হয় আফ্রিকায়। ১৯৬০ -এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পর্তুগীজ শাসি, মোজাম্বিক ও অ্যাঙ্গোলা ছাড়া আফ্রিকার অধিকাংশ উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়। বি-উপনিবেশীকরনের ইতিহাস যদিও খুব পুরানো নয়, তবুও ঐতিহাসিকরা এর নানা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। রবাট হল্যাণ্ড, পিটার কেইন, এ্যান্টনি হপকিনস মনে করেন, ইউরোপের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত-রে ফলেই বিউপনিবেশীকরন সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে ডি.এ.লো.কে.ডি. হারগিবস এবং জন ডারউইন-এর বক্তব্য হল উপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতার ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারছিল না।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থান সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন যে ১৮৮০ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তৎকালীন ইউরোপের অর্থনৈতিক চাপই এর প্রধান কারণ।

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরা সাম্রাজ্যের উত্থান, ভিত্তি সুদৃঢ়ীকরণ ও পতনের বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অধিকাংশরই মত হল ১৮৮০ সালের পর সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল এবং তৎকীলান ইউরোপের অর্থনৈতিক চাপই এর প্রধান কারণ। বিংশ শতকের গোড়ায় জে.এ হবসন যুক্তি দেখান যে, ধনতন্ত্রীদের প্রয়োজনেই সাম্রাজ্যবাদের উত্থান হয়েছিল। কারণ তারা বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজছিল। তারা তাদের নিজস্ব দেশের সরকারের কছে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন চেয়েছিল। হবসনের বক্তব্যকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন লেনিন ১৯১৬ সালে লেনিন তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য বলেছিলেন 'Imperialism is the highest stage of capitalism.' তিনি একথাও জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, কাঁচামাল ও বাজার দখল করার জন্য ধনতন্ত্রীদের সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়োজন ছিল।

সব ঐতিহাসিকই মনে করেন না যে সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই ছিল। উনিশ শতকের কিছু চিন্তাবিদ মনে করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের পিছনে মানবহিতৈষী কারণও ছিল। তাদের মতে, দাস প্রথা বন্ধ করা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত ও উন্নত করার প্রয়োজনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। আবার অনেকে মনে করেন, মানবহিতৈষী হল সাম্রাজ্যবাদীদের একটা মুখোশ মাত্র।

আলফ্রেড ক্রস্‌বি, ফিলিপ কার্টেন, ড্যানিয়েল হেডারিক প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পরিবেশগত ও কারিগরী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে তাদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কৌশলগত কারণের কথাও অনেকে বলেছেন। রবিনসন ও গ্যালহার তদের Africa and the Victorians (1961) গ্রন্থে আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদে ইংল্যাণ্ডের অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতের Strategic route গুলিকে রক্ষা করার জন্যই ব্রিটেনকে এই কাজ করতে হয়েছিল। অন্যদিকে বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক হেনরী ব্রান্‌স্‌কউইগ (Henri Brunschwig) ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণের ব্যাখ্যা যারা দিয়েছেন তাদের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ অর্থনৈতিক নয়, দেশের অভ্যন্তরীম রাজনৈতিক দলাদলি। তাছাড়া ফ্রাঙ্কো প্রশিয়ান যুদ্ধের পারজয়ের অপমান ঢাকা দিতে ফ্রান্সকে সাম্রাজ্যবাদের পথ গ্রহম করতে হয়েছিল। জার্মানী অবশ্য অর্থনৈতিক উদ্দেশেই আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদে অংশ নিয়েছিল।

*লেনিন যথার্থই বলেছিলেন, **'Imperialism was the highest stage of capitalism'**. আবার উনিশ শতকের কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন যে দাসপ্রথা বন্ধ করা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষিত উন্নিত করার প্রয়োজনেও সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজন ছিল। অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ও কারিগরী ছাড়াও রাজনৈতিক ও কৌশলগত **Safety value** কারণের ব্যাখ্যও দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদেব উত্থানের এত ব্যাখা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক কারণের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক **elite**-দের প্রভাবিত করেছিল। ম্যাকেঞ্জি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।*

অনেক ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের পিছনে safety-value তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। যেমন শ্রমিক শ্রেণীর তাৎক্ষণিক অভিযোগ প্রশমিত করার জন্য তাদের সাম্রাজ্যবাদ বনাম জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা। ক্রিস্টাল প্যালেসে ডিজরেলীর বিখ্যাত বক্তৃতা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

ঐতিহাসিক জোসেফ স্কুম্‌পিটার সাম্রাজ্যবাদের সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, ইউরোপের জাতিগত ও জেন্ট্রি শ্রেণি পৃথিবী ব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে পড়েছিড় এবং সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে তাদের মান মর্যাদা এবং সামাজিক স্থান বজায় রাখতে চেয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সামাজিক, রাজনৈতিক, কৌশলগত ও মানবিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন যে অর্থনৈতিক কারণের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি। ইমানুয়েল ওয়ালর স্টেইন পঞ্চাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, ইউরোপ থেকে উদ্ভুত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কীভাবে সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। ডেভিড ফিল্ডহাউস এবং ডব্লিউ. জি. হাইনস্‌ এই মত জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন। সাম্প্রতিককালে পিটার কেইন ও এ্যান্টনি হপ্‌কিন্‌স্‌ তাঁদের দু খণ্ডে লেখা গ্রন্থে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ধনতন্ত্রের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত ছিল।

এ ছাড়া অনেক ঐতিহাসিক আছেন যারা আদৌ পুর্বোক্ত ব্যাখ্যাগুলি মানেন না। যেমন, জে.সি.ভ্যান.লুইর কথা বলা যায়। এই ডাচ ঐতিহাসিক দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ নিয়ে কাজ করেছেন। তা ছাড়া আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ায় ইতিহাসের এলাকাভিত্তিক গবেষণা প্রকল্পগুলি থেকে জানা যায় যে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছিল স্থানীয় এলাকার intermediaries' এর সহযোগিতার ফলে। এরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের স্থানীয় পরামর্শ ও মূলধন দিয়ে সাহায্য করেছিল। এই মধ্যসত্ত্বভোগীদের উপর বিদেশী বণিকদের নির্ভর করতে হয়েছিল। সি,এ, বেইলী তাঁর Imperial Meridian (1989) গ্রন্থে আঠারো ও উনিশ শতকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠনে এই স্থানীয় সহযোগিতার কথা বলেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু এর ফলশ্রুতি হিসাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক ও উত্তর-প্রাচ্যবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে কতগুলি ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রান্স ফ্যানন (Frantz Fanon)মনে করেন, সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণই হয়নি, নতুন প্রভুদের কাছে স্থানীয় মানুষদের identity ও সংকটের মুখে পড়েছিল। এর থেকে আর একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, অধীনস্থ মানুষদের সম্পর্কে পদ্ধতিগত জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে কী সাম্রাজ্যবাদকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছিল? এ প্রসঙ্গে, 'health, gender, law and nature' এর ক্ষেত্রে কীভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি ঘটেছিল এবং তা ঔপনিবেশিক শক্তির কার্যক্রমকে কতটা প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে ডেভিড আর্নিল্ড, রিচার্ড গ্রোভ, মার্ক হ্যারিসন, রামচন্দ্র গুহ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

অনেক ঐতিহাসিক দেখানোর চেষ্টা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ইউরোপীয় সমাজের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল? বুয়র যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্পর্কে শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগ্রহ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক elite-দের প্রভাবিত করেছিল। অন্যদিকে এডওয়ার্ড সইদ ও জন ম্যাকেঞ্জি মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ উনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপের উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণির সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। মার্গারেট স্ট্রাবেল, মৃণালিনী সিংহ, গ্রাহাম ডসন, রোনাল্ড হায়াম, ফিলিপ্পালোভিন, জে,এম, ম্যাকেঞ্জি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সাম্রাজ্যবাদের ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে সম্পর্ক এবং নাগরিকত্ব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদ্য ইতিহাসচর্চা এক নতুন ও আকর্ষণীয় এলাকায় প্রবেশ করেছে।

প্রশ্ন

১। সাম্রাজ্যবাদ কি?
২। নয়া উপনিবেশবাদ বলতে কি বোঝায়?

১.৩.৭.৩ ঃ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা (Nationallist Historiography)

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মনে করেন, ভারতের ইতিহাসের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা বলতে বোঝায় সেই সব রচনা যা জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রসারে এবং ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তবে তাঁর মতে, ঐতিহাসিক বা লেখকরা এই ধরনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে না লিখলেও তা ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

প্রাথমিকভাবে, উনিশ শতকের ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তাঁরা ইতিহাসকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তথ্য অনুসন্ধান বলে মনে করতেন। ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চা রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বিশেষ করে শাসক বংশের ইতিহাসের উপর জোর দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক লেখক ও ঐতিহাসিকরা আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের প্রথমদিকে ভারতের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। তাঁরা যেমন সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন, তেমনি ইতিহাসের ক্ষেত্রে সর্বভারতায় ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হন। ঔপনিবেশিক শাসক ও ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই সময়ে পাশাপাশি চলেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসকরা আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বিভেদের উপর ভিত্তি করে 'বিভাজন ও শাসন' (divide and rule) করার রাজনৈতিক নীতি অনুসরণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরাও ভারতীয়দের ধর্মীয় ও অঞ্চলিক বিভেদের উপর ভিত্তি করে ভারতের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও সমগ্র ভারতের ইতিহাস লিখেছিলেন অথবা শাসকদের সম্পর্কে লিখেছিলেন যারা ভারতের বিভিন্ন অংশ শাসন করত। তবে তাঁরা ভারতীয়দের ধর্ম, জতি এবং ভাষাগত সম্বন্ধের উপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন এবং ভারতের রাজনৈতির ও সামাজিক অগ্রগতিকে নঞর্থকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা ক্রমাগত দিনের পর দিন একটি বাঁধা-ধরা ঔপনিবেশিক ছকে ইতিহাস রচনা করতে থাকেন। এই ধরনের দুটি প্রাথমিক পাঠ্য বই হল জেমস মিলের প্রাচীন ভারত এবং ইলিয়ট ও ডসনের মধ্যযুগের ভারত। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ও পাল্টা প্রতিবাদী ছক তৈরী করেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতা করেছিল, তেমনি ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা ও ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় জনগণের অবমাননা ও অমর্যাদার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয়দের মনে জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ জাগত করার কাজে নিয়োজিত হন। দু পক্ষই দিনের পর দিন তাদের বক্তব্য ও লেখার ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়। এমনকি কোন অস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে লেখার জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকরা প্রায়ই প্রথম দিকের ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতেন।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় জনগণের অবমাননা ও অমর্যাদার প্রত্যুত্তরে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয়দের মনে জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার কাজে নিয়োজিত হন। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতে এনেছে শান্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, আইনের চোখে সাম্য, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সমতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক ট্রাডিশনকে পশ্চিমী সভ্যতার থেকে মহৎ ও উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার মূল বিষয় ছিল, পশ্চিমী সভ্যতার ও শাসনতন্ত্রে যা কিছু ভাল তা সবই ভারতে ছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বলেন ভারতীয়দের মধ্যে কোন দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ঐক্য ছিল না কিন্তু জাতীয়তাবাদ ঐতিহাসিকরা বলেন যে ভারতীয়দের মধ্যেও 'sense of Indian nationhood' ছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অনেক ঔপনিবেশিক লেখক ও প্রশাসক এই ধারণা পোষণ করতেন যে ইতিহাসের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনগণ স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য, জাতি-গঠন, আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বিদেশী আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ঔপনিবেশিক শাসন তাদের এই

সবদিকে উপযুক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু তারা মনে করতেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিকতার পথে ভারতের উন্নতির জন্য ঔপনিবেশিক শাসন ও শাসকদের স্থায়ী উপস্থিতি প্রয়োজনীয় ছিল। ইউটিলিটারিয়ান ও মিশনারীরা যখন ভারতীয় সংস্কৃতির নিন্দা করছিলেন, তখন প্রাচ্যবাদীরা ভারতকে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক মানুষদের জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতীয়দের সম্পর্কে এ ধরনের প্রশংসাসূচক কথা বললেও তাঁরা মনে করতেন, ইতিহাসগতভাবে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা ছিল না। সেজন্য ভারতীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটাক ওবিস্বকে প্রভাবিত করুক এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার বিষয়গুলি ব্রিটিশদের হাতে ছেলে দিক। বস্তুতপক্ষে তাঁরা মনে করতেন, বিদেশী শাসনের অনুপস্থিতিতে ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নৈরাজ্য দেখা দেবে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে, আঠারো ও উনিশ শতকের অরাজকতা থেকে ব্রিটিশরাই ভারতকে রক্ষা করেছিল। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক ও প্রশাসকরা মনে করতেন যে ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনই তাদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ।

অনেক ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিক এই মতও পোষণ করতেন যে প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত ভারতও প্রকৃতিগতভাবে স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হবার যোগ্য। এজন্যই ভারতে স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনের পত্তন হয়েছে। এই অভিমত 'প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব বা 'Theory of Oriental Despotism' নামে সর্বত্র পরিচিত। এইসব ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারত কোন শাসক শাসিতদের জন্য জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেনি। বস্তুতপক্ষে ভারতে প্রচলিত রাজনৈতিক সাম্রাজ্যগুলি প্রকৃতিগতভাবে ছিল 'monstrously cruel' সেইদিক থেকে বিচার করলে তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশরা স্বৈরতান্ত্রিক হলেও তাদের শাসন ছিল যুক্তিসম্মত ও জনকল্যাণমুখী। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা মনে করতেন, 'In contrast, with the cruel Oriental Despotism of the past, British rule was benevolent though autocratic.'

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা আরও মনে করতেন যে ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় ঐক্যের অভাব ছিল। ভারতীয়রা সব সময়ই বিভক্ত। ভারতীয়য়দের মধ্যে গণতান্ত্রিক ট্রাডিশন অনুপস্থিত। যখন ইউরোপীয়রা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে, তখন ভারতীয় ও প্রাচ্যের জনগণ বহন করে স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহ্য। তাছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও নতুনত্বের প্রবির্তনমুখীতার গুণ অনুপস্থিত। এর ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান, প্রথা, শিল্প ও কারিগরী কৌশল প্রভৃতি ভাল বিষয়গুলি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনই ভারতে এনেছে শান্তি শৃঙ্খলা, আইনের শাসন, আইনের চোখে সবাই সমান, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং সামাজিক সমতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণ।

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এইসব ধারণা ও বক্তব্য ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মানে আঘাত করেছিল। এইসব মতামতের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয় শিক্ষিত ও বুদিধজীবী মানুষদের স্বায়ত্ত্বশাসন, গণতন্ত্র, আইনগত সংস্কার প্রভৃতির দাবী ভারতের অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তব চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের প্রকৃতি অনুযায়ী গণতন্ত্রের ধারণা ভারতে বিদেশী এবং সেজন্য তা ভারতীয়দের পক্ষে সুপ্রযুক্ত নয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে জাতীয়তাবোধের উদ্বুদ্ধ অনেক ভারতীয় এবং কিছু ইউরোপীয় লেখক ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এইসব বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করেন। বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা এই কাজ করেন। এর ফলে ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়। কারণ ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের কাজে মন দেয় ও প্রাথমিক উপাদনের উপর নির্ভর করতে শেখে। ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের ধারণাগুলি যে বুল তা প্রমাণ করার জন্য ভারতীয় ঐতিহাসিকরা একদিকে যেমন প্রচলিত ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করেছিল, তেমনি অন্যদিকে নতুন নতুন তথ্যের খোঁজ করেছিল। ভারতের জাতীয় সম্মানে আঘাতের বেদনা তাঁদের নতুন গবেষণায় প্ররোচিত করেছিল। অর্থনীতিবিদরা করলেও পেশাদারী ঐতিহাসিকরা আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাননি। কারণ, যেহেতু তাঁদের অধিকাংশই সরকারী স্কুল ও কলেজে চাকরী করতেন সেজন্য তাঁদের ভয় ছিল উপনিবেশবাদের সমালোচনা করলে তাঁদের চাকুরী-জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাছাড়া তাঁরা সমসাময়িক বৃটিশ ঐতিহাসিক ধারণা গ্রহণ করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস কখনই সাম্প্রতিক ও সমকালীন যুগ সম্পর্কে চর্চা করবে না।

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবজনক ট্রাডিশনকে পশ্চিমী সভ্যতার থেকে মহৎ ও উৎকৃষ্টতর বলে মনে করেছিল। বিশেষ করে তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতার 'বস্তুগত' চরিএত্রর সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার 'নৈতিক গুণাবলী'র (moral values) তুলনা করেছিল। একই সঙ্গে তাঁরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা গুণসম্পন্ন এই ধারণাকে অস্বীকার করেন। তাঁরা ভারতীয়দের প্রশাসনিক দক্ষতা, সাম্রাজ্যগঠন, কুটনীতি, কর কাঠামো, সামরিক সংগঠন, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নতি প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেক ঐতিহাসিক ভারতের অতীত কুটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমকালীন ইউরোপের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনা করেন। প্রাচীন ভারতীয়রা রাষ্ট্র পরিচালনার অযোগ্য ছিল— ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের এই ধারণার তাঁরা তীব্র পরিবাদ করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবিষ্কৃত 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটি তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে তুলে ধরেন। এই গ্রন্থ প্রমাণ করেছিল যে ভারতীয়রা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যবস্থা, কূটনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। অনেকেই কৌটিল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে ম্যাকিয়াভেলী ও বিসমার্কের সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন যে প্রাচীন ভারতায় রাষ্ট্র ছিল স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরতন্ত্রমূলক। তাঁরা বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের রাজারা সকলের জন্যই সুবিচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক এই ধারণা নাকচ করে দেন যে ভারতীয় শাসকরা মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেননি। অনেকে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্ঘে আধুনিক গণতন্ত্রের সাযুজ্য লক্ষ্য করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতে সরকার কখনই দায়িত্বহীন ও খামখেয়ালী ছিল না। শাসনব্যবস্তায় বিভিন্ন ধরনের পথ ছিল যদের মধ্য দিয়ে জনমত কার্যকরী হতে পারত। অনেক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় রাজতন্ত্র ছিল নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ এবং অনেকটাই সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের মত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কৌটিল্য বর্ণিত মন্ত্রি পরিষদকে ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সর্বোপরি, প্রাচীন ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব ছিল। অনেক লেখক চন্দ্রগুপ্ত, আকবর ও শিবাজীর আমলে 'assembly, parliament and cabinet system'-এর অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এমনকি

যুদ্ধের সময় শাসকরা 'আন্তজার্তিক আইন' মেনে চলতেন। এঁরা রাজাদের জোর করে কর আদায় করার বক্তব্যেরও বিরোধিতা করেছেন। ১৯১৫সালে প্রকাশিত Hindu polityগ্রন্থে ঐতিহাসিক কে.পি. জয়সোয়াল যুক্তি দেখিয়েছেন যে 'The ancient Indian political system was either republican or that of constitutional monarchy'.

জাতীয়তাবাদের ইতিহাসচর্চার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ঃ পশ্চিমী সভ্যতায় ও শাসনতন্ত্রে যা কিছু ভাল, তা সবই ভারতে ছিল। এজন্য ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'Corporate life in Ancient India' গ্রন্থে লিখেছেন, 'Institutions which we are accustomed to look upto as of western growth had also flourished in India long ago.'

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে ভারতীয়রা ধর্ম, আঞ্চলিকতা, ভাষা ও জাতিগতভাবে বিভাজিত ছিল এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন অন্তর্হিত হলেই তাদের ঐক্য আবার বিনষ্ট হবে। এর অর্থ হল ভারতীয়দের কোন দেশাত্মবোধ বা জাতীয় ঐক্য ছিল না। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন এই দাবি করে যে প্রাক-উপনিবেশেক ভারতে সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল। এমনকি 'a sense of Indian nationhood' ও বিরাজ করত। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে 'জাতীয় রাজা'র প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল।

তবে ডঃ বিপান চন্দ্র ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ঐক্যের কথা বললেও ভারতের ইতিহাস লেখার সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যকে আলাদাভাবে দেখানে হয়েছে এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের পৃথক গুরুত্বের কথা বলা হয়েছ। তাছাড়া এইসব ঐতিহাসিকদের মতে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য এবং আকবর বিখ্যাত এই কারণে যে তাঁরা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ডঃ বিপান চন্দ্র এখানে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেছেন বিশেষ করে 'গান্ধীযুগ' এর ক্ষেত্রে। একদিকে এইসব ঐতিহাসিকরা অহিংসা নীতির প্রশংসা করেছেন, আবার অন্যদিকে বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে সম্রাটদের সামরিক শক্তির প্রশংসা করেছেন, একদিকে সম্রাট অশোককে তাঁর অহিংস নীতির জন্য প্রশংসা করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে এর জন্য তাঁর সাম্রাজ্যের দুর্বলতার কথাও বলা হয়েছে। এ ছাড়া ডঃ বিপান চন্দ্র মনে করেন, এইসব ঐতিহাসিকরা ভারতের সংস্কৃতির কথা বললেও জাতিগত অত্যাচার, নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি এবং পুরুষ প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেননি। এঁরা বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানের ভূমিকার কথা বললেও ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বিদেশের অবদানের কথ্য উল্লেখ করেননি। যাই হোক, প্রাচীন ভারত সম্পর্কে ইতিহাসচর্চা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল ১৯৩০-এর দশকে। পরবর্তীকালের লেখাগুলি প্রধানতঃ আগের পর্বের লেখার পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়।

১৯২০-এর দশক ও তার পরবর্তীকালে মধ্যযুগের ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা প্রসার লাভ করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক ও সাম্প্রদায়িক অভিগমনের বিরোধিতা করা। মধ্যযুগের ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে পূর্বসূরী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রায় সবটাই গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে তাঁরা উত্তর ভারতে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভবের উপর জোর দিয়েছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছিল

সাধারণ মানুষ ও উচ্চশ্রেণীর মানুষদের স্তরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে। ভারতে স্থিতিশীল হবার পরও মুসলমান শাসকরা বিদেশী ছিল—এই ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক বক্তব্যকে অস্বীকার করেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। তাঁরা এই মতেরও বিরোধিতা করেন যে হিন্দু ও মুসলমানরা পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বসবাস করত। তবে ঔপনিবেশিক নিন্দার বিরুদ্ধে তাঁরা যদিও ভারতের অতীত ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছিল ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বপক্ষে কথা বলেছিল, তবুও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য চেষ্টা করত। প্রশ্নটি হল ঃ কীভাবে একটি ছোট বাণিজ্যিক কোম্পানী হাজার হাজার মাইল দূরের একটি দেশের সাহায্যে ভারতের মত একটি বিশাল দেশ জয় করেছিল যে দেশের অতীত সভ্যতা ছিল গৌরবজনক। এইখান থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সামাজিক কাঠামোর সমালোচনা শুরু হয়। একই সঙ্গে সামাজিক ইতিহাস ও বিশেষ করে জাতিভেদ প্রথা ও সমাজে নারীর স্থান বিষয়ে ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সমসাময়িক জাতীয়তাবাদীদের ঔপনিবেশিকতার সমালোচনার ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক উদ্যেগ শুরু হয়। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যেহেতু একটি গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেজন্য ১৯৩০ এর দশকে ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তবে ১৯৫০-এর দশকের পর এই ধারা ফলবতী হয়। তবে সীমিত উপাদান এইসব ঐতিহাসিকদের একটি প্রধান দুর্বলতা পূরে দেখা দিয়েছিল। তাঁরা প্রধানতঃ লিখিত উপাদানের উপর নির্ভর করেছিল। যদিও শিলালিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। তবে প্রত্নতাত্বিক চর্চা তখনও তার শৈশব কাটিয়ে ওঠেনি এবং নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানকে ব্যবহার করা খুবই নগণ্য ছিল। একইভাবে অর্থনীতিবিদ্যাও অর্থনীতিবিদদের কুক্ষিগত ছিল।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর আধুনিক ভারতে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠার আবির্ভাব ঘটে।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগকে কেন্দ্র করে। আধুনিক ভারতে-এর অস্তিত্ব খুব কমই ছিল। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক গোষ্ঠার আবির্ভাব ঘটে। এর কারণ হল, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ শিক্ষকদের পক্ষে ঔপনিবেশিক অধিকর্তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য পেশ করা সহজসাধ্য ছিল না। স্বভাবতই ১৯৪৭-এর পর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রাখা অনেকটাই নিরাপদ ছিল। এর ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বা ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ইতিহাস রচিত হয়নি। এটাও কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার অনুপস্থিতির উপযুক্ত ব্যাখ্যা নয়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে একটি বিস্তারিত ও বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার উদ্ভব ঘটে। এই কাজ করেছিলেন শিক্ষা জগতের বাইরের লোকেরা এবং জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবাদরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— দাদাভাই নওরোজী, বিচারপতি রাণাডে, জি.ভি. যোশী, আর.সি.দত্ত, কে.টি. তেলাঙ্গ, জি.কে,গোখেল ও ডি.ই. ওয়াচা। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন শিক্ষক অর্থনীতিবিদ এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। এঁরা হলেন—কে.টি শাহ, ভি.কে.কালে, সি.এন.ভাকিল, ডি.আর.গ্যাড্‌গিল, জ্ঞান চাঁদ, ভি.কে.আর ভি রাও এবং ওয়াডিয়া। তাঁদের সমালোচনা সেই সময়ের ইতিহাস বইতে স্থান পায়নি। অবশ্য ১৯৪৭ রে পরে এবং বিশেষ করে ১৯৬০-এর দশকে ও তারপরে এঁদের লেখার গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। তবে এঁদের বক্তব্য ও সমালোচনা ১৯২০ সালের পর গণ আন্দোলনের যুগের জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের মর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

তিলক, গান্ধীজী, জওহরলাল নেহেরু, সর্দার প্যাটেল এবং সুভাষচন্দ্র বসু এঁদের লেখার উপর ভীষণভাবে নির্ভর করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন তাঁরা হলেন আর. জি. প্রধান, এ.সি.মজুমদার, জওহরলাল নেহরু এবং পট্টভি সীতারামাইয়া। উত্তর ১৯৪৭ পর্বের ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় আন্দোলনকে ন্যায়সম্মত বলে মেনে নিলেও ঔপনিবেশিকতার অর্থনৈতিক সমালোচনাকে এর ভিত্তি বলে মানতে চাননি। জাতীয় সংগ্রামের অন্যান্য ধারাগুলিকেও তাঁরা প্রায় গুরুত্ব দিতে চাননি।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা এক্ষেত্রে দুভাগে বিভক্ত হয়েছেন। তারাচাঁদ প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, উনিশ শতক থেকেই ভারত 'Nation-in-the-making' পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অন্য একদল ঐতিহাসিক মনে করেন, প্রাচীন যুগ থেকেই ভারত একটি জাতি হিসাবে পরিণতি লাভ করেছিল। তবে একই সঙ্গে এঁরা সবাই ভারতের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা শ্রেণি ও জাতকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ পরস্পর বিরোধিতা এবং মহিলা ও উপজাতিদের উপর অত্যাচার ও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়গুলি এড়িয়ে গেছেন। তাঁরা শ্রেণি ে জাতিগত পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিষয়গুলিকেও ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গভীরতর বিশ্লেষণ করেননি। ডঃ বিপান চন্দ্র বলেছেন, 'They often indulged in its blind glorification.' তাঁর মতে, তাঁরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অবহেলা করেছেন।

প্রশ্ন

১। 'প্রাচ্যের স্বৈরাতন্ত্রের তত্ত্ব' বা 'Theory of Despotism' কি?

২। আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহসিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব করে ঘটে?

১.৩.৭.৪ ঃ ইতিহাসচর্চায় ধর্মতত্ত্ব বা দিব্যতন্ত্র (Theological Historiography)

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চের উচ্চপদস্থ বিশপ, ধর্মযাজক এবং পুরোহিত বা সন্ন্যাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনা করতেন তা ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় স্বাভাবিকভাবেই যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অ-খ্রীষ্টান ইতিহাস গ্রন্থের পরিবর্তে পুরানো বাইবেলের (Old Testament) অন্তভুক্ত ইহুদিদের পবিত্র লেখকে অত্যধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে গুণগত বিচার-বিশ্লেষণে ইতিহাস হিসাবে এগুলি ছিল অনেক নিকৃষ্ট মানের।

ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চা খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়নি। চার্চের ইতিহাসমনস্ক হতে প্রায় তিন শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছিল। প্রধানত পরিস্থিতির চাপে চার্চ ইতিহাস লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। কারণ, গ্রীক ও রোমান সমাজ যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরোপে চার্চের উচ্চপদস্থ বিশপ, ধর্মযাজক এবং পুরোহিত বা সন্ন্যাসীরা খ্রীষ্টধর্মকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস রচনচা করতেন তা ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চা নামে পরিচিত। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বা বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। এই ইতিহাসচর্চার মূল বক্তব্যটি হল মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বার্থকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিল, সেখানে খ্রীষ্টধর্ম ব্যক্তিস্বার্থকে অত্যাধিক মূল্য দিতে শুরু করে। আত্মার চিরন্তন মুক্তিতে জীবনের অন্যান্য মুক্তি আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হতে থাকে। ইহলৌকির জীবনের চেয়ে পারলৌকিক জীবনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। খ্রীষ্টধর্ম নিজেই যে ইতিহাস সৃষ্টি করছিল, তার ঐতিহ্য ও ইতিহাস লিখে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। চার্চ ঐতিহাসিকরা ইতিহাসকে চার্চের উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসাবে পরিণত করে। তাঁদের কাছে ইতিহাস হল এমন অক প্রণালী যাতে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করে।

প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত ক্যামেরিয়ার বিশপ ইউসেবিয়াস পেম্পিলাসকে (২৬০-৩৪০) ধর্মতাত্ত্বিক বা চার্চ ইতিহাস চর্চার জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বইটির নাম হল The Church History এবং The Chronicle. দ্বিতীয় বইটিতে তিনি খ্রীষ্টান জগতের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসের রূপরেখা তৈরী করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি থেকে খ্রীষ্ট ধর্মের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কালক্রম পাওয়া যায়। তিনি ইহুদি জাতিসংক্রান্ত ঘটনাগুলি ও তারিখকে বেশী গুরুত্ব দেন। তাঁর রচনায় ইহুদি-খ্রীষ্টান ইতিহাস অধিকাতর গুরুত্ব পায়। তাঁর The Church History গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ওবিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি খ্রীষ্ট ধর্মের অনুকুলে মতামত প্রকাশ করেন। ইতিহাসের প্রত্যেকটি বর্ণনায় তিনি যীশুর দেবত্বর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তবে চার্চ বা ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন সেন্ট অরেনিয়াস অগষ্টাইন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীঃ)। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম হল 'The City of God'। বইটি লিখতে তাঁর ১২ বছর সময় লেগেছিল। এই বইটিতে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বর চার্চ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং চার্চ হল ঈশ্বর সৃষ্ট নগরী (City of God) ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বা দিব্যরাজ্য চার্চের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। মানুষের সৃষ্ট নগরী ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট নগরী বা চার্চের ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশী। ঈশ্বরসৃষ্ট নগরী মানুষকে সততা, প্রেম, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া প্রদান করে। অগস্টাইন প্রচার করেন যে স্রষ্টা আগে থেকেই সব কিছু জানেন এবং ইতিহাসের ঘটান সংঘটিত হবার মূলে স্রষ্টার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে। সুতরাং স্রষ্টার অধীনে থেকে মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ ঘটে থাকে।

ধর্মতাত্ত্বিক বা দিব্যতান্ত্রিক ইতিহাসচর্চার আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক হলেন পাউলাম অরোমিয়াস (৩৮০- ৪২০খ্রীঃ) তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট অগষ্টাইনের ভক্ত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম হল Seven Book of History Against the Pagans. এই বইটিতে তিনি দেখান যে অবিশ্বাসী, ইহুদি ও খ্রীষ্টান সকল সম্রাজ্যের ভাগ্য স্রষ্টার মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়।

ধর্মতাত্ত্বিক বা চার্চ ইতিহাস চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে এই ধরনের ঐতিহাসিকরা মানুষের কাছে ঈশ্বরলাভের উপায়গুলি ব্যাখ্যা করতেই বেশী আগ্রহী ছিল। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় বা বস্তুর প্রতি তাঁদের কোন আগ্রহ ছিল না। এই ইতিহাস চর্চার মূল বক্তব্য হল মানবজাতির ইতিহাস ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন

১। ধর্মতাত্ত্বিক বা চর্চা ইতিহাস চর্চা কাকে বলে?

২। ধর্মতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চায় সেন্ট অগষ্টাইনের অবদান কি ছিল?

১.৪.১.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. A.Aloysius : Nationalism without a Nation in Indis.
2. B.Anderson : Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
3. David Amold : The India Nation in 1942.
4. David Kopf : British Orientalism and the Bengal Renaissance.
5. Ranajit Guha : Historiography of India : A Nineteenth Century Agenda and its implications.
6. R.G.Collingwood : The Idea of History.
7. Jamex T. Shotwell : The History of History.

১.৩.৭.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

1. Discuss the differences between the colonial and nationalist historiography.
2. What are the specific featurec of nationalist historiography concernin ancient India?
3. Analyse the signi ficance of Orientalist Recovery of Ancient Indian History.
4. Discuss the role of William Jones in the Orientalist movement.
5. Analyse the cheif characteristics of the imperialist historiography
6. What is called the Theological or the Church Historiography?
7. What was the contribution of St. Augustine in the Theological Historiography?
8. Write a note on the Theological Historiography as far as your knowledge is concerned.

একক ৮

Subaltern Approach to History

বিন্যাসক্রম ঃ

১.৩.৮.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৩.৮.১ ঃ সূচনা (Introduction)

১.৩.৮.২ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কি? (What is Subaltern 'Historiography')

১.৩.৮.৩ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি (Nature and approach of Subaltern Historiography)

১.৩.৮.৪ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা (Limitation of Subaltern Historiography)

১.৩.৮.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৩.৮.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৩.৮.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝায়।

(২) এই ইতিহাসচর্চায় কারণ ও বৈশিষ্ট্য।

(৩) এই ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও এই গোষ্ঠীর ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গি।

(৪) এই ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব।

(৫) এই ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা।

১.৩.৮.১ ঃ সূচনা

'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ'-এর মুখ্য প্রবক্তা হলেন রণজিৎ গুহ। ১৯৮০ সালের পর থেকে এই 'সাবলটার্ণ স্ট্যাডিজ' ভারত ও এশিয়া সহ বিশ্বের প্রায় সব আঞ্চলিক ইতিহার রচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৮০-র দশক থেকে 'সাবলটার্ণ' শব্দটি ভারতীয় ইতিহাস চিন্তায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। ১৯৮২ সালে 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। ১৯৮৩ সালে সাবলটার্ন স্টাডিজের মুখ্য প্রবক্তা রণজিৎ গুহার 'Elemetay aspects of

Peasant Insurgency in Colonial India' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল এবং ঐ একই বছরে প্রথম 'সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন এই গোষ্ঠীর ইতিহাসচর্চাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেল। এরপর এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর নানা লেখকদের প্রচেষ্টায় ১১টি খণ্ডে এদের নানা সংকলন প্রকশিত হয়েছে। এই 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ' শুধু যে ভারতীয় ইতিহাসচর্চাকেই প্রভাবিত করেছে তা নয়, ভাষা-সাহিত্য, চলচ্চিত্র শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য নানা ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, লাতিল আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের প্রায় সব আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই এই ঐতিহাসিক গোষ্ঠী কম-বেশি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেছে।

প্রশ্ন ১। 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ'-র মুখ্য প্রবক্তা কে? তাঁর লেখা একটি বই-এর নাম লেখো।

১.৩.৮.২ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা কী?

বাংলায় 'সাবলটার্ণ'-এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'নিম্নবর্গ'। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হতে পারে 'সাবর্ডিনেট'। Subaltern (নিম্নবর্গ) ইংরেজী ভাষায় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেনের অধস্তন অফিসারদের 'সাবলটার্ণ' বলা হয়। তবে শব্দটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নস্থিত। মার্কসীয় আলোচনায় এই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া হয় ইতালির কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামশিচর (১৮৯১-১৯৩৭) বিখ্যাত 'Prison notebooks'-এ। ('কারাগারের নোটবই')। তখন থেকেই শব্দটির ব্যবহার ছিল বহুমুখী। প্রথমে গ্রামশি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে। ক্ষমতা বিন্যাসের যে ধরন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চরিত্র তৈরি করে—তার ফলেই ক্ষমতার অধিকারী 'উচ্চবর্ণ' (Elite), যারা হলেন 'Dominant class' আর ক্ষমতাহীন 'সাবলটার্ণ' বা নিম্নবর্গ। বহুক্ষেত্রেই অবশ্য গ্রামশি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, শাসন এই শব্দগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যে এর থেকে বোঝা সম্ভব নয় এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা। এই শব্দগুলিকে তিনি সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরে তার আলোচনা যত এগিয়ে চলে তখন দেখা যায় গ্রামশি এক বিশেষ অর্থে 'সাবলটাণ' শব্দটিকে ব্যবহার করছেন। এখানে 'সাবলটাণ' শব্দটি 'প্রলেতারিয়েট'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাবলটার্ণ শ্রেণী' হল শ্রমিক শ্রেণী। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরণের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাবলটার্ণ' শ্রমিক শ্রেণীর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে 'হেগেমনিক' শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি, 'বুর্জোয়াজি'। শ্রমিকশ্রেণী/বুর্জোয়াশ্রেণী, এই বিশেষ অর্থে সাবলটার্ণ/হেগেমনিক শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কের বিষয়ে গ্রামশির বিশ্লেষণ আধুনিক মার্কসবাদী আলোচনায় এক বিশিষ্ট অবদান। এই বিশ্লেষণে গ্রামশি

সাবলটার্ণ কথাটির সাধারণ অর্থ হল অধস্তন বা নিম্নাস্থিত। গ্রামশি শব্দটি ব্যবহার করেন ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরনের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী শোষিত ও শাসিত হয়। গ্রামশির লেখায় অবশ্য 'সাবলটার্ণ' চেতনার এবং ক্ষমতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে।

গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির উপর যার মাধ্যমে বুর্জোয়শ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, তৈরি করে এক সামগ্রিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। কেবল রাষ্ট্রীয় শক্তিকে অবলম্বন করে এই সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'গেগেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে 'সাবলটার্ণ' শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়। গ্রামশির বিশ্লেষণে তাই গুরুত্ব পেয়েছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সম্পর্ক, জাতি, জনগণ, বুর্জোয়াশ্রেণী ও অন্যান্য শাসকগোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় জীবনের একচ্ছত্র প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, বুর্জোয়াশ্রেণীর সার্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। সার্বিক সাংস্কৃতিক বা ভাবাদর্শগত কর্তৃত্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশ স্বয়ংচালিত (Self-sustaining) করে তোলে। গ্রামশির লেখায় অবশ্য 'সাবলটার্ণ' চেতনার এবং ক্ষমতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। তা সত্ত্বেও এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে, এমনকি তাদের আন্দোলন প্রতিরোধের রূপ দিতে পারে তার ইঙ্গিতও রয়েছে। এই জটিল সমস্যা ও সম্ভাবনার আলোচনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় ইতিহাসের সাবলটার্ণ তত্ত্ব।

প্রশ্ন ১। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা (Subaltern Historigraphy) বলতে কী বোঝ?

১.৩.৮.৩ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

গ্রামশির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯৮৩-তে রণজিৎ গুহ তাঁর 'Elementary aspects of Peasant Insuragency in Cononial India' গ্রন্থে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা এবং মার্কসীয় ইতিহাসচর্চার আদিকল্পগুলির বা মডেলের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রশ্ন তুলবেন এবং বিকল্প খাড়া করলেন। প্রতিষ্ঠিত আদিকল্পগুলোকে কঠোর সামালোচনা করে 'তলা থেকে ইতিহাস' দেখার এবং লেখার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। এলিট নেতৃত্বের গুরত্ব অস্বীকার করে তাঁরা নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব, (গ্রামশির 'multiple elements of conscious leadership but no one of them... predominant') নিম্নবর্গের আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য, তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বকতৃত্বকে (autonomy)-কে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড়ো করে দেখাতে চাইলেন। বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহের ও নিম্নবর্গীয় আন্দোলনের গুরুত্ব ও তত্ত্ব বিশ্লেষণের কাজে লেগে গেলেন। Subaltern studies-এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় রণজিৎ গুহ বলেছেন ''We are opposed as much of the prevailing practice in historiography and the social sciences for its failute to acknowledge the Subaltern as the maker of his own destiny''। আর এই তত্ত্ব স্থাপন করতে গেলে 'elitist paradigm' বা উচ্চবর্গীয় আদর্শ-এর প্রতিবাদী ইতিহাস লেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় Subaltern ঐতিহাসিকগণ

*খুব অপ্রত্যাশিতভাবেই 'সাবলটার্ণ স্টাডিজ' এখন তার নিজ চেহারা বদল করে ফেলেছে। কারণ কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা না রেখে **Subaltern Studies**-এ সব বিষয় নিয়েই লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, তা আজও গভীরতার অনুসন্ধান করা।*

এই ঘোষণা করেন যে তারা সহজ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস ব্যাখ্যার মতই (কারণ উভয়ই 'one sided and blinkered historiography') নস্যাৎ করবেন, আবার কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর মত সব আদর্শবাদের 'রাংতাওলা মোড়ক' ছিন্ন করবেন। তাদের মতে, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস বা মার্কসীয় ইতিহাস— কোনটিতেই জনগণের রাজনীতিকে প্রাপ্ত যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনকে বোঝা হয়েছে নেতৃবর্গের রাজনীতির বা উচ্চবর্গের রাজনীতির অংশ হিসেবে। এমনকী, যেসব কৃষক-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এই নেতৃ-রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টতরই প্রায় ছিল না বললেই চলে, পুরোনো ধরনের ইতিহাসে সেগুলিকেও বলা হয়েছে নেহাতই স্বতোৎসারিত, 'উপ-রাজনৈতিক' (Pre-political) আন্দোলন হিসেবে। সেখানে সত্যিকারের আধুনিক রাজনীতির কোন বোধ বা লক্ষণ দেখেননি ঐতিহাসিকেরা। রণজিৎ গুহ বললেন—এইসব কৃষক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মধ্যে অবশ্যই এক নিজস্ব সৃজনশীল ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক চেতনা ছিল এবং এই সঙ্গে ছিল উচ্চবর্গের রাজনীতি থেকে সংগ্রহ করা নানা বিক্ষিপ্ত মূল্যবোধও (inherited and uncritically absorbed material of the ruling culture) নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী বলতে চাইলেন যে এই দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নিম্নবর্গের ভাবনাচিন্তায় আর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল এক সম্পূর্ণ অধরা সামাজিক ইতিহাস। এর ফলেই তৈরি হয়ে উঠল সাবলটার্ণ স্টাডিজ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গৌতম ভদ্র, শাহীদ আমিন, জ্ঞান পাণ্ডে, ডেভিড আর্নল্ড ও আরও অনেকের নানা রচনায় দেখা গেল এক স্বতন্ত্র ধরনের ইতিহাসচর্চা। এই ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় হল নিম্নবর্গের কার্যকলাপ ও আন্দোলনকে তুলে ধরা এবং উচ্চবর্গের আন্দোলনের থেকে এর পৃথকীকরণ। তাদের মতে, জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ও ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বিদেশি ও স্বদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের লড়াই। এই প্রসঙ্গে বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন ঃ ... 'This (Subaltern) approach is characterised by a generally 'a historical glorification of all forms of popular militancy and consciousness...'

প্রশ্ন ১। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

১.৩.৮.৪ ঃ নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা

এ কথা ঠিক নিম্নবর্গীয় ইতিহাস রচনার প্রয়াস, তাদের তত্ত্ব, নতুন উপাদান (Source) আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করেছে। কিন্তু এইসঙ্গে এই কথাটিও সত্যি যে তাদের মতাদর্শে ও রচনায় অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। সাবলটার্ণ স্টাডিজ—এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক-এর প্রবন্ধে। ১৯৮৫ সালে লেখা প্রবন্ধ দুটিতে স্পিভ্যাক প্রস্তাব দিয়েছিলেন, 'সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য', এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকদের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গে অপর হিসেবে নিম্নবর্গেকে কীভাবে নির্মাণ করা যায়, সেই প্রক্রিয়াগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করা।

মোটামুটিভাবে পঞ্চম-ষষ্ঠ খণ্ড থেকে সাবলটার্ণ স্টাডিজ-এ প্রকাশিত গবেষণায় নতুন ঝোঁক ও পুরোনো আদিকল্পের বা মডেলের সংশোধন, পরিবর্তন বা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। আগের

সাথে এই পর্বের প্রধান পার্থক্য এই যে ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে নিম্নবর্গের সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ পরিপূর্ণ চেহারার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, এই অতি সরল ধারণাটি এখন পরিত্যক্ত হল। আশির দশকের শেষে এসে দেখা গেল সাবলটার্ণ স্টাডিজের প্রাথমিক ধারণাটির আপাত অবলুপ্তি, নতুন এক ব্যাখায় 'আধিপত্য' বলতে কেবলই বোঝানো হচ্ছে এক সর্বগ্রাসী পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আবহকে। নিম্নবর্গ সেখানে নানা ধরণের গ্রস্ত সাংস্কৃতিক ভুবন। আগেকার সমাজ অর্থনৈতিক আলোচনা থেকে সচেতনভাবে সরে এসেছেন নব্যপন্থীরা, কেননা ঐ অর্থনৈতিক আলোচনার ভিত্তি স্পষ্টতরই মার্ক্সীয় দর্শন যা কিনা ঐ ধরনের পাশ্চাত্য 'সর্বজনীনতার' (Universalism) বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এখন দেখা যাচ্ছে, 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর কোনও নির্দিষ্ট বিষয়গত সীমারেখা থাকছে না। সব বিষয় নিয়েই সেখানে লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে। পূর্বে 'চাষা-ভুষো কুলিনকামিন নিয়ে' তারা লিখছিলো। এখন হঠাৎ বঙ্গিম-গান্ধী-জওহরলাল, বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তাঁরা লেখা শুরু করেছে। এখন নজর গিয়ে পড়েছে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর, যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ওপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ স্কুল-কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশনাসংস্থা, হাসপাতাল-ডাক্তার-চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনসংখ্যা গণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্প উৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রমসংগঠন, বিজ্ঞান-সংস্থা, গবেষণাগার—এইসব প্রতিষ্ঠানের বিশদ ইতিহাসও এবার 'সাবলটার্নস্টাডিজের' বিষয় হয়ে পড়ল। এই চেহারা বদল খুব অপ্রত্যাশিত নয়। তবে এই ধারার আলোচনায়ও নানা দুর্বলতা রয়েছে। সাংস্কৃতিক আধিপত্যের আলোচনায় কেবলই ঢাকা পড়ে যায় অর্থনৈতিক সামাজিক ভেদাভেদরে বাস্তব।

নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় ছিল নিম্নবর্গের কার্যকলাপের ও আন্দোলনকে তুলে ধরা এবং উচ্চবর্গের আন্দোলন থেকে এর পৃথকীকরণ। এ কারণে তাঁরা এলিট নেতৃত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করে, নিম্নবর্গের সচেতন নেতৃত্ব, আন্দোলনের স্বাতন্ত্র, স্বকীয়তা ও স্বকর্তৃত্বকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। তাদের মতে জাতীয় সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবাদ ভারতীয় জনগণের সংগ্রাম নয়, বেদিশে ও স্বদেশি এলিটদের সঙ্গে নিম্নবর্গের লড়াই।

প্রশ্ন

১। কয়েকজন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার ঐতিহাসিকের নাম লেখো।

২। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বক্তব্য কি?

১.৩.৮.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। নিম্নবর্গের ইতিহাস (সম্পাদন)—গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়

২। 'Subaltern Studies : Deconstructing Historiography' in R. Guha (ed) Subaltern Studies IV. (Gayatri Chakraborty Spivak)

৩। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—অমলেশ ত্রিপাঠী

৪। নিম্নবর্গের ইতিহাস—রণজিৎ গুহ, 'এক্ষণ' পত্রিকা—পঞ্চদশ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, বর্ষ ১৩৮৯

১.৩.৮.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো। এদের ইতিহাসচিন্তার প্রকৃতি কি?

২। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের পশ্চাতে গ্রামশির রচনার কোনো ভূমিকা আছে কি?

৩। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো।

৪। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কি?

৫। সাবলটার্ণ ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কি?

একক ৯

Post-Modernist Approaches to History

বিন্যাসক্রম ঃ

১.৩.৯.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.৩.৯.১ ঃ ইতিহাসের উত্তর আধুনিক মতবাদ

১.৩.৯.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.৩.৯.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৩.৯.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) উত্তর আধুনিকতাবাদ কথাটির অর্থ

(২) ফোকোর উত্তর আধুনিকতাবাদের তত্ত্বের প্রসারে ভূমিকা ও তাঁর মতবাদের বৈশিষ্ট্য

(৩) উত্তর আধুনিকতাবাদের সমালোচনা

১.৩.৯.১ ঃ ইতিহাসের উত্তর-আধুনিক সমালোচনা

পোস্টমর্ডারনিজম্ শব্দটির অর্থ কী? "Modern-day Dictionary of Received Ideas" গ্রন্থে বলা হয়েছে "This word has no meaning. Use it as possible" অর্থাৎ এই শব্দটি কোন প্রকৃত অর্থ নেই। এই শব্দটি কোন কিছু থেকে কোন কিছুকে বোঝায়। ধারণার জগতে পোস্টমডারনিজম এক গোলকধাঁধা। এর দুর্বোধ্য বিষয়বস্তু পাঠকদের বিহ্বল করে তোলে। অধ্যাপক Arran Gare মনে করেন, পোস্টমর্ডারনিজম একটি বিতর্কের আবহাওয়া তৈরি করে যে পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে পশ্চিমী সমাজে প্রকৃতি কোন সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটেছি, কিনা। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সেটি ভাল না খারাপ? আসলে পোস্ট মডারনিজম কথাটির কোন ছোট একটি শব্দার্থ নেই। এর বিষয়বস্তু হল বর্তমান যুগ এবং কাজ হল এই যুগের মানুষের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করা। Gare-এর মতে, আধুনিকতা, উন্নতি ও জ্ঞানদীপ্ত মানবিকতায় বিশ্বাস হারানোর মধ্য দিয়ে পোস্টমডার্ণ অবস্থায় সৃষ্টি হয়। পোস্টমর্ডার্ণিস্টরা মনে করেন উপরোক্ত ধারণাগুলির জন্যই মনুষ্যত্ব আত্মহননের পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের মতে, উন্নতির ধারণা চরমতম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দুটি বিশ্বযউদ্ধের দ্বারা। যার মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে ধ্বংস, দারিদ্র, পরিবেশ দূষণ এংব মানবিকতার অবনমন। সুতরাং, It may be stated in general terms that post modernism reflects this loss of faith in modernity.

Post modernism কে অনেক সময় 'Post Structuralism-এর সমার্থক বলে মনে করা হয়। যদিও দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য আছে। ১৯৬৮ সালে May আন্দোলনের সময় প্যারিসের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে Post Structuralist বা Post modern ধারণার উৎপত্তি ঘটে। কয়েকজন Post Structuralist বুদ্ধিজীবী এই মতের সমর্থন করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Barthes, Lacan, Foucault, Derrida, Guattari প্রমুখ। তবে Post modernism-এর সূত্রপাত ঘটে Nietzsche এবং Martin Heidegger-এর রচনার মাধ্যমে। প্যারিসের বুদ্ধিজীবীরা এদের অনুসরণ করেছিলেন। Ben Agger সাধারণভাবে Podt struct uralism nd post modernism এর মধ্যে একটি পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তার মতে, Post-structuralism হল a theory of Knowledge এবং post modernism হল a theory of society, culture and history, তবে প্রকৃত পক্ষে দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা খুবই কঠিন। যে জন্য বিশেষ করে ইতিহাসের উপর প্রভাবের ক্ষেত্রে দুটি ধারণাকে একইরকমের মনে করা যায় না। বর্তমান post modemist দের আলোচ্য বিষয়গুলি হল 'Science', 'Politics,' 'Colonialism', 'Late capitalism, classessness, rece, gender,women's studies, Feminism, aesthetic theory, literary critcism, environmental pollution and history.'

পোস্ট মর্ডারনিজম এর বিষয়বস্তু হল বর্তমান যুগ এবং কাজ হল এই যুগের মানুষের অভিব্যক্তির মূল্যায়ন করা। পোস্ট মর্ডান নিজমরা মনে করেন উন্নতির ধারণআ চরমতম আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দুটি বিশ্ব যুদ্ধের দ্বারা। যার মধ্যদিয়ে প্রকটিত হয়েছে ধ্বংস দারিদ্র পরিবেশে দূষণ এবং মানুবকতার অবনমন। ***Post structuralist*** *এবং* ***Post modernist-****রা জ্ঞানদীপ্ত সামাজিক চিন্তার যে সমালোচনা করেছেন তারসঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে।* ***Post mosernist*** *চিন্তাবিদ* ***foucault*** *ইতিহাসের সমালোচনা করে বলেছেন এবং কোন মানবিক বিষয় নেই এবং ইতিহাস মানবিক উন্নতির উপর জয় প্রকাশ করতে পারে না।* ***Foucault*** *ইতিহাসে প্রবাহমানতা বা পরস্পর বিশ্বাসী নন।*

Post structuralist এবং post modernistরা জ্ঞানদীপ্ত সামাজিক চিন্তার যে সমালোচনা করেছেন, তার সঙ্গে ইতিহাসের গভীর সম্পর্ক আছে। বস্তুতপক্ষে post modern চিন্তাধারা ঐতিহাসিক চিন্তাধারার সামনে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিখ্যাত post modernist চিন্তাবিদ Foucault ইতিহাসের সমালোচনা করে বলেছেন যে এর কোন প্রতিনিয়ত মানবিক বিষয় নেই এবং ইতিহাস মানবিক উন্নতি অর্থাৎ প্রগতির উপর মানবিক বৃত্তির জয় প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়া তিনি বলেছেন, মার্কস এবং বেগেল যা ভেবেছিলেন সেইরকম ইতিহাসের কোন প্রকৃত উদ্দেশ্য নেই। Foucault মনে করেন অতীত তার অবিকল পুরনো কাঠামোর আর নেই এবং সেইজন্য ঐতিহাসিকর অতীত থেকে যা পুনরুদ্ধার করে তা কখনোই ‘বস্তুগত সত্য’ বলে বিবেচিত হতে পারে না। সেইজন্য অতীতে তথ্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব রচনা করা যায় না। তাঁর মতে, বস্তুগত ধরণা হল অবান্তর চিন্তা। কারণ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একই ঐতিহাসিক তথ্যের একটিই সত্য বেরিয়ে আসে না, বেরিয়ে আসে অনেক ধরনের সত্য। এছাড়া Foucault 'continuity in history' অর্থাৎ ইতিহাসের প্রবাহমানতার ধারাকে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'history is necessarily disconinuous'. আসলে তিনি এক নতুন ধরনের ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। তিনি তার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, নিয়মবিদ্যা, ব্যাখ্যা এক সিদ্ধান্তগুলির মধ্য দিয়ে অতীতকে নতুনভাবে দেখাতে চেয়েছেন। তিন পশ্চিমী সভ্যতা এবং এর জ্ঞানদীপ্তিগত ভিত্তিকে কটোরভাবে সমালোচনা করেছেন। Foucauly ইতিহাসের কতগুলি অগ্রচলিত ও আকর্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা

করেছেন যেগুলি হল—''madness, sextuality, criminality and the evolution of social attitudes towards them''. Foucault-এর প্রথম বইটির নাম হল 'Madness and Civilisation'—এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে পাগলাগারদের উৎপত্তি হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাগলামি সম্পর্কে ধারণাও কীভাবে পরিবর্তন ঘটেছিল। মধ্যযুগে পাগলামিকে 'পবিত্র' বলে মনে করা হত। আবার আদি আধুনিক পাশ্চাত্যে এটিকে একটি রোগ হিসাবেই মনে করা হত। Faucault তার 'The Birth of the Clinic' গ্রন্থে ঔষধের ইতিহাস সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। Faucault-এর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'The Archaeology of Knowledge', 'The order of Things, Discipline and Punish, The History of Sextuality' ইত্যাদি। তবে অধ্যাপক J.G. Merquior বলেছেন, Faucault-র ইতিহাস সম্পর্কিত তত্ত্ব সবক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যেও অনেক ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য ছিল নির্বাচিত এবং বিকৃত। তার বিশ্লেষণের মধ্যেও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

Foucault-এর ইতিহাস চিন্তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

Foucault ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'বর্তমান'কেই প্রাধান্য দিতে চান। কারণ তিনি মনে করেন অতীতের objective বা বস্তুগত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, ''It was only in the perspective of the present that the past can be explained''. Foucault দাবী করেছেন যে, তিনি অতীতের চেয়েও বর্তমান থেকে বেশি জ্ঞানলাভ করেছেন। এর ফলে অতীতের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গুরুত্ব কমে যায় এবং বর্তমানকাল প্রভাব বিস্তার করে। Foucault ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক বুর্জোয়া প্রভাবিত সংস্কৃতির পরিবর্তে 'History of the Present'-কে গুরুত্ব দিয়েছেন।

Foucault জ্ঞানদীপ্তি যুগের 'মানবিকতা', 'ব্যক্তির গুরুত্ব' ইত্যাদি ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 'The Order of Things' গ্রন্থে তিনি মানুষ, ব্যক্তি ও মানবিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি এই গ্রন্থে 'death of man'-এর কথাই বলেছেন।

Foucault ইতিহাসে continuity বা প্রবাহমানতা বা পরম্পরায় বিশ্বাসী নন। পশ্চিমী দর্শন ও চিন্তাধারার মধ্যে যে যোগসূত্র ও পরম্পরা বা পর্যায় আছে সেগুলিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। এই 'epistome'গুলির মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই বলে তিনি মনে করেন। পশ্চিমী দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ৪টি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল ঃ

(i) Pre-classical (upto 1650AD)

(ii) Classical (1650-1800)

(iii) Contemporary age (Singe 1950)

তিনি মনে করেন এই চারটি স্তরের মধ্যে Continuity বা পরম্পরাগত যোগসূত্র নেই।

Foucault ইতিহাসে ক্ষমতার নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন ইউরোপে জ্ঞানদীপ্ত ও উনিশ শতকের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান আসলে জনগণের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছে।

বিজ্ঞান আসলে জনগণের উপর ক্ষমতা আরোপ করতে চেয়েছে। বিজ্ঞান ছিল ক্ষমতা বিস্তারের মাধ্যম। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ধীরে ধীরে মানুষের উপর ক্ষমতা বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান যে 'শাশ্বত সত্য' কথা বলে তা আসলে হল শক্তির প্রকাশ তিনি বলেছেন ''all knowledge, reason and science are but instruments and tools of the will to power. The criterion of truth is might.''

Faucault-এর বক্তব্যের প্রধান বিরোধী হলেন অধ্যাপক Merquior। তিনি বলেছেন, ইতিহাসচর্চায় Foucault-এর নতুন বৈজ্ঞানিক নিয়মবিদ্যা এতদিন ধরে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। Peter Sedgwick-ও তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। এর বক্তব্য হল Foucault তাঁর আধুনিকতা ও বুর্জোয়াবিরোধী মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে কতকগুলি 'False assumption' তৈরি করেছেন। অন্তত ঔষধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি এর 'discontinuity' তত্ত্বকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। Foucault-এর সমালোচনা করে David Levy বলেছেন, যদি কেউ ইতিহাসে 'Continuity'-এর তত্ত্বকে অস্বীকার করেন তাহলে ইতিহাসকে কীভাবেই বা বোঝা যাবে? তিনি বলেছেন, 'A degree of historical continuity is basic to an understanding of the past.'' সমালোচকেরা মনে করেন, ফরাসী বিপ্লবকে Faucault তাঁর ইতিহাস চর্চার বিষয়বস্তু না করে ঠিক কাজ করেননি।

সমালোচনা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, Foucault তার বিদ্রোহী ও বিতর্কিত ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন পদ্ধতি আনার চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক Mark Poster তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন— ''Foucault offers historians a new framework for studying the past, a new set of methods for doing so and new notion of discontinuity.''

প্রশ্ন

১। 'পোস্টমর্ডারনিজম' শব্দটির অর্থ কী?

২। কয়েকজন পোস্টমর্ডারনিস্টের নাম করো।

১.৩.৮.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। E. Sreedharan—'A Textbook of Historiography'

২। Kelth Jenkins (ed.)—The Post-Modern history Reader.

৩। Steven Best and Doglas kellner—Post-modern theory : Critical Interrogation'.

১.৩.৯.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উত্তর-আধুনিকতাবাদ বলতে কী বোঝায়? মিশেল ফুকো কীভাবে উত্তর-আধুনিকতাবাদকে ইতিহাসের ধারণায় আলোচনা করেছেন?

পর্যায় গ্রন্থ–৪

Different Theories

একক ১০

Cyclical, Historical Materialism, Sociological

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৪.১০.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৪.১০.১ ঃ চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব (Cyclical Theory)

১.৪.১০.২ ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

১.৪.১০.৩ ঃ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসতত্ত্ব (Sociological Approaches in History)

১.৪.১০.৪ ঃ তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব (Comparative History)

১.৪.১০.৫ ঃ মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস

১.৪.১০.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৪.১০.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৪.১০.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১) চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়

২) এই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক ও তার ব্যাখ্যা

৩) এই তত্ত্বের প্রসারে ভিকোর অবদান আলোচনা

৪) কার্ল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

৫) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নানা সূত্র ও তার ব্যাখ্যা

৬) সামাজিক ও আর্থিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া

৭) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্য

৮) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্বের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল

৯) তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের অবদান

১০) মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির নিপুণভাবে প্রয়োগ

১১) তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির সমালোচনা

১.৪.১০.১ ঃ চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব (Cyclical Theory)

ইতিহাস চক্রাকার আবর্তন হল একটি নীতি যার অর্থ হল সমস্ত ঘটনাই চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রায় একইভাবে ফিরে আসে। চক্রাকার তত্ত্বের দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল Cosmic Cycle; আর দ্বিতীয়টি হল মানুষেঔ কার্যকলাপ সম্বন্ধীয়। চক্রাকার তত্ত্ব প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল। জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু যে চক্রাকার তত্ত্ব তা প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। ভারতেও যে চারটি যুগের ধারণা প্রচলিত আছে তার মধ্য দিয়েও চক্রাকার তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন — মহাযুগ, সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদি। এই ধারণা প্রচলিত আছে যে কলিযুগের পর পৃথিবীতে আবার নতুন বছর শুরু হবে। গ্রীস ও রোমেও এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিক নিৎস্ "Eternal Recurrence"-এর কথা বলেছেন। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এমপোডোক্লিস্-ও (Empedocles) এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন। হেরাক্লিটাস, এ্যারিস্টটল এই তত্ত্বকে আরও ব্যাখ্যা করেন — যেমন আগুন তার তাপ হারিয়ে বাতাসে পরিবর্তিত হয় এবং পৃথিবীতেও তার শুষ্কতা হারিয়ে জলে পরিণত হয়। স্টোয়িকরাও চক্রাকার তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। খ্রীষ্টান লেখকরা অবশ্য 'Cosmic Cycle'-এর নীতিকে গ্রহণ করেননি। তবে ঊনিশ শতকে নিৎস-এর 'Eternal Recurrence'-এর বক্তব্যের মাধ্যমে আবার Cosmic Cycle ধারণা ফিরে আসে।

প্লেটো তাঁর 'Statesman'-এ বলেছেন, "all history is advance and retrogression. These occur in cycles" অ্যারিস্টটল তাঁর Mataphysics-এ বলেছেন, "The arts and sciences have been lost and regained many times'. **Politics** গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "All ideas of any value have already been discovered and tried'. *Dr Caelo* গ্রন্থে তিনি বলেছেন, "The same doctrines have been discovered inmumerahle times". অবশ্য Aristotle 'periodic recurrence'-এর ধারণার সঙ্গে 'cosmic sycles' কে মেলাতে চাননি। তাঁর **On Philosophy** গ্রন্থে ধ্বংসের (deluge) পর আবার সভ্যতার পুনর্জন্মের কথা বলেছেন। তবে তিনি এই চক্রের সীমা কত বছর তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। তাছাড়া বিভিন্ন চক্রের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। অ্যারিস্টটল এবং পলিবিয়াস সরকারের অবক্ষয়ের মধ্যেও চক্রাকার তত্ত্বের সন্ধান করেছেন। পলিবিয়াস তাঁর 'History' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ছয় ধরনের সরকার বারবার নির্দিষ্টভাবে ফিরে আসে। যেমন 'monarchy, aristocracy, oligarchy, democracy এবং mob-rule পলিবিয়াস মনে করেন, এক একটি cycle বা চক্র প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তৈরি হয়।

মধ্যযুগে এই তত্ত্ব স্তিমিত হয়ে যায়। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের চেয়ে রাষ্ট্রের নৈতিক আচরণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের গোড়ার দিকে পলিবিয়াসের তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে। দিয়োভালি গিলোনির 'Chronicle of Florence' গ্রন্থে আবার চক্রকার তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভিলানি বলেছেন যে "Success engenders pride, sin and sin brings on decline'. পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলী ছিলেন পলিবিয়াসের উত্তরসাধক।

ম্যাকিয়াভেলী তাঁর Discourses গ্রন্থে পলিবিয়াসের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এছাড়া Francesco Guicciardini তাঁর Ricordi গ্রন্থে বলেছেন, "The Future repeatsthe past and that only the names of things change."

'বিংশ শতাব্দীতে অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা বলেছেন, সমগ্র মানব ইতিহাসকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতি হিসাবে ভাগ করা যায় না। এগুলির আবার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। স্পেঙ্গলার তাঁর 'Decline of the West' গ্রন্থে বলেছেন, সংস্কৃতির পর্বের পর Rationality-র পর্ব আসে। তারপর আসে সভ্যতার পর্ব। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিশীল উৎসাহ বিনষ্ট হয়। তিনি মনে করেন 'The cycle of culture-civilization-death-culture goes for ever.' টয়েনবি তাঁর গ্রন্থে পৃথিীর ২৬টি দেশের সত্যতাকে নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'All hae undergone the same stimuli known as challenges.' সভ্যতা এই চ্যালেঞ্জের জবাব বিভিন্নভবে দেয় এবং একেই সেইসব সভ্যতার ইতিহাস বলে ধরা হয়ে থাকে। স্পেঙ্গলার ও টয়েনবির লেখার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটি সাধারণ Pattern পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তিগত ঘটনা পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক George Boas ইতিহাসের চক্রকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেটি বারবার একই জায়গায় ফিরে আসে। তিনি বলেছেন, "The doctrine of historical cycles is that based on the metaphor of the swingling pendulum according to which an historical movement will reach an extreme and the turn back until it reaches an opposite extreme. Thus radicalism and conservatism in politics, romanticism and classicism in art, skepticism and authoritarianism in religion have all been said to occur in this manner."

আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভিকোর অবদানগুলির অন্যতম হল তার চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, সাধারণবাবে এবং বিশেষ করে জাতিগত ইতিহাস কয়েকটি অগ্রগতির স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। যেমন উত্থান, পরিপূর্ণতা, ক্ষয় এবং পতন। ভিকো এই অভিমত পোষণ করেন যে, একটি সমাজ-জীবনের বিভিন্নধারা তাদের চলার পথে একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। ইতিহাসের অগ্রগতির স্তরগুলি তাদের নিজস্ব প্রথা, আইন-কানুন, অর্থনীতি, সাহিত্য এবং শিল্পের মাদ্যমে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের এই অগ্রগতিকে ভিকো তিনটি অধ্যায় বা স্তরে বিবক্ত করেছেন। ভিকো তাঁর প্রথম স্তরটির নাম দিয়েছেন 'Age of God' বা ঈশ্বরের যুগ'। ভিকোর মতে, এই যুগের মানুষ বিশ্বাস কদ্দরত যে, তাঁরা ঈশ্বরের শাসনে বসবাস করছে। ভিকোর মতে, সমাজে আদিমতম অধ্যায় ছিল ঐশ্বরিক। কারণ সংস্কৃতিগতভাবে এইযুগ ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। ভিকো তাঁর দ্বিতীয় স্তরটির নাম দিয়েছেন 'Age of Heroes' বা 'বীরদের যুগ'। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃআক্রমণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য অলিগার্কি বা মুষ্টিমেয় শাসন প্রচলিত হয়। এই সময় সমাজ 'Patrician' এবং 'Plebian' ক্রীতদাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় শক্তিশালী এবং সম্মানীয় যুদ্ধবাদী অভিজাততন্ত্র সমাজের আইনসম্মত পদের অধিকারী ছিল। যেহেতু বীরদের প্রতিহত করবার জন্য সমাজে কোন বাস্তব আইন ছিল না সেজন্য দ্বৈরথ সংগ্রামই ছিল যে কোন দ্বন্দ্বের মীমাংসার সহজ পদ্ধতি। ভিকোর বক্তব্য অনুসারে ক্রমশঃ মর্যাদার চূড়ায় ওঠা এই সমস্ত বীরদের স্বৈরাচারী হয়ে ওঠার প্রবণতা আরেক ভাবে প্রতিহত হত। সেটি হল এই সমস্ত বীররা ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। যেহেতু বীরদের ক্ষমতাকে 'ঐশ্বরিক' বা 'divine' বলে মনে করা হত, সেজন্য ক্রীতদাসরা এদের তুলনায় নিচুমানের জীবনযাত্রাকে স্বাবাবিক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল। ভিকো বর্ণিত তৃতীয় স্তর হল 'মানুষের যুগ' বা 'Age of men'। এই যুগে প্রত্যেকটি মানুষ সমান

মর্যাদার অধিকারী ছিল। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল প্রথম জনপ্রিয় শাসনতন্ত্র। এই শাসন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই যুগ ছিল সম্পূর্ণভাবে মানবতার যুগ। এইযুগে শুভবুদ্ধি ও কর্তব্যবোধের এক অপূর্ব সংমিশণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এই যুগের সরকার মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এই যুগে প্লেবিয়ানরা তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছিল এবং তা অর্জনও করেছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় সমাজ দোদুল্যমান হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ ও প্রথাগত ব্যবস্থার মধ্যে ঘটে যায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আসে গণতন্ত্রের যুগ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা। পরিণামে সমাজে শুরু হয় অবক্ষয়। ভিকোর মতে, এই চক্রের শেষ হয় বৈদেশিক আক্রমণে বা গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পরিণামে আবার আসে পুরানো বর্বরতা এবং সূচনা হয় নতুন এক চক্রের। ভিকো এই চক্রের নাম দিয়েছেন 'Recorso' বা 'Recurrence'।

ইতিহাসে চক্রাকার আবর্তন তত্ত্ব হল একটি নীতি যার অর্থ হল সমস্ত ঘটনাই চক্রাকার পদ্ধতিতে প্রায় একইভাবে ফিরে আসে। চক্রাকার তত্ত্ব প্রাচীন ভারত, ব্যাবিলন ও গ্রীসে প্রচলিত ছিল। ফ্রেডারিক নিংস, এমপোডোক্লিস, হেরাক্লিটাস ও এ্যারিস্টটল এই মতের সমর্থক ছিলেন। মধ্যযুগে এই তত্ত্ব স্তিমিত হয়ে যায় কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের গোড়ার দিকে পলিবিয়াসের তত্ত্বের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে অসওয়াল্ড স্পেঙ্গালার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভিকোর অন্যতম অবদান হল তার চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব। তার তত্ত্ব অনুযায়ী অতীতে যা লঘটেছিল, তা ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে ঘটবে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভিকোর ধারণা অনুযায়ী অতীতে যা ঘটেছিল, তা ভবিষ্যতেও ঠিক একইভাবে ঘটবে। এইভাবে তিনি ঐতিহাসিক অগ্রগতির একটি স্থায়ী চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে 'Recurrence' ঠিক অতীতের পূর্ণ প্রতিফলন নয়, এটি হল নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এক বিবর্তন।

এইভাবেই চক্রাকার পরিবর্তনের দৃঢ় সমর্থক ভিকো ইতিহাসের সমান্তরাল অগ্রগতির ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। ভিকোর চক্রাকার পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ রোমান সভ্যতা। রোমান সাম্রাজ্য সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে বিশ্বের সব দেশকেই অতিক্রম করেছিল। আধুনিককালে এক প্রধান চিন্তাবিদ হিসাবে ভিকো ইতিহাসের গতিশীলতাকে অস্বীকার করেছিলেন এবং অনুসন্ধানে এক নতুন পথের নির্দেশ দেন।

প্রশ্ন

১। পৃথিবীর কোন কোন দেশে প্রাচীনকালে আবর্তন চক্র প্রচলিত ছিল?

২। এ্যারিস্টটল তার কোন কোন গ্রন্থে আবর্তন চক্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

১.৪.১০.২ ঃ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

মনীষী কার্ল মার্কস তাঁর নব দর্শনের আলোকে ইতিহাস ব্যাখ্যার যে নতুন পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে নিম্নলিখিত সূত্রগুলি নিহিত আছে।

(i) 'যে সকল সংঘর্ষের ফলে যুগে যুগে সমাজের রূপান্তর ঘটেছে তা মানুষের মনোরাজ্যের সৃষ্টি নয়। মানুষ নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা অন্য নিরপেক্ষ চিন্তার দ্বারা সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ভোগ্যবস্তু উৎপাদন রীতির পরিবর্তনের ফলেই সমাজে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে সমাজব্যবস্থা রূপান্তরিত হয়ে থাকে।'

সমাজে প্রগতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে অনেক বড় বড় সমাজ সংস্কারকের বা চিন্তা নায়কের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের বাণী, তাঁদের প্রচার সমকালীন জনমানসের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছে, একথাও ঠিক। ইউরোপীয় মহাদেশে গণতন্ত্র ও উদার নীতির প্রতিষ্ঠায় ইংল্যাণ্ডের জন স্টুয়ার্ট মিল, জেরেমি বেন্থাম কিংবা ফ্রান্সের রুশো, ভলতেয়ার প্রভৃতির বৈপ্লবিক চিন্তার প্রভাব কিংবা আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাপুরুষদের চিন্তার প্রভাব স্পষ্টতই ?আমাদের অন্তরকে অভিভূত করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ সকলের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাব যে, এইসব চিন্তানায়কের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। প্রচলিত বাস্তব অবস্থার প্রবাবেই এদের আবির্ভাব ঘটেছে। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-রীতির ভিতরে তার ধ্বংসকারী প্রতিকূল অবস্থাগুলির সমাবেশের ফলে পুরানো উৎপাদন রীতি ভেঙে পড়েছে। পুরানো উৎপাদন রীতি ভেঙে না পড়লে ইউরোপ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই সম্ভব হত না। সব সময়ই প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই তৎকালীন সামাজিক সম্পর্কগুলি রূপায়িত হয়।

প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির রীতিনীতি ও সৃষ্ট সম্পদের বিলির ব্যবস্থা যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তার ফলে মানুষে মানুষে যেভাবে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে — তারই সাথে তাল রেখে মানুষের 'কৃষ্টি' ও 'বোধ' রূপায়িত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানুষ এবং পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে 'ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার প্রণালী'কে অবলম্বন করে অনাদিকাল থেকে সম্পর্ক প্রবহমান রয়েছে। এ সম্পর্ক প্রতি মানবের সহজাত। কোন মানুষই এ সম্পর্ককে পরিহার করতে পারে না।

মানবগোষ্ঠীর সাথে বস্তু সমষ্টির এই যে চিরানুসৃত সম্পর্ক রয়েছে — তারই ফলে এক মানুষ আর এক মানুষের সাথে সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ মানুষ ও বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক — মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ভোগ্যবস্তুর ব্যবহার রীতির পরিবর্তনের সাথে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কেরও প্রকারভেদ ঘটে।

মানুষের ধর্মবোধ, ন্যায়-নীতি সম্পর্কীয় ধারণা বা রুচি এগুলির কোনটাই স্থিতিশীল নয়। এককালে যা 'ধর্ম' বলে বিবেচিত হয়, 'ন্যায়' বলে সমর্থিত হয় অন্যকালের মানুষের বিবেচনায় তাই আবার 'অধম' অন্যায় বলে নিন্দিত হয়ে থাকে। যে ক্রীতদাস প্রথা একালে বহু নিন্দিত, সেই ক্রীতদাস প্রথাকে এককালে অ্যারিস্টটলের ন্যায় মহাপণ্ডিতও 'ধর্মীয় বিধান' বলে সমর্থন করেছিলেন।

মানুষের সামাজিক ব্যবহার, নীতিবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, ধর্মবোধ-এ সমস্তই পরিবর্তনশীল। 'সনাতনধর্ম' কথাটাই স্ববিরোধী। কারণ সভ্যতার ইতিহাসে 'সনাতন' বা শ্বাশ্বক ধর্মের কোন হদিস্ মেলে না। উৎপাদন রীতির পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সম্পর্কের প্রকারভেদ ঘটেছে তার সেই জন্যই ন্যায়, নীতি, ধর্ম, পাপ, পুণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের পূর্বতন ধারণা পাল্টে যাচ্ছে।

মার্কসের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হল মানুষের সামাজিক তেনা ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে ভিন্ন। এক একটি আর্থিক-রীতি কতকগুলি সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এই সকল সামাজিক সম্পর্কই মানুষের সামাজিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আদিকাল থেকে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সূত্র যে সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সামাজিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে, সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বন্টনের পদ্ধতির বিভিন্নতা অনুসারে মার্কস তার নিম্নলিখিত রূপ বিভাগ নির্দেশ করেছেন।

সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের সাথে যোগাযোগের ফলে। সৃষ্টির আকিাল থেকে প্রকৃতি মানুষে মানুষে এই যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। ফলমূল সংগ্রহের জন্য বনে ঘোরার সময় যূথবদ্ধ হয়ে চলাফেরা না করলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যূথবদ্ধ চলার রীতি বানর সমাজেও দেখা যায়। খাদ্যের জন্য বন্য পশু শিকারের কাজও দলবদ্ধ হয়েই করতে হত। কোন কোন দেশে ভল্লুক, হাতি প্রভৃতি জন্তুর মাংসও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হত। এগুলিকে একা একা শিকার করা একেবারেই অসম্ভব। তাই আদি সমাজে জৈবিক প্রয়োজনেই যূথবদ্ধ রূপে জীনযাত্রার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এযুগে সম্পত্তি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়নি। তাই এ সমাজে সামুহিক শ্রমে খাদ্য সংগ্রহ, হাতিয়ার প্রস্তুত, আত্মরক্ষা ইত্যাদি অপরিহার্য ছিল বলে আহৃত বস্তুর ভোগও ছিল সামুহিক। এই হল 'আদিম সাম্যবাদ'। এঙ্গেলস বলেছেন যে, এই আদিম কমুনিজমের যুগেই 'সম্পত্তির' প্রথম উদ্ভব হয়। এর ফলে যূথ জীবনে সঙ্কট আসে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বার্থে শ্রমনিয়োগ পুরাতন সামুহিক সম্পদ ও সামুহিক শ্রমের প্রথাকে পরাস্ত করে। আদিম সাম্রাজ্যবাদ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মনুষ্য সমাজ মানব সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

কার্ল মার্কস ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, ভোগবস্তুর রীতির পরিবর্তনের সাথে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকার ভেদ ঘটে। সভ্যতার প্রতিস্তরেই প্রচলিত আর্থিক রীতির মধ্যে সঙ্কট উদ্ভুত হয় এবং উন্নততর আর্থিক রীতির সন্ধানের জন্যে মানুষের মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে। যখন একদল এই উন্নতর আর্থিক রীতির সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। তখন তার সঙ্গে পুরানো আর্থিক রীতির আওতায় যে প্রভুশ্রেণী পুষ্ট হয়ে এসেছে। তার সঙ্গে বিরোধ বাধে কারণ তারা নতুন আর্থিক রীতির প্রবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দেয়।

নতুন সমাজে প্রাচীন 'যূথ' বা 'কম্যুনের' স্থান গ্রহণ করল — 'গোষ্ঠী'। যূথে সমষ্টির প্রাধান্য। গেষ্ঠীতে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য। আদিম যূথ সমাজ বিধ্বস্ত হল পশুপালনস্বরূপ নতুন শ্রম কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে। এরফলে কতকগুলি পশু আর বন্য বা প্রাকৃতিক সম্পদ থাকল না — ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত হল।

মার্কস মানব সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে যে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজের উল্লেখ করেছেন—প্রাচীন ভারতের ঋষিপ্রধান সমাজ তারই নিদর্শন। গ্রীস দেশের ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজের চিত্র আরো সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। মানুষের সমাজ বিকাশের ইতিহাসে গোষ্ঠী-প্রধান সমাজ মানুষের জীবন চর্চায় অসামান্য পরিবর্তন নিয়ে আসে।

মান সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম সমাজ বিপ্লব যূথ সমাজকে ভেঙে দিয়ে গোষ্ঠীপতি-প্রধান সমাজ প্রতিষ্টা করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতেই এই সমাজ গড়ে ওঠে।

মার্কস বলেন — 'যে অবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যম ও শ্রম নিয়োগের মুখ্য উপযোগী অবস্থা সমূহের উপর ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব থাকে কেবল সেই অবস্থাতেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে। সমাজে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এল, সাথে সাথে সেই সম্পত্তির মালিকানার সূত্রে সমাজের সমস্ত মানুষ প্রধান দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একশ্রেণী যারা সম্পত্তির মালিক, অপর শ্রেণী যারা সম্পত্তির মালিক নয়। সমাজে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক স্থাপিত হল।

প্রভু শ্রেণী ও দাস শ্রেণী—এই দুই শ্রেণীতে মানবগোষ্ঠী বিভক্ত হল। একশ্রেণীর লোকেরা পরশ্রমভোগী, অপর শ্রেণীর লোকেরা শ্রমজীবী। এক শ্রেণী শোষক, অপর শ্রেণী শোষিত। গোষ্ঠীপতিদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও তাদের বিলাস দ্রব্যের সরবরাহ করবার জন্য প্রচলিত আর্থিক রীতিকে চালু রাখার জন্য ঐ যুগে ক্ষুদ্র শিল্পী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে নিয়ে এক মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই মধ্যশ্রেণীর মালিকানাভুক্ত হয়। কিছু দাসেরা মুক্তির জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আপন স্বার্থে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। পুরাতন আর্থিকরীতির সাথে নব আবিষ্কৃত আর্থিকরীতির লড়াই বাধে। এ লড়াইয়ে গোষ্ঠীপতি প্রধান সমাজ ভেঙে পড়ে। মানব সমাজ আবার সভ্যতার এক নতুন স্তরে উন্নীত হয়।

ভূস্বামীতান্ত্রিক সমাজকে অনেকে সামন্ত-প্রধান সমাজ বলে। একজন বড় ভূস্বামীর অধীনস্থ অন্য ছোট ছোট ভূস্বামীদের 'সামন্ত' বলে মার্কস এই সমাজকে 'ফিউডাল' সমাজ নামে আখ্যাত করেছে। মানব সব্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় সমাজ বিপ্লব হল—ফিউডাল বিপ্লব। ভূমির উপরে মানুষ ও পশুর শ্রম নিয়োগ করে ধনোৎপাদন করার কৌশল অবগত হওয়া মানব মস্তিষ্কের এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন।

ফিউডাল আর্থিক রীতি আপন প্রয়োজনেই এক মধ্য শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে। এই মধ্য শ্রেণীর লোকেরা প্রধানত বণিক এবং বৃত্তিজীবী শিল্পী। ফিউডাল ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে এই মধ্য শ্রেণীর লোকদেরও নিজেদের কাজকর্মে মূলধন নিয়োগের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং তাদের ক্রমশঃ বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অসন্তুষ্ট ভূমিদাসরা এদের কাছে প্রশ্রয় পেতে থাকে। মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা নতুন বাণী নিয়ে শোষিতবর্গের সম্মুখে দেখা দেন। ফিউডাল প্রভুশক্তির অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের বাণী প্রচণ্ড সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে নতুন আর্থিকরীতি, পুরাতন জরাজীর্ণ ফিউডাল আর্থিক রীতিকে সরিয়ে দিয়ে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। মানব সভ্যতা আরো এক নতুন প্রগতির ক্ষেত্রে উন্নীত হয়। পত্তন হয় নতুন সমাজের, যার নাম পুঁজিতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজ— ইংরাজীতে বলা হয় ক্যাপিটালিস্ট সমাজ।

শিল্পজ উৎপাদনে স্পষ্টত দুইটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটল। এক মালিক শ্রেণী বা শিল্পপতি — যারা শ্রম না করে মূলধন খাটিয়ে মুনাফা লোটে, অপর শ্রেণী মজুরির বিনিময়ে সেই উৎপাদনে শ্রম নিয়োগ করে। একশ্রেণী 'পুঁজিপতি' বা মূলধনওয়ালা, অপরশ্রেণী 'শ্রমিক' বা মেহনতওয়ালা। এক শ্রেণী মুনাফাভোগী, অপর শ্রেণী মজুরীজীবী। একশ্রেণী মালিক, অপরশ্রেণী মজুর। এই হল পুঁজিবাদী সমাজের শ্রেণী বিভাগের চিত্র।

মানব সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সংস্থা, আইনকানুন প্রভৃতি যে রীতিতে গঠিত ও পরিচালিত হয় তা সেই সমাজের আর্থিক রীতির প্রতিফলন মাত্র। প্রত্যেক সামাজিক স্তরেই উৎপাদন ব্যবস্থায় আধিপত্য যে শ্রেণীর উপর ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও সেই শ্রেণীর কবলিত হয়। সেই আইন কানুন, ধ্যানধারণা সর্বক্ষেত্রে প্রভুশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিফলন দেখা যায়। সভ্যতার কোন বিশেষ স্তরে যে সকল রাষ্ট্রীয় বিধান, আইন, ন্যায়বোধ ইত্যাদি প্রচলিত থাকে তা একদিক দিয়ে যেমন প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার প্রসূত ফল অন্যদিক দিয়ে প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার দর্পণ।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা থেকে আমরা যুগে যুগে উৎপাদন প্রকৃতি (mode of production) বদলে যাওয়াতেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উদ্ভব হয়েছে। উৎপাদনের শক্তি (forces of production) এবং উৎপাদনের সম্বন্ধ (relation

of production) —এই দুই-এর মিলনে উৎপাদনের প্রকৃতি গড়ে ওঠে। উৎপাদনের উপাদান (means of production) যখন গোষ্ঠী বিশেষের সম্পত্তি হয় তখন শ্রেণী বা class কে দেখা যায়। আরো যে সূত্রটি পাই তা হল ঃ 'সমাজ বিকাশের মূলনীতি (অর্থাৎ দ্বন্দ্ব নীতি) অনুসারে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমাজের প্রতিস্তরেই বিরোধের বীজ নিহিত থাকে। প্রত্যেক সমাজ তার আপন পরিপুষ্টির সাথে সাথে আত্মধ্বংসের বীজকেও পুরিপুষ্ট করতে থাকে।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে যে সকল বিশেষ সমাজ গড়ে ওঠে তারা প্রত্যেক জন্মকাল থেকে নিজের গর্ভে আত্মধ্বংসকারী শত্রু শিশুর ভ্রূণকে লালিত করতে থাকে। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তার বিস্ময়কর অগ্নগতির সূত্রে একদিকে যেমন পর্বত প্রমাণ সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি সর্বহারাজনশ্রেণীর ক্রমাগত স্ফীতি ঘটাচ্ছে। পুঁজিবাদের নিজের সৃষ্টি এই সর্বহারাজনশ্রেণী পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে লালিত দৈত্য শিশু। এই সংঘর্ষে পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং আসন্ন। পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে সর্বহারার আত্মপ্রতিষ্ঠা মানব ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ।

সামাজিক রূপান্তর (অর্থাৎ সভ্যতার এক স্তর থেকে অপর স্তরে উন্নয়ন) শান্তিপূর্ণ ক্রমবিকাশের নীতিতে হয় না। বেগবান্ সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজের রূপান্তর ঘটে। সভ্যতার প্রতিস্তরেই প্রচলিত আর্থিকরীতির মধ্যে সঙ্কট পাওয়া মাত্র একদল লোক তার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। পুরানো আর্থিকরীতির ধারকদের সাথ তাদের বিরোধ বাধে। পুরানো আর্থিক রীতির আওতায় যে প্রভুশ্রেণী পুষ্ট হয়েছে তারা নতুন আর্থিক রীতির প্রবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দেয়। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবর্তক কে?

২। পুঁজিবাদী সমাজের দুটি শ্রেণী কী কী?

১.৪.১০.৩ ঃ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসতত্ত্ব (Socialogical Approaches in History)

অগাষ্ট কোঁত (August Conte) প্রবর্তিত দৃষ্টিবাদী ইতিহাসচর্চার এক উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হিসাবে ইতিহাসচর্চায় সমাজতত্ত্বের প্রতিফলন ঘটে। দৃষ্টিবাদীরা ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যবহার করে মানব সমাজের গতিপ্রকৃতি কতকগুলি সূত্রের (laws) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। র‍্যাঙ্কীয় পদ্ধতিতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করার পর দৃষ্টবাদীরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সেই তথ্যগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র রচনার কাজে নিয়োজিত হন। অর্থাৎ ঐতিহাসিকদের কাজ হল সমাজতত্ত্ববিদদের মত তথ্যগুলির কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা। এজন্য R. G. Collingwood বলেছেন, "The sociologist would thus be a kind of super-historian raising history to he rank of a science." সুতরাং দৃষ্টিবাদী ইতিহাস তত্ত্ব থেকে ইতিহাসচর্চা সমাজতাত্ত্বিকতার দিকে অগ্রসর হয়। 'Man is Society' এবং 'social behaviour' সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা সচেতন হতে থাকে এবং তা ইতিহাসচর্চায় অন্তর্ভুক্ত করতে থাকে।

এমিনি ডার্কহাইম (১৮৫৮-১৯১৭) এবং ম্যাক্স ওয়েবারের (১৮৬৪-১৯২০) প্রচেষ্টায় ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

অনেক কাছাকাছি আসে এবং ইতিহাসচর্চায় সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক H. E. Barnes এবং E. H. Can ইতিহাস সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিক কার বলেছেন, 'Sociology, if it is to become a fruitful field of study, must like history concern itself with the relation between the unique and the general; but it must also bcome dynaamic — a study not of society at present but of social change and development." একথা অনস্বীকার্যযে সমাজবিদ্যা ইতিহাসকে সামাজিক গতিশীলতা অনুভব করতে সাহায্য করে। সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতি ইতিহাসচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে মানুষ ও তার সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সামাজিক ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। মানবজীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন পারিবারিক গোষ্ঠীজীবন, আচারব্যবহার, খাদ্যভ্যাস, লোকাচার, উৎসব, রমেলা ইত্যাদি সব কিছুই সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সমাজতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের কাজ হল একজন সমাজতত্ত্ববিদের মত বিভিন্ন তথ্যগুলির কার্যকারণ সম্পর্কে খুঁজে বের করা। কারণ তাদের মতে সমাজ হল ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। যেমন ঐতিহাসিক টয়েনবি সমাজকে ইতিহাস রচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করেন।

কার্ল মার্কস তাঁর *The Critique of Political Economy* দেখেয়েছেন সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। সমাজ বিপ্লব সামাজিক প্রগতি নিয়ে আসে। প্রাচীন যুগে দাসবিদ্রোহ, মধ্যযুগে কৃষকবিদ্রোহ ইত্যাদি ঘটেছে। ১৬৪২ সনে ইংলণ্ডের বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের ফলে এই দুই দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তে বুর্জোয়া সমাজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালে জার্মানিতেও একটা ঘটা ঘটে। মার্কস ও এঞ্জেলস্ এর সমাজ চেতনা ও সমাজ ভাবনা নিঃসন্দেহে ইতিহাস রচনাকে প্রভাবিত করেছে। *The Communist Manifesto* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক A. J. P. Taylor বলেছন, everyone thinks differently about politics and society, when he thinks at all." *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* সম্পর্কে একই কথা বলেছেন, এডমণ্ড উইলসন। ব্রদেল তাঁর structural history রচনার সময়ও ইতিহাসে social theoryর অবতারণা করেছেন। কারণ সামাজিক তত্ত্ব structure কে প্রভাবিত করে। ঐতিহাসিক টয়েনবিও সমাজকে ইতিহাস রচনার মূলকেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করতেন। সমাজ হল ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদান। বর্তমানে 'Social Mobility', 'social protest', 'Caste history' বর্ণব্যবস্থা, ফিউডাল সমাজ, বুর্জোয়া সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ, সামাজিক সংঘাত ইত্যাদি কথাগুলি ইতহাসচর্চায় বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে। অধ্যাপক ইরফান হাবিব তাঁর *Interpreting Indian History* গ্রন্থে দেখিয়েছেন সুরী ও তুর্কীদের উত্তরভারত বিজয়ের পর এক ধরনের 'social formation' হয়েছিল, যার ভিত্তি ছিল 'labour process', 'surplus value' এবং 'syustem of distribution of surplus' অর্থাৎ ভারতের মধ্যযুগীয় অর্থনীতিতে এক ধরনের স্বতন্ত্র 'social formation' হয়েছিল যা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে আলাদা ছিল।

তবে ঐতিহাসিক আর্থার আরউইক মনে করেন, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার মধ্যে ঘনিষ্ট যোগসূত্র থাকলেও পার্থক্যও আছে। কারণ সমাজতত্ত্ববিদরা 'general section' করে থাকেন, যা ঐতিহাসিকরা সাধারণত করতে চান না।

প্রশ্ন ১। সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চা বলতে কি বোঝ?

১.৪.১০.৪ ঃ তুলনামূলক ইতিহাসতত্ত্ব (Comparative History)

ইতিহাস চর্চায় তুলনামূলক পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হল সাধারণ প্রতিষ্ঠান, ধারণা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ঐতিহাসিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলির অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তুলনামূলক ইতিহাসচর্চার প্রধান এককগুলি হল ঃ রাষ্ট্র, সামাজিক শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা (idea)। এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় এই এককগুলিকে ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া যদি সমাজগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক এককের তুলনা করার ক্ষেত্রে (যেমন—গ্রামীণ ও শহুরে, রক্ষণশীল ও আধুনিক) যথেষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে সেই পার্থক্যের স্তরভাগকেও তুলনার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। যেসব contextual veriable-গুলিকে পরীক্ষা করা হবে সেগুলিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ব্যাখ্যা করতে হবে। সাধারণভাবে তুলনামূলক পদ্ধতি বলতে cross-cultural তুলনাকেই বোঝায়। কিন্তু এই ধরনের অন্যান্য বিষয়কেও তুলনামূলক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন, কোন একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের ধারণার অনুপ্রবেশ ও গ্রহণ। এই ধরনের বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতির পরিবর্তে সেই সমাজে ধারণাগুলি গ্রহণের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলির চিহ্নিতকরণ করতে হবে।

ঊনিশ শতকের Comparative Method থেকেই আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসচর্চা উদ্ভূত হয়েছে। John Wyon Burrow-এর মতে, "Comparative Method consists in the recognition of similarities between the practices and beliefs of contemporary primitive or barbaric peoples and those reocrded in the past history of civilisation" বস্তুতপক্ষে এই Comparative Method কিন্তু অনেক আগেই ব্যবহৃত হয়েছিল। অ্যাডাম স্মিথ, অ্যাডাম ফার্গুসন, জন মিলার প্রমুখ স্কটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ্‌রা তাঁদের লেখায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। মানবসভ্যতার কথা বলতে গিয়ে তাঁরা সমাজের শ্রেণী বিভাজন করেছিলেন সেই সমাজের গঠন পদ্ধতি বা কাঠামোর সাথে মানবদেহের তুলনা করে।

ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে স্যার হেনরি মেইন আইন ও historical jurisprudence-এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁর Ancient Law এবং Village Communities in the East and West গ্রন্থ দুটিতে এবং তাঁর অন্যান্য লেখায় তুলনামূলক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি গ্রীস ও ভারতের ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমধর্মী উৎপতির তুলনা করেন। তুলনামূলক পদ্ধতি আলোচনায় তিনি একদিকে যেমন সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্রীয়করণের কথা বলেছেন, তেমনি অন্যদিকে রাজনৈতিক - অর্থনীতিবিদ্‌দের মত পরিবর্তন ও বিবর্তনের কথাও বলেছেন। ঊনিশ শতকে নৃতত্ত্ববিদ্‌রাও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকেন। তবে বর্তমানে তুলনামূলক ইতিহাসচর্চা প্রভাবিত হয়েছে কার্ল মার্কসের

*ঊনিশ শতকের **Comparative Method** থেকে আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসচর্চার উদ্ভুত হয়েছে। তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার প্রধান এককগুলি হল ঃ– রাষ্ট্র সামাজিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠান এবং ধারণা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক এককের তুলনার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিলে সেই পার্থক্যের স্তরভাগকে তুলনার অন্তর্ভুক্ত করা। কার্ল মার্কস তুলনামূলক ইতিহাসকে বর্তমানে প্রভাবিত করেছেন। টয়েনবির নিজের অজ্ঞাত সারেই রোমের ইতিহাস ও সভ্যতাকে **'ideal type'** হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অন্য দেশের সভ্যতাকে তুলনা ও মূল্যায়ন করেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের তুলনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যায় যেমন — ডারউইনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।*

মাধ্যমে। মার্কস প্রথম social action-এর সাধারণ তত্ত্ব তৈরী করেন এবং তারপর তা বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। মার্কস-এর ঐতিহাসিক ব জ্রবাদ ও সম্পদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিল। এই সম্পদ ছিল বিভিন্ন ধরনের যেমন — tribal বা communal, state, feudal and capitalistic। এই ধরনের পরিকল্পনা ইউরোপের ইতিহাসের পর্ব বিভাজনের সৃষ্টি করে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে তুলনা করার পদ্ধতির অবতারণা করে। মার্ক্স-এর ম্যাক্স ওয়েবারও তুলনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। তিনি ধর্মীয় মূল্যবোধ, আমলাতন্ত্র এবং কৃষিকার্যের বিভিন্ন প্রথাগুলির মধ্যে তুলনা করেন। তাঁর approach ছিল typological। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার গঠনকে একত্রিত করে একটি ধারার মধ্যে নিয়ে আসেন। যেমন—modern bureaucracies of the West, ancient bureaucracies of the old empires, partrimonialism, hierarchy, and caesaro-papism—এই model গুলিকে তিনি অন্য model-এর সঙ্গে তুলনা করেন এই উদ্দেশ্যে যে এর ফেলে একদিকে যেমন subtype গুলির মূল্যায়ন করা যাবে তেমনি কোন একটি বিশেষ model-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক আর্নল্ড টয়েনবিও তাঁর বিখ্যাত 'A stgudy of History' গ্রন্থে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। তিনি ২৬টি দেশের সভ্যতাকে তাঁর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একক হিসাবে বেছে নেন। দ্বেসই সভ্যতাগুলির পরিবেশগত তাৎপর্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। টয়েনবির নিজের অজ্ঞাতসারেই রোমের ইতিহাস ও সভ্যতাকে 'ideal type' হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অন্য দেশের সভ্যতাকে তুলনা ও মূল্যায়ণ করেন। তিনি খ্রষ্টধর্মকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এজন্য অবশ্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও যে বিরাট পরিধি নিয়ে তিনি কোন বিশেষ সভ্যতার dynamic এবং পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন তা অতুলনীয়। তবে পৃথিবীর ইতিহাস তত্ত্বের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য এবং বর্তমানে অর্থনীতিকে বিশ্লেষণের একক হিসাবে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায় World-economyকে আবার তিনটি type-এ বিভক্ত করা যায়—Corestates, peripheral areas, এবং semi-peripheral areas. তৃতীয় Core এবং Peripheral-এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে। মার্শাল হজসন্ পাঁচ ধরনের এর কথা বলেছেন, যাদের মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক তুলনা করা যেতে পারে। এগুলি হল ঃ (i) Common events (2) Parallel developments (3) supra regional effects (4) activity motifs (5) the inter regional role of specific regions.

হজসন ঐতিহাসিক তুলনার ক্ষেত্রে যে এককগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হল — সভ্যতা, অঞ্চল, সাংস্কৃতিক এলাকা এবং সভ্যতার ট্রাডিশন।

বৌদ্ধিক তুলনামূলক ইতিহাস সাধারণত একটি বা অনেকগুলি ধারণার উপর ভিত্তি করে সেগুলিকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। বৈজ্ঞানিক ধারণ বা তত্ত্বের তুলনামূলক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন—ডারউইনবাদ, আপেক্ষিকতাবাদ, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

প্রশ্ন

১। আধুনিক তুলনামূলক ইতিহাসের উৎস কি?

২। তুলনামূলক ইতিহাস চর্চার প্রধান এককগুলি কী কী?

১.৪.১০.৫ ঃ মার্ক ব্লক ও তুলনামূলক ইতিহাস

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক। তাঁর মতে, তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতি ইতিহাসচর্চায় এক মহত্তর কাজ সম্পাদনা করে। কারণ ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যবহারিক সমাজ সংস্থা এমনকি সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটেছে।

বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই এই পদ্ধতিটির প্রয়োগ রপ্ত করে উঠতে পারেননি। অধ্যাপক ব্লক-এর মতে এর প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তুলনামূলক ইতিহাস হল — ইতিহাসের দর্শন বা সাধারণ সমাজতত্ত্বের একটি অধ্যায় মাত্র। অন্যদিকে ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা এমন একটি পদ্ধতি চান যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যাকে সহজেই অনুকরণ করা যায় এবং যা প্রত্যক্ষ ফল দেবার ক্ষমতা রাখে — এমন একটি ব্যবহারিক যন্ত্র। মার্ক ব্লক-এর মতে, তুলনামূলক পদ্ধতি ঠিক এইধরনের একটি যন্ত্র।

অধ্যাপক ব্লক মনে করেন, কোন অঞ্চলের জমিদারী পদ্ধতির ইতিহাস রচনা করতে হলে ঐ জমিদারীর দলিল, দস্তাবেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের অংশ বিশেষের সাথে অনবরত তুলনা করতে হবে। কারণ ইতিহাস রচনার বিভিন্ন বিষয়গুলি একই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে উদ্ভুত হয়েছে। কেবলমাত্র কোন জাতি বা রাষ্ট্রের সীমারেখার পাশের ঘটনাগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই চলবে না, রাজনৈতিক ও জাতীয় বৈষণ্যের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে এই বৈষম্যগুলিই সামাজিক বৈষম্যের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। ব্লক-এর মতে সমাজ তার সম্পূর্ণতা নিয়ে একটি বৃহত্তর এককের সৃষ্টি করে। সমাজের এই এককগুলি স্থান ও কলের দিক থেকে আলাদা। কিন্তু তুলনামূলক ইতিহাস এই বিভিন্ন সমাজগুলির মধ্যে সাদৃশ্য এবং তাদের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় — পুরাতন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে বর্তমানকালের এবং আদিম সমাজের তুলনা করা যেতে পারে।

তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির আর এক ধরনের প্রয়োগের কথা মার্ক ব্লক বলেছেন। এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে তুলনীয় একক হল ‘‘ভৌগোলিক প্রতিবেশী বা ঐতিহাসিক সমসাময়িক সমাজগুলি অবিরাম পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত।’’ এই সমাজগুলি ইতিহাসের বিকাশের ক্ষেত্রে একই ধরনের কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর কারণ হল এরা স্থান ও কালের দিক থেকে পরস্পরের খুবই নিকটবর্তী। ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের তুলনামূলক পদ্ধতি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুনভাবে প্রয়োগ করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ফল দেবার একটি যন্ত্র। ব্লক বলেছেন যে ভৌগোলিক প্রতিবেশী বা ঐতিহাসিক সমসাময়িক সমাজগুলি অবিরাম পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল পার্থক্য পর্যালোচনা করা। সেই পার্থক্য মৌলিক ও সাধারণ উৎস থেকে হতে পারে।

অধ্যাপক মার্ক পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে পাশাপাশি অবস্থিত সমসাময়িক সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছন। এক্ষেত্রে

তিনি ফ্রান্সের দাসত্ব প্রথার অবসানের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ফ্রান্সের প্রভেনসে্ দাসত্ব প্রতার অবসান ঘটেছিল এবং কৃষি সংক্রান্ত রূপান্তর ঘটেছিল। এটি অষ্টাদশ শতাব্দর ঘটনা। ব্লক মনে করেন পঞ্চাদশ, ষাড়শ ও সপ্তদশ শতকেও এই অঞ্চলে এ ধরনের আন্দোলন ঘটেছিল। কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করেনি। প্রভেন্সে দাসপ্রথার বসানের আন্দোলন ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য আন্দোলন-এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এছাড়া মার্ক ব্লক মধ্যযুগের ইউরোপের মেরোভিঞ্জিয়ান ও ক্যারোলিঞ্জিয়ান রাজত্বের মধ্যে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ক্যারোলিঞ্জিডয়ান রাজত্বকাল ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং মৌলিক বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। চার্চের সাথে জনগণের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করলে মেরোভিঞ্জিয়ানদের কেবলমাত্র একজন সাধারণ মত্রাড্নুষ ছাড়া কিছু মনে করা যায় না। অন্যদিকে ক্যারোলিঞ্জিলিয়ান জনগণ রাজার সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকেই পবিত্রতার চিহ্ন পেয়েছিলেন।

তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির অপরিসীম গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও সমালোকরা তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন ঘটনার সাদৃশ্য অনুসন্ধান করা ছাড়া এই পদ্ধতির আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এই অভিযোগ করা হয় যে, অনেক চেষ্টা করেই এই সাদৃশ্য খেঁজা হয়, সাদৃশ্য খোঁজার জন্য বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োজনীয় সমান্তরাল অবস্থান প্রমাণ ছাড়া এবং ইচ্ছা করেই প্রবেশ করানো হয়। যদি এইসব অভিযোগ সত্যি হয়, তাহলে মন করতে হবে যে, এই পদ্ধতিটিতে স্বধর্মের বিকৃতি ঘটেছে। প্রকৃত অর্থে তুলনামূলক ইতিহাস পদ্ধতির মউল উদ্দেশ্য পার্থক্য পর্যালোচনা করা, সেই পার্থক্য মৌলিক ও সাধারণ উৎস থেকে হতে পারে।

মার্ক ব্লক মনে করেন, ''যখন আলোচনা বিশদ, সূক্ষ্ম ও সুপ্রমাণিত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখনই তুলনামূলক আলোচনার যথার্থ মূল্য পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন

১। মার্কব্লক কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক পদ্ধতিটিকে নিপুণভাবে পর্যালোচনা করেছেন?

২। মার্ক ব্লকের মতে কোন অঞ্চলের জমিদারী পদ্ধতির ইতিহাস রচনা করতে হলে কি করতে হবে?

১.৪.১০.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. Keith Jenkins (ed) : The Postmodern Histgory Reader.
2. Steven Best and Douglas Kellner : Post modern Theory : Critical Interrogations.
3. Brian Fay, Philip Pomper and Richard T. Vann (eds) : Histoy and Theory :contemporary Readings.
4. Butterfield : Dictionary of the History of Ideas.
5. Collingwood : Idea of History.
6. John Whitlam : 'Karl Marx' in John Cannon, ed., Historian at Work.
7. E. H. Carr : What is History

8. H. E. Barnes : A History of Historical Writing
9. Arthur Marwick : Nature of History
10. Collingwood : Idea of History.

১.৪.১০.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

1. Critically discuss cyclical view of history.
2. How did Vico formulate his cyclical views on the basis of three ages of mankind.
3. Critically discuss Marx's materialist interpretation of history.
4. How would you explain comparative theory of history.
5. What is the Sociological History?
6. Write a note on the approaches of the Sociological Historians.

একক ১১

Post-Modernist Critiques of History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৪.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৪.১১.১ ঃ উত্তর-আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ

১.৪.১১.১.১ ঃ ফুকো এবং তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন

১.৪.১১.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১.৪.১১.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৪.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তর-আধুনিকতাবাদ খুবই আলোচিত, সমালোচিত এবং গুরত্বপূর্ণ। Michael Fucault, Jacques Derrida, Jean Francois Lyotard প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকগণ উত্তর আধুনিকতাবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন গবেষক ও বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্নভাবে উত্তর আধুনিকতাবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক Arran Gare এর সংজ্ঞা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে উত্তর আধুনিকতাবাদ এমন পরিস্থিতি যেখানে আধুনিকতা, অগ্রসরতা এবং জ্ঞানদীপ্তি যুগের যুক্তিবাদ এর প্রতি কোন বিশ্বাস জ্ঞাপন করা হয় না। আরও বলা যায় যে, এটি জনগণকে এই মর্মে সচেতন করে যে, এই পরিস্থিতিই কালক্রমে মানবতাবাদকে ধ্বংসের পথে চালিত করে। এটি একটি বিশেষ পরিস্থিতি যেখানে সমগ্র আধুনিক সভ্যতা নিজেই নিজেকে একটি জটিল দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে বাধ্য হয়।

সুতরাং এই এককটি পাঠের ফলে শিক্ষার্থী আধুনিক ইতিহাসের এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে যা জটিল দার্শনিক চিন্তাভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। যা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তা হল শিক্ষার্থী এই বিষয়টি সম্পর্কেও অবহিত হবে যে, উত্তর আধুনিকতাবাদ ইতিহাসের প্রচলিত চিন্তাভাবনাকে কিভাবে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছে। মিশেল ফুকোর ন্যায় উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ কিভাবে জ্ঞানদীপ্তি যুগের চিরাচরিত ধারনাকে খণ্ডন করে ইতিহাসের ধারাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে, তা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে অবহিত করবে।

১.৪.১১.১ ঃ উত্তর-আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ

জ্ঞানদীপ্তি সামাজিক চিন্তার উপর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনায় একটি মৌলিক অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ৩০০ বছর পূর্বেও Descartes-এর ন্যায় দার্শনিকগণ ঐতিহাসিক ধ্যান ধারনাকে

চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে দেখা দিয়েছে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের কাছ থেকে। সাধারণভাবে তারা এই ধারণা উপস্থিত করেছেন যে ঐতিহাসিক ধারণার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। Derrida-র উপর লিখিত একটি প্রবন্ধে David Hoy এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মানব সভ্যতার অগ্রসরের কাহিনী যা ঐতিহাসিক গবেষকদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছিল তা এখন কার্যত পরিত্যক্ত। এমনকি এটি একটি বাগাড়ম্বরপূর্ণ অস্তিত্বহীন রূপক কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। David আরও বলেন যে, দর্শন (Philosophy) যা নিজেই মানুষের কার্যকলাপের বিবরণকে তুলে ধরে তা কার্যত এই অলীক কাহিনীরই একটি অংশ।

সপ্তদশ শতকে 'বিজ্ঞান বিপ্লব' শুরু হওয়ার পর থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়। এই প্রেক্ষাপটেই সামাজিক অথবা মানবিক বিজ্ঞানের (Human Sciences) আবির্ভাব ঘটে। মানুষের আচরণের সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও অভিন্ন ধারা আছে কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়। একটি সামাজিক বিজ্ঞানকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তৎপরতাও শুরু হয়। এই প্রবণতা চলতে থাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত Sartre-এর মত পণ্ডিতেরা ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে আক্রমণ করেন। Claude Levi Struss বলেন যে, ইতিহাসকে অন্য সব কিছুর ন্যায় জানা যাবে কিছু বৈসাদৃশ্যমূলক সাংকেতিক পদ্ধতির দ্বারা (Codes of Contrasts)। সত্য অথবা স্বাধীনতাকে জানার জন্য ইতিহাস কোনও স্বতন্ত্র উপলব্ধির বিকাশ ঘটায় না। আরও একধাপ এগিয়ে অন্যতম উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক Lyotard। ইতিহাস এবং সমাজের সম্পূর্ণতার ধারণাকে পুরোপুরি খণ্ডন করেছেন। তিনি মার্কসবাদের ন্যায় 'বিস্তৃত বর্ণনামূলক' (Grand narratives) পদ্ধতির উদঘাটন করেছেন বিশ্বজগৎকে পারস্পরিক সম্পর্কের ধাঁচে (Patterned interrelationship) বোঝার জন্য। তবে সবতেকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ্ যিনি এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, ইতিহাসে মানুষের আচার আচরণকে সাধারণ আইনকানুনের মাধ্যমে বোঝা যাবে না, তিনি হলেন মিশেল ফুকো।

১.৪.১১.১.১ ঃ ফুকো এবং তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন

ফরাসী দার্শনিক Sartre এর পর থেকে মিশেল ফুকো উত্তর আধুনিকতাবাদ বা উত্তর গঠনবাদ (Post - structuralism) সম্পর্কিত ভাবনায় নেতৃত্বে প্রদান করেছেন। ইতিহাস দর্শনের প্রতি ফুকোর বিরোধপূর্ণ চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, (ক) ইতিহাস মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধরে না। (খ) মনুষ্য প্রকৃতির উপর যুক্তিবাদের আধিপত্যকেও ইতিহাস নির্দেশ করে না। (গ) হেগেল এবং মার্কসবাদী দর্শনের মত কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ইতিহাসে নেই। এই সমস্ত যুক্তিগুলির অবতারণা করে ফুকো জ্ঞানদীপ্তি যুগের দার্শনিকদের দাবী অগ্রাহ্য করে বলেন যে, মানুষ কখনই একটি সর্বজনীন ধারণা (Universal Category) র মধ্যে থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'Effective history differs from traditional history in being without constants. Nothing in man-not even his body-is sufficiently stable to serve as a basis for this self recognition or for understanding other men,' ফুকোর মতে, ইতিহাস আমাদের আবেগ, অনুভূতি সবকিছুকেই বিভক্ত করে। সর্বোপরি ইতিহাস ধারাবাহিকতাহীন প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটায়।

ফুকোর ধারণায় অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপের বিস্তৃত ইতিহাস হল মূলত একটি অলীক কল্পনা। এটি বহুল প্রচলিত ধারণা যে, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলিত

উন্নতি অর্জন করেছে। কিন্তু মানুষের অতীতকে ফুকো কখনই শৃঙ্খলিত হিসাবে দেখেন নি, বরং সেটি একটি ঝঞ্ঝাটপূর্ণ সংঘর্ষের দ্বারা (haphazard Conflicts) সংগঠিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের জীবন ধারাবাহিকতাহীন, অসংখ্য এবং বিরামহীন সংঘর্ষের মধ্যে নিয়োজিত।

ফুকোর ন্যায় Post-Structuralist তথা উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ ইতিহাসের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করেছেন তার মূলকথা হল বিশুদ্ধ অতীত বলে কিছু হতে পারে না। এবং ঐতিহাসকিরা অতীত সম্পর্কিত যা ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারে না। অতীত সম্পর্কিত তথ্যাবলীতে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বের ভূমিকা খুব সামান্যই, বরং এই সমস্ত কার্যাবলীতে প্রধানত ঐতিহাসিকের পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে ওঠে। একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বহুমুখী সত্য উদঘাটন করতে পারে। সুতরাং নিরপেক্ষতা একটি অলীক ধারণা।

ফুকো ইতিহাসে সমস্ত রকমের ধারাবাহিকতার তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ফুকো বলেন যে ইতিহাসে ধারাবাহিকতার ধারণা চিন্তা এবং সময়ের ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে সচেতন মুহূর্তগুলির সম্পূর্ণতার প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তা, মানসিকতা এবং কাজকর্মে সমান্তরাল ধারাবাহিকতা কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে ইতিহাসে দেখা যেতে পারে। কিন্তু আসলে সেখানে মতবিরোধ, বিচ্ছিন্নতা এবং ধারাবাহিকতাহীনতাই লুকিয়ে থাকে এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির প্রতিই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। কারণ এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাগুলির মধ্যেই ইতিহাস নিক্ষিপ্ত থাকে, কোন স্থায়ী গঠন কাঠামোর মধ্যে নয়।

বস্তুতপক্ষে ফুকো যে ধরনের ইতিহাস লিখেছেন তা চিরাচরিত ইতিহাস নয়। এর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্তসমূহ অতীতকে নুতনভাবে দেখতে শেখায়। সমস্ত ধরনের মানবিক বিজ্ঞানগুলিতে (human sciences) ফুকো ইতিবাচক ধারনাগুলির বিরোধিতা করেছেন। প্রধানত ইতিহাস এবং দর্শনের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য ফুকো এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন যা শেষ পর্যন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং জ্ঞানদীপ্তির ভিত্তিগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ সমালোচনার পথ প্রশস্ত করে।

১.৪.১১.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. E. Shreedharan—A Text Book of Historiography
2. অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—'উত্তর-আধুনিকতাবাদ এবং কয়েকজন ফরাসী ভাবুক'
3. Will Thompson—'Post modernism and History'.

১.৪.১১.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উত্তর আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের মূল্য নিরূপণ কর?

২। উত্তর আধুনিকতাবাদী দার্শনিক হিসাবে ফুকো কিভাবে ইতিহাসের রূপরেখা বিশ্লেষণ করেছেন?

একক ১২

Structure, World-System, Ecological Approaches of History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৪.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১.৪.১২.১ ঃ গঠনবাদ (Structuralism)

১.৪.১২.২ ঃ ইতিহাসচর্চায় পরিবেশবিদ্যা (Ecological Historigraphy)

১.৪.১২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

১.৪.১২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.৪.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি থেকে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন ঃ

১) গঠনবাদ বলতে কি বোঝায়?

২) পরিবেশবিদ্যা চর্চার সাথে ইতিহাস চর্চার সম্পর্ক।

১.৪.১২.১ ঃ গঠনবাদ (Structuralism)

ইতিহাসের ধারণা বা মতবাদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল Structuralism । এই মতবাদের জন্ম হয়েছিল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যেটি এখনো বিস্তৃত হচেছ। এজন্য এ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখানো আসেনি। 'Structure' সম্বন্ধে ধারণাটি অবশ্য খুবই পুরানো। সপ্তদশ শতকে জীববিদ্যার শব্দকোষে এই শব্দটি পাওয়া যায়। ১৯ শতকে ভাষা সাহিত্য দর্শনের ক্ষেত্রে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। Structuralism এর কাছাকাছি একটি শব্দ হল 'System'। System ও Structure এর মধ্যে একটি অদ্ভূত সম্পর্ক আছে। যেমন System কাজ করে কিন্তু Structure করে না। যেমন Traffic Singnasl System এর মাধ্যমে Traffic নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং Structure in this sense is a more fundamental characteristic of the object it studies." Structure কেবলমাত্র একটি From নয়। Structure হল 'The significative Contact of the System.'

প্রধান প্রধান গঠনবাদীদের মধ্যে গঠনবাদ আন্দোলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই আন্দোলন কি কেবলমাত্র সমাজ বিজ্ঞানের Methodology এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে; না এটি সাহিত্যিক সমালোচনা এবং দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হবে? একটি বিষয়ে সবাই একমত যে কোন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কিছু ধারণার অগ্রগতি বিভিন্ন

ধরনের চিন্তাবিদদের আকৃষ্ট করে। তাঁদের মধ্যে কিছু সাধারণ বৌদ্ধিক মিল দেখা যায়। বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় Structuralist Trend লক্ষ্য করা যায়। ফার্দিনান্দ সসার ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে Structuralism-এর প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন।

গঠনবাদ আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছে প্রধানত লেভিস্ট্রেসের দুটি বইকে কেন্দ্র করে। বই দুটি হল Tristes Tropiques (1955) এবং La Pensee Sauvage (1962). তিনি মার্কস এবং এঙ্গেলসের কাছ থেকেই Structure সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। গঠনবাদী বিশ্লেষণ কখনো একটি সরলরেখা ধরে এগিয়ে চলে না, বা কোন নির্দিষ্ট সমস্যা থেকে নিশ্চিত সমাধানের খোঁজে বের হয় না। লেভিস্ট্রস মনে করেন ছড়ানো তথ্যগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা দরকার।

প্রধানত সাংস্কৃতিক কাব্যে গঠনবাদের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় যেখানে সবকিছুই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে mind বা মন—এর ফসল। জ্যাক দেরিদা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে গঠনবাদী দর্শনকে সাম্প্রতিক পশ্চিমী চিন্তাধারায় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। লুই আলথুজার অন্যভাবে Structuralism method ব্যবহার করেছেন। তবে আলথুজার নিজেকে একজন Structuralist বলে মনে করেন না।

মার্ক ব্লক, লুসিয়ান ফেবার, ফার্দিনান্দ ব্রদেল প্রমুখ 'আনাল' গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা তাঁদের রচনায় ইতিহাস গঠন বাদের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, 'Historiography would gain its Structral history' and historical events' are brought together is a genuinely historic explanation of human life." এই সমালোচনার উত্তরে Peter Caws বলেছেন "Fashions change, and the value of the structural perspective will survive these changes."

গঠনবাদীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উঠেছে। প্রথমত, গঠনবাদ হল একটি গোষ্ঠী বা আদর্শ যেখান থেকে Historical Positivist এবং Existentialist দের বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যা কিছু দুর্বোধ্য তাকেই Structuralist বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আপত্তিকর।

Structuralism এর কাছাকাছি একটি কাজ হল 'System' ও 'Structure' এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সম্পর্কে রয়েছে। যেমন System কাজ করে কিন্তু Structure করেনা। যেমন Trafic Signal System এর মাধ্যমে Trafic নিয়ন্ত্রণ করে। সুতারাং Structure শুধু লাল ও সবুজ আলোর সঙ্কেত দেয়।

প্রশ্ন

১। গঠনবাদ বলতে কি বোঝ?

২। গঠনবাদ সম্পর্কে লেভিস্ট্রস-এর বক্তব্য আলোচনা করো।

১.৪.১২.২ ঃ ইতিহাসচর্চায় পরিবেশবিদ্যা (Ecological Historigraphy)

বর্তমান বিশ্বের এক কঠিন সমস্যা হল পরিবেশগত সমস্যা। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যাপক হারে ভূমির অবক্ষয়, অরণ্য, সংহার, মিষ্টি জলের ঘাটতি এবং জল ও বায়ুদূষণ প্রকৃতির ভারসাম্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত করেছে। অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী থেকে লোপ পেতে চলেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের

যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে। ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে সারা বিশ্বের শিল্পায়ন একদিকে যেমন নিয়ে এসেছে বিপুল বৈষয়িক প্রাচুর্য; তেমনি অন্যদিকে করেছে ব্যাপক পরিবেশগত অবক্ষয়। প্রযুক্তির হাত ধরে এসেছে তেজস্ক্রিয়দূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, জলদূষণ ইত্যাদি। ফলশ্রুতি হিসাবে নষ্ট হয়েছে পরিবেশগত ভারসাম্য। দেখা দিয়েছে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকট। পরিবেশের এই সমস্যার বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারেন না। পরিবেশের এই সংকটের কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। এর ফলে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার উদ্ভব হয়েছে। যার নাম হল Environmental historiography বা পরিবেশগত ইতিহাস চর্চা। কারণ, আধুনিক পরিবেশবাদের উৎপত্তি ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে ইতিহাসের একটি বড় ভূমিকা আছে। সাম্প্রতিক পরিবেশ সংক্রান্ত বির্তকে ইতিহাস অবশ্যই নতুন দিক নির্দেশ করার দাবী রাখে।

পরিবেশগত ইতিহাসচর্চাকে তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (a) biocentric (b) ecological (c) economic (d) ethical. Biocentric তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, প্রাকৃতিক জীবজন্তুকে রক্ষা করা। প্রাচীন কালে বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য মানুষ ভয়ে প্রকৃতি, গাছপালা ও জীবজন্তুকে শ্রদ্ধা করত ও তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করত। পরিবেশ চর্চার ecological দিক বলতে বোঝায় 'something like a stable system, a certain mix of species of plants and animals with natural conditions like climate or soil structure remain in or near a state of equilibrium.' পরিবেশগত ইতিহাস চর্চার অর্থনৈতিক দিক হল প্রকৃতিকে ব্যবহার ও শোষণ করে অর্থনৈতিক উন্নতি করার প্রচেষ্টা। পরিবেশ চর্চার ethical দিক বলতে বোঝায় 'right of nature' বা ‘প্রকৃতির অধিকার’ এর ধারণাকে বলবৎ ও প্রতিষ্ঠিত করা। এর উদ্দেশ্য হল প্রধানত গাছপালা, জীবজন্তু ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা।

ইতিহাস ও Ecology ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক সংগঠনের পরিবেশগত প্রভাব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়তে বাধ্য। প্রাচীন যুগে মানুষের খাবার সংগ্রহ, পশুচারণ, স্থায়ী কৃষিকাজ এবং আধুনিক যুগে শিল্পায়ন নিঃসন্দেহে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করেছে। প্রাচীন যুগের প্রথম তিনটি কাজের ফলে প্রকৃতি ততটা ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিক যুগে শিল্পায়ন ও প্রকৃতিকে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাতিরিক্ত প্রচেষ্টা পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রাক-আধুনিক ইউরোপে এবং বিশেষ করে উত্তর-রেনেসাঁস যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। Keith thomas এর Man and the Naturl World গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে Simon Schame তাঁর বিখ্যাত বই Landscape and Memory গ্রন্থে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি উপাদান ব্যহার করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট করেছিল। আদিম অরণ্য, নদী-জীবন, পবিত্র পর্বতের ধারণা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে থাকে। তবে পরিবেশ ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে বড় দিক হল পরিবেশ আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি হল পরিবেশ রক্ষার আর্দশগত ও নৈতিক দিক। Donald Worster মনে করেন 'Environmental history was born out of a moral purpose'. কারণ অনেকেই মনে করেন যে 'Environmental ethics হল পরিবেশ আন্দোলনের উজ্জীবনী শক্তি।

এখন প্রশ্ন হল, পরিবেশ ঐতিহাসিকরা আধুনিক পরিবেশবাদ বা পরিবেশ চেতনার সূচনাকাল কখন থেকে ঠিক করেছেন? অধ্যাপক রিচার্ড গ্রোভ তাঁর 'Green Imperialism'(1995) ও 'Ecology, climate and Empire'

(1998) গ্রন্থ দুটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আধুনিক পরিবেশবাদ এর শুরু হয়েছিল। আমেরিকায় পরিবেশগত পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। গ্রোভ পরিবেশবাদকে আরও তিনশত বছর পিছনে নিয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন ১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি পরিবেশ চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। উপনিবেশ বিস্তারকারী ইউরোপীয়রা 'Tropical Forest' এবং 'Botanical Garden' গুলিকে সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। ১৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে Fernandery Oveido আবহাওয়ার পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত, গাছপালা সম্পর্কে তাঁর বইতে আলোচনা করেন। প্রধানত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রভাবেই উপনিবেশ বিস্তারকারীরা এই ধরনের পরিবেশচিন্তায় সচেষ্ট হয়। রিচার্ড গ্রোভ পরিবেশের ইতিহাসকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে চাননি। তিনি পরিবেশ চেতনাকে সংস্কৃতি, ধর্ম, ও অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখাতে চেয়েছেন। পর্তুগীজ ও ডাচদের মধ্যেও পরিবেশ চেতনা বা প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৫৩৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগীজ চিকিৎসক Garcia da orta এ সম্পর্কে একটি বই লেখেন। বইটিতে প্রাচ্য ও ভারতের বিভিন্ন ঔষধি গাছপালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এইসব গাছপালা থেকে সংগৃহীত ঔষধ ইউরোপে যেত। বইটিতে স্থানীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৬৭৮-১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ১২টি খণ্ডে প্রকাশিত Dutch Botanical Encyclopaedia সংকলন করেন Van Reede। তিনি স্থানীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে রাষ্ট্রীয় পরিবেশবাদ বা বিশ্ব পরিবেশবাদ (Global environmentalism) ধারণার সৃষ্টি হয়। রিচার্ড গ্রো মনে করেন, আধুনিক পরিবেশবাদ আলোচনায় স্থানীয়র পরিবর্তে বিশ্বকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। পরিবেশ চিন্তার ক্ষেত্রে Forster, Robert Kyd এবং Alexander Von Humbolt এর নাম উল্লেখ করা যায়। Robert Kyd ১৭৮৬ সালে কলকাতায় Botanical Garden প্রতিষ্টা করেন। Humbolt অরণ্য ধ্বংসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। Roxbarg বৃক্ষ রোপণের উপর গুরত্ব দেন। Nathaniel Wallich বাংলায় বাঁশ গাছ কাটার বিরুধে মত প্রকাশ করেন। Sleeman উত্তর ভারতের অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষে মতামত দেন। এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক রিচার্ড গ্রোভ মনে করেন, ''Modern environmentalism is the child of European and colonical experience as well as knowledge.'' তবে গ্রোভের আলোচনার প্রধান ত্রুটি হল তিনি পরিবেশ সচেতনতার উপর বেশী জোর দিয়েছেন, পরিবেশ ধ্বংসের উপর জোর দেননি। সাম্প্রতিককালে ভারতের পরিবেশ ইতিহাস সম্পর্কে বিখ্যাত বইটি হল রামচন্দ্র গুহ ও ডেভিড আর্নল্ড সম্পাদিত Nature, culture and imperialism গ্রন্থটি। বইটিতে অধ্যাপক নীলাদ্রি ভট্টাচার্য ও সাতলুরি মুরালি তাঁদের প্রবন্ধের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন সংস্কৃতি ও ট্র্যাডিশনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ পরিবর্তনকে বুঝতে হবে। মুরালি দেখিয়েছেন কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের চেতনা প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আদর্শগত বিভিন্নতার কথা বলা দরকার। বিভিন্ন গোষ্ঠী এইসব আন্দোলনের নেতৃত্বে দিচ্ছেন। এঁদের মধ্যে আছেন গান্ধীবাদী, মার্কসবাদী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা। গান্ধীবাদী আদর্শে পরিবেশ আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা হল সুন্দর লাল বহুগুণা। এঁরা পরিবেশ সংরক্ষণের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। মার্ক্সবাদী পরিবেশবিদরা প্রধানত ব্যবসায়িক বনসৃজন, অনিয়ন্ত্রিত খনি স্থাপন, ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষপাতী। প্রযুক্তিবিদরা অবশ্য চেষ্টা করেছেন কিভাবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তবে সবশেষে বলা যায়, যদিও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য আছে তবুও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার কথা, উপেক্ষা করা যায় না।

১.৪.১২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Keith Jenkins (ed) : The Postmodern History Reader.
2. Steven Best and Douglas Kellner : Post modern Theory : Critical Interrogations
3. Brain Fay, Phiip Pomper and Richard T.Vann(eds) : History and Theory ; Contemporary Readings.
4. Butterfield : Dictionary of the History of Ideas.
5. Collingwood : Idea of History.
6. John Whitlam : 'Karl Marx' in John Cannon, ed, Historian at Work.
7. Michel Lane (ed) ; Structuralism : A Reader.
8. Derk Attridge (ed) : Post- Structuralism and the Question of History.
9. Richard Macksey and Eugenio Donato (ed) : The Structuralist Controversy : The Languages of Criticism and the Sciences of Man.
10. Richard Grove : Green Imperialism, Colonial Expansion, tropical island Eens and The Origins of Environmentalism 1600-1800.
11. Alfred W. Crosby : Ecological Imperialism and the biological of Europe.
12. David Arnold and Ramchandra Guha (ed) : Nature, culture, Imperialism.
13. Gadgil and Guha (ed) : Ecology and Equityy, the Use and abuse of nature in contemporary India.

১.৪.১২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. How would you define Structuralism?
2. Analyse the main features of Ecological historiography.
3. Make an assessment of the contribution of Richard Grove to the development of ecological historiography.

প্রশ্ন

১। পরিবেশগত ইতিহাসচর্চার তত্ত্বগত বিভাজনগুলি কি কি?

২। পরিবেশ ইতিহাস চর্চায় রিচার্ড গ্রোভের অবদান আলোচনা করো।

৩। পরিবেশ চেতনার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করো।

৪। পরিবেশ ইতিহাস চর্চার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

পর্যায় গ্রন্থ—৫

একক-১৩

Economic, Labour and Peasant, Varna, Jati, Janajati and Gender

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৫.১৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

১.৫.১৩.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History)

১.৫.১৩.২ ঃ কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস (History of the peasants and workers)

১.৫.১৩.৩ ঃ সূচনা—শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা

১.৫.১৩.৪ ঃ শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা (Trend of Labour Histroiography)

১.৫.১৩.৫ ঃ উপসংহার (Conclusion)

১.৫.১৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Redings)

১.৫.১৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৫.১৩.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ভারতীয় অর্থনীতির ইতিহাসের সূচনাপর্ব

(২) ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে ভারতীয় ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও তাদের মধ্যে বিতর্ক

(৩) ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব এবং ব্রিটিশ শাসনে সম্পদের নির্গমণ

(৪) কৃষকদের নিয়ে ঐতিহাসিকদের ইতহিাসচর্চার সূচনাপর্ব এবং স্বাধীনতা -সংগ্রামে কৃষকদের ভূমিকা

(৫) শিল্প ও শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা ও প্রসার —স্বাধীনতার পূর্বে ও উত্তরপর্বে।

(৬) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান নিয়ে ইতিহাসচর্চা

(৭) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত

(৮) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা

(৯) শ্রমিক ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন

১.৫.১৩.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস (Economic History)

আঠারো শতকে শিক্ষার একটি বিষয় হিসাবে অর্থবিদ্যার (Economics) আবির্ভাব ইতিহাসেরও একটি নতুন শাখার উদ্বোধন ঘটায়। সেটি হল অর্থনৈতিক ইতিহাস। অর্থবিদ্যার জগতের আদিপুরুষরা হলেন এ্যাজাম স্মিথ ও অন্যান্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা। শিল্পবিপ্লবের সময়ে ইংলণ্ডের একদল চিন্তাবিদ ও ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের কাছে ভারতও একটি আগ্রহের বিষয় ছিল। তাঁরা 'লেসে ফেয়ার' (অবাধ বাণিজ্য) নীতির প্রবক্তা ছিলেন এবং দেশের অর্থনীতিতে যতটা কম সম্ভব রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ-এর পক্ষপাতী ছিলেন। অগ্রগণ্য ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ভারতের শাসক হিসাবে ইসচ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন ভূমিকার নিন্দা করেন। তিনি কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমালোচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জে. এম. কেইনসের প্রভাবে অর্থবিদ্যার জগতে তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি জনকল্যাণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারের কৌশলগত হস্তক্ষেপের কথা বলেন। কেইনস্ ভারতের কথাও গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। এর প্রমাণ হল তাঁর 'Indian Currency and Finance' গ্রন্থখানি। সর্বোপরি, ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের চার্টার আইন দুটির মাধ্যমে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এ্যাডাম্ স্মিথের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় সংস্কারের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় ছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই ধারণার প্রকাশ ঘটেছিল কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে। যেমন Eric Stokes এর 'The English Utilitarians and India' : S Ambirajan এর 'Classical Political Economy and British Policy in India'. এবং A Chandravarkar-এর ''Keynes and India : a study in Economics and Biography''. বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থবিদ্যায় অগ্রগতির বীজ কেনসীর অর্থনীতি বপন করেছিল। অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধ্রুপদী রাজনৈতিক অর্থনীতি উনিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবাধ বাণিজ্য অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল এবং এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

প্রথম দিকের ঔপনিবেশিক লেখকরা স্বাচ্ছন্দের সঙ্গেই দেশীয় অর্থনীতির উপর ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন এবং তাঁরা ভারত থেকে ইংলণ্ডে সম্পদ নির্গমনেরও নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা *The Seir Mutaqherin* (1789) এর লেখক সৈয়দ গোলাম হুসেন খান্ এর বক্তব্যকেও অস্বীকার করেন নি। গোলাম হুসেন বলেছিলেন, এদেশে ইংরেজদের যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল 'scraping together as much money as they can and carrying in immense sums to the kingdom of England'.এছাড়া 'Historical Review of the Extemal Commerce of Calcutta from 1750 until 1830' শীর্ষক সরকারী রিপোর্টে এদেশে সম্পদ লুণ্ঠনের কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা হয়েছেল।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যখন সমালোচনায় ভারতীয় মতামত প্রকাশ পেতে থাকে, তখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন দেখানো চেষ্টা করে যে ভারতে কী রকম অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। মাদ্রাজ প্রশাসনের তরফ থেকে প্রকাশিত *'Memorandum on the progress of Madras Presidency during the last forty years of the British Administration'* গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় শতকে একদিকে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক (apologist) ও অন্যদিকে সমালোচক (critic) দের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়বাদীরা, ভারতের পক্ষে সহানুভূতিশীল ইংরেজরা এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত থেকে সম্পদের নির্গমণ এবং ভারতকে দরিদ্র করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর দোষারোপ করেন। অন্যদিকে লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ঔপনিবেশিক অফিসাররা দেখানো চেষ্টা করে যে ভারতকে কোনভাবেই সম্পদশূন্য করা হয়নি এবং তাঁরা দুপক্ষেরই জাতীয় আয়ের হিসাব দাখিল করেন। ভারতীয়দের পক্ষে এইসময়কার দুটি বিখ্যাত বই হল —দাদাভাই নওরোজীর লেখা *'Poverty and Un- British Rule in India :* এবং উইলিয়াম জিগ্‌বি-র লেখা *"Prosperous" Brotish India : a Revelation from the Official Records.* অন্যদিকে বৃটিশ পক্ষের বিখ্যাত প্রবন্ধ হল F.T. Atkinson-এর লেখা *'A Statistical Review of the Income ans Wealth of British India :* লেখাটি Journal of the Royal Statistical Society তে প্রকাশিত হয়েছিল। Atkinson ছিলেন বড়লাট লর্ড কার্জনের অধীনে একজন অফিসার। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে ধীরে হলেও ভারতে জাতীয় আয় কীভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্যদিকে দাদাভাই নওরোজী বিপরীত বক্তব্য রাখেন। তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন ভারত থেকে সম্পদ নির্গমণের পরিমাণ ১৮০০ সালে যেখানে ছিল ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড সেখানে তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে হয়ে দাঁড়া. ৩০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

আঠারো শতকে শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে অর্থনৈতিক ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবাধ বাণিজ্য নীতি নিয়ে একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থক ও অন্যদিকে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা, ভারতের পক্ষে সহানুভূতিশীল ইংরেজরা এবং মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ভারত থেকে সম্পদের নির্গমণ এবং ভারতকে দরিদ্র করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দোষারোপ করেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক অফিসাররা দেখান যে ভারতে কোনভাবেই সম্পদশূন্য করা হয়নি।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় পক্ষের লেখকদের এই বির্তকের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রমেশ চন্দ্র দত্তর লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। বই দুটি হল— *'The Economic History of India under Early British Rule (1757-1837)'* এবং *'The Economic History of India under the Victorian Age'.* তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক কুফলের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি যে বিষয়গুলির উপর জোর দেন সেগুলি হল—চাষীদের উপর অত্যধিক জমির যোজনা, কুটির শিল্পের ধ্বংস, বারংবার দুর্ভিক্ষ এবং ভারত থেকে বাৎসরিক সম্পদ নির্গমণ। তিনি লিখেছেন, 'The British had given India peace, but nit properity'. তবে ঔপনিবেশিক প্রশাসন দত্ত-র এই জাতীয়তাবাদী বক্তব্য মেনে নেয়নি।

তাঁর ব্রিটিশ ধ্বংসাত্মক অর্থনীতির সমালোচনা পরবর্তীকালে R.P. Dutt প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করেন। ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য R.P Dutta ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা করে India Today গ্রন্থটি রচনা করেন। বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশ হয়েছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতে এই বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তিনি ভারতে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাম্রজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

ভারতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব ও ব্রিটিশ শাসনে ভারতেতর সম্পদশূন্যতদা সম্পর্কে এই বিতর্ক শিক্ষিত মহলে একটি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছিল। সেটি হল—ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? তখন কী ভারত অনেক বেশী সম্পদশালী ছিল? জাতীয় আয় কী তখন বেশী ছিল? ঔপনিবেশিক

শাসনের প্রথম দিকে দেশীয় অর্থনীতির গঠন সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব দক্ষিণ ভারত স্পকর্কে ফ্রান্সিস বুকানন হ্যমিল্টনের বই উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষি, শিল্প ও আভ্যন্তিরীণ বাণিজ্যের উপর বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বই দুটি হল—A Journey from Madras through the Countriesof Mysore, Canara and Malabar এবং An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-1812 পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন।

প্রকাশিত হয় Edward Thomas এর *'The Revenue Resources of the Mughal Empire in India'* এবং যদুনাথ সরকারের *'India of Aurangzed : Topography, Statistics and Roads'*-প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের ভারতের সাধারণ অর্থনৈতিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন W,H..Moreland তাঁর বইগুলি হল ঃ *India at the Death of Akbar, From Akbar to Aurangzeb* এবং *Agrarian System of Moslem India.*মোরল্যাণ্ড হিসাব করে দেখিয়েছেন যে টোডরমলের সার্ভে অনুযায়ী ভারতের জাতীয় আয় বিংশ শতাব্দীর শুরুর তুলনায় আকবরের আমলে বেশি ছিল না। মোরল্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত হল 'a parasitic agrarian despotism had driven India to an economic dead end, despite the considerable, expansion of foreign trade that the Dutch and English East India Companies brought about in the seventeenth century". তিনি আরও বলেছেন যে মুঘল যুগে বিদেশী বণিকরা যথেষ্ট রুপো এনেছিলেন এবং বস্ত্র রপ্তানিকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় K.N.Chaudhuri র লেখা *'The Trading World of Asia and the English East India Company 1660-1760'* গ্রন্থে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মুঘল যুগের ধনতন্ত্র সম্পর্কে যে বিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন তা হল ঃ *'The Potentialities of Capitalist Devolopment in the Economy of Mughal India'.* অধ্যাপক রজত কান্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "Habib demonstrated the sophistication of the Mughal urban economy, but like Moreland he emphasized its parasitic relationship with the heavily taxed rural economy".

ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনীতি সম্পর্কে R.C. Dutt এর পর অনেক বই প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল ঃ D.R. Gadgil এর *The Industrial Evolution of India in Recent Times;* Vera Anstey র *The Economic Development of India* এবং D.H. Buchanan এর *Development of Capitalist Enterprise in India.* সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত *The Cambridge Economic History of India Vol.1 1200-1750* এবং ধর্মা কুমার সম্পাদিত *The Cambridge Economic History of India vol. 2 1757-1970.* বই দুটি খুবই উল্লেখযোগ্য। Daniel Houston Buchanan নামে একজন আমেরিকান লেখকের মতে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কেটি প্রধান বাধা হল জাতিভেদ প্রথা। অন্য দিকে অধ্যাপক গ্যাডগিল এরজন্য অর্থনৈতিক কারণের কথা বলেছেন। সেগুলি হল—'The difficulties of capitilist mobilisation on accouny of the absolute smallness of capital resources in respect to the size of the population, the late development of organized banking, and the seasonal fluctuations of a monsoon economy". একজন নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ হিসাবে তিনি ভারতে শিল্পবিন্যাসের অনুপস্থিতির জন্য ভারতীয় সামাজিক কাঠামো বা বিদেশী শাসনের উপর দোষারোপ করেননি। পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা এরজন্য ভারতীয় অর্থনীতির 'technological backwardness' কে দায়ী করেছেন।

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতি হিসাবে এক বিপুল পরিমাণ বাৎসরিক সরকারী পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা ওই সব পরিসংখ্যানের সাহায্যে জাতীয় আয়, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন প্রভৃতির সুদূরপ্রসারী গতিধারা বিশ্লেষণ করেছেন। এই ধরনের গবেষণা সংক্রান্ত দুটি বই-এর কথা উল্লেখ করা যায়। একটির লেখক George Blyn. এর বই এর নাম হল *'Agricultural Trends in India 1891-1947 ; Output, Availability and Productivity'*. অন্যটির লেখক S. Sivasubramonian এর বইটির নাম হল—*The National Income of India in the Twentieth Century. Byln* ১৯২০ সালের পর ভারতের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিকূল গতির সন্ধান পেয়েছেন। প্রধানতঃ বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত Greater Bengal' এরপ ক্ষেত্রে এটি প্রযুক্ত ছিল। উপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে জনপ্রতি খাদ্যের পরিমাণ কমতে থাকে। S. Sivasubramonian দেখিয়েছেন যে ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতের জাতীয় আয় অত্যন্ত ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রধান কারণ হল কৃষিক্ষেত্রের অনগ্রসরতা। অন্যদিকে শিল্পে উন্নতি ঘটে। তাঁর মতে এই পর্বে কোন 'de-industrialisation' ঘটেনি।

উনিশ শতকের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব আছে। সেজন্য এই শতকে অবশিল্পায়ন নিয়ে বিতর্কও আছে। যেহেতু এই শতকে যথেষ্ট পরিমাণ শিল্প উৎপাদন হয়নি, সেজন্য এই শতকে প্রকৃতই কুটির শিল্প ধ্বংস হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ১৯৬০ এর দশকে এ সম্পর্কে বিখ্যাত বির্তকের সৃষ্টি করেছেন মরিস ডেভিড মরিস। অর্থশিল্পায়নের পক্ষে ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতের তাঁতীরা ব্রিটেন থেকে আনা কম দামী সুতোর দ্বারা লাভবান হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু কোন পক্ষই যথেষ্ট পরিসংখ্যান উপস্থাপিত করতে পারেননি সেজন্য এই বিতর্কটি 'আলোর পরিবর্তে যথেষ্ট তাপ' উৎপন্ন করেছে মাত্র। অন্যদিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমিয় কুমার বাগচীর একটি প্রবন্ধকে নিয়ে বির্তকের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধটির শিরোনাম হল 'Deindustrialisation in Gangetic Bihar 1809-1901' বুকানন হ্যামিলটনের লেখা থেকে তিনি যথেষ্ট পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন উনিশ শতকে কুটির শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। অধ্যাপক বাগচীর বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন Marika Vieziany. তিনি বাগচীর বুকানন হ্যামিলটন থেকে নেওয়া পরিসংখ্যানগত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। Marika-এর বক্তব্য প্রকাশিত হয় The Indian Economic and Social History Review পত্রিকায়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম হল ঃ 'The Deindustrialisation of India in Nineteenth Century : A Methodlogical Critique of Amiya Kumar Bagchi'. এইপ্রবন্ধটির সঙ্গে অধ্যাপক বাগচীর 'A Reply' টিও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে একই পত্রিকায় J . Krishnamurty অধ্যাপক বাগচীর সমর্থন করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। শিরোনাম হল ঃ 'De-industrialisation in Gangetic Bihar during the nineteenth century : Another Look at the Evidence'. কিন্তু সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক তীর্থঙ্কর রায় তাঁর Traditional Industry in the Economy of Colonial India' (১৯৯৯) গ্রন্থে অধ্যাপক বাগচীর মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে উনিশ

উনিশ শতকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা অন্যতম বিষয় ছিল অবশিল্পায়ন বিতর্ক। এই বিতর্কের ক্ষেত্রেও আমরা দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। একটা শ্রেণী দেখতে চেয়েছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফলে ভা রতীয় শিল্পেকতটা সমস্যা ঘটেছিল অন্যদিকে আর একটি শ্রেণী বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের ফলে শিল্পে ক্ষতি হয়নি এবং উন্নতি ঘটেছিল।

শতকে অবক্ষয় ঘটেনি। আঠারো শতক সম্পর্কে বাংলাদেশী গবেষক হামিদা হোসেনের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিয়েছেন এই শতকে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি কাপড়ের রপ্তানির ক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার ফলে তাঁতীদের উপর অবর্ণনীয় নিষ্পেষণ চলে। তাঁর বই এর নাম হল ঃ *The Company Weavers of Bengal : The East India Company and the Organisation of Textile production in Bengal 1750-1813.*

উনিশ শতকের প্রথম দিকের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বইটি লিখেছেন অধ্যাপক ব্লেয়ার ক্লিং (Blair B. Kling) বইটির নাম হল ঃ *Partnership in Empire: Dwarknath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India.* আসিয়া সিদ্দিকের লেখা *'The Business World of Jamestjee Jeyeebhoy'* প্রবন্ধটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক বন্দর নগরগুলিতে ব্যক্তিগত ইউরোপীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগ সম্পর্কে লিখেছেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833* গ্রন্থে। পরবর্তীকালের managing agency house গুলির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন রাধেশ্যাম রুংতা, তাঁর *The Rise of Business Corporations in India 1851-1900.*গ্রন্থে। কিন্তু ঔপনিবেশিক নগরগুলিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও জামসেদজী জিজিভয় তার পদ্ধতি অনুসৃত ভারতীয় ব্যবসা পিছিয়ে পড়তে থাকে যখন ইউরোপীয় পুঁজি ধীরে ধীরে একচেটিয়া কর্তৃত্ব বিস্তার করে। কিন্তু C.A.Bayly কিছুটা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর বিখ্যাত *Rulers, Townsmen and Bazaars : North Indian Society in the Age of British Expansion 1770-1870.* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে সমঝোতা করে আভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতে ভালই ব্যবসা-বাণিজ্য করেছিল।

ভারতীয় অর্থনীতির উপর ঔপনিবেশিক প্রভাব সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকের লেখা প্রকাশিত হয়েছে K.N.Chaudhuri and C.J.Dewey সম্পাদিত *Economy and Society* গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে C.J. Dewey and A.G. Hopkins সম্পাদিত *The Imperial Impact : studies in the Economic History of India and Africa* গ্রন্থে। এই সমস্ত প্রবন্ধগুলিতে বাজার, শিল্পনীতি ও কৃষিসমাজ সম্পর্কে অনেক নতুন সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়েছে। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থ হল অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এর তিন খণ্ডে লেখা *The Economic History of Bengal* এবং C.J Baker এর লেখা *An Indian Rural Economy : The Tamil Nadu countryside 1880-1950.*

ডঃ রজত রায় মনে করেন সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যে সবচেয়ে বেশী ব্রিটিশ পুঁজির বিনিয়োগ ঘটেছিল 'railways and canals'-এ। কিন্তু তাঁর মত হল এই বিনিয়োগের ফলে উনিশ শতকে জার্মানী, রাশিয়া ও জাপানের মত ভারতে শিল্পের অগ্রগতি ঘটেনি তাছাড়া এর ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলে দুর্বিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন Daniel Thorner, তাঁর *Investment in Empire* গ্রন্থে এবং 'Great British and the Economic Development of India's Railways' নামক প্রবন্ধে। দুর্ভিক্ষ নিয়ে আলোচনা করেছেন Elizabeth Whitecomb এবং অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। Whitecomb এর বই এর নাম হল ঃ *Agrarian conditions in Northern Indi: the United Provinces under BritishRule 1660-1900.* নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর *Poverty and Faminers : an Essay on Entilement and Deprivation* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে "famines could because of adverse movements in prices and wages even when the food stocks were available."

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কিছু শিল্পায়ন ঘটলেও কোন শিল্পবিপ্লব ঘটেনি। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ এর আগে বৃহদায়তন শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও ভারতীয় অর্থনীতিতে বিরাট কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। কোনও 'take off' কেন হল না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিয় কুমার বাগচী তাঁর *Private Investment in India 1900-1939* গ্রন্থে এবং অধ্যাপক রজত কান্ত রায় তাঁর *Industrialisation in India : Growth and Conflict in the Private Corporate Sector. 1914-1947* গ্রন্থে যুক্তি দেখিয়েছেন যে ঔপনিবেশিক নীতিই এজন্য দায়ী ছিল। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক মরিস ডি মরিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় কারিগরী অনগ্রসরতা বৃহদায়তন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ঐতিহাসিক B.R. Tomlinson মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকারী নীতির জন্য ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। ডঃ রজত কান্ত রায় মন্তব্য করেছেন, "By then, there was a large Indian capitalist class locked in a struggle with European capital in India". এই অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও অস্থিরতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন Claude Markovitz. তাঁর *Indian Business and Nationalist Politics 1931-1939* গ্রন্থে।

বলা যেতে পারে যখন থেকে দাদাভাই নওরোজী, আর, সি. দত্ত. উইলিয়াম ডিগ্‌বী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা সরকারের অর্থনৈতিক নীতির কঠোর সমালোচনা করে লিখতে শুরু করেন, তখন থেকেই সম্ভবত প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছিল। D.R. Gadgil, Vera Anstey এবং D.H.Buchanan এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঔপনিবেশিক যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন। যদুনাথ সরকার ও মোরল্যাণ্ড মুঘল অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

প্রশ্ন

১। তুমি কি মনে কর ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল?

২। অবশিল্পায়ন বিতর্ক কি?

১.৫.১৩.২ ঃ কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস (History of the Peasants and Workers)

বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিকদের ভূমিকা ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সমাজে শ্রেণী সম্পর্কের কথা এসে পড়ে। বিশেষ করে কৃষক-জমিদার সম্পর্ক এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্ক। এর আগের ইতিহাস চর্চায় শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু 'র‍্যাডিকাল' গতিধারা অন্যরকম। ডঃ রজত রায় লিখেছেন, 'The aim of radical historiography, however, was to treat the peasants and workers as historical subjects in their own right". বোঝা গেল যে, কৃষক ও শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে হলে তাদের সঙ্গে উচ্চতর শ্রেণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। এই উপলব্ধির পর নতুন শ্রমিক ঐতিহাসিকরা শ্রমিক ও পুঁজি এই দুই বিষয়বস্তুকে নিয়ে একই আলোচনার উপর গুরুত্ব দিতে

থাকেন। একইভাবে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, ইতিহাস রচনা করতে হলে সামগ্রিকভাবে কৃষিসমাজের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই তা করতে হবে। কৃষক ও শ্রমিকদের সম্পর্কে বামপন্থী ইতিহাসচর্চা প্রধানতঃ স্বাধীনতা লাভের পরে শুরু হয়েছে। প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে দুজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর নাম করা যেতে পারে। একজন হলেন ডঃ এ. আর. দেশাই। আর অন্যজন ডঃ সুনীলকুমার সেন। ডঃ দেশাই এর বইটির নাম হল *Peasant Struggeles in India* (১৯৭৯)। ডঃ সেনের বই দুখানির নাম হল ঃ *Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47* এবং *Working Class Movements in India 1885-1975.* আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল মার্কসবাদী ব্যাখ্যায় রচিত সুকোমল সেনের *Working Class of India : History of Emergence and Movement 1830-1970.*

তবে এটা ভাবলে ভুল করা হবে যে কৃষক ও শ্রমিকদের বিষয়টি একেবারেই নতুন ভাবনা। এটাও ঠিক নয় যে,সমাজতন্ত্রের উত্থানের আগে এই বিষয় দুটি নিয়ে কোন আগ্রহ ছিল না। অনেক আগেই ১৮৭৪ সালে গরীবদের অবস্থা সম্পর্কে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র ইংরাজীতে লেখা দুখণ্ডের উপন্যাস *Govinda Samanta* প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির নতুন নাম হল *Bengal Peasant Life.* বইটিতে উনিশ শতকে বাংলার কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া ১৮৭৪ সালে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারক শশীপদ ব্যানার্জীর সম্পাদনায় প্রকাশিত বিখ্যাত পত্রিকা '**ভারত শ্রমজীবী**'-র কথা অবশ্যই উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকাতেও শ্রমিকদের সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

ইচ্ছা করলে আঠারো শতকেও ফিরে যাওয়া যায়। সে সময় ইংরাজী ও পার্সী ভাষায় কৃষি ও কৃষকদের সম্পর্কে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রবীণ কর্মচারী এইচ.টি. কোলব্রুক লিখেছিলেন, *Remarks on the Husbandry and Internal Commerce of Bengal in 1794.* বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮০৪ সালে। সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকরা একটি পার্সিয়ান পাণ্ডুলিপির খোঁজ পেয়েছেন। বইটির লেখক শেষ মুঘল পর্বের একজন বাঙালী। বইটির নাম Risala-i Zirat (Treaties on Agriculture) । বইটি লেখা হয়েছিল ১৭৮৫ সালে। বইটিতে চাষীদের চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ভূমি রাজস্বের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন চাষীদের সম্পর্কে আগ্রহান্বিত ছিল এবং তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না কারণ তারা কোন জমির খাজনা দিত না।

B.H. Baden Powell তাঁর *Manual of Land Revenue system and Land Tenures of India* (১৮৮২) বইতে চাষী ও জমিদারদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। বইটির পরবর্তী কালে *Land Systems of British India* নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়। W.H. Moreland নামে আর একজন ব্রিটিশ অফিসার দুখানি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। বই দুটির নাম হল ঃ *Notes on the Agricultural Conditions and problems of the United Provinces, Revised upto 1911* এবং *Agrarian System of Moslem India.*

ব্যাডেন পাওয়েল এবং মোরল্যাণ্ডের রচনা থেকে বোঝা যায় যে শুধু ঔপনিবেশিক পর্বেই নয়, প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগেও রাষ্ট্র ও জমিদার কৃষকদের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করত। চাষীদের ঋণগ্রস্ততা সম্পর্কে Malcom Darling এর লেখা *The Punjab peasant in Prosperity and Debt* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক

প্রশাসনও সরকারী উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও বই প্রকাশ করেছেন। William Honey-এর লেখা *A Monograph on Trade and Manufactures in Northern India* গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বৃহদায়তন-শিল্পের উত্থানের ফলে দুটি নতুন 'সামাজিক শক্তি' আত্মপ্রকাশ করে—শ্রমিক এবং পুঁজি। ঔনিবেশিক যুগে এ সম্পর্কে বিখ্যাত বইগুলি হল ঃ S.M. Rutnagar এর লেখা *Bombay Industries : The Cotton Mills* এবং D.H. Buchanan-এর লেখা *The Development of Capitalist in India.* এটা বোঝা যায় যে ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে কৃষকদের পাশাপাশি শ্রমিকরা ও দেশের অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল।

বামপন্থী বুদ্ধিজীবি ও ঐতিহাসিকরা কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস চর্চায় নতুন 'কাঠামো' উপস্থাপিত করেন। তাঁরা শ্রমজীবী শ্রেণীকে শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং ভারতীয় সমাজে তাদের প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি বলে মনে করেন। যেহেতু ভারতের এক বিপুল জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভরশীল,সেজন্য বামপন্থী ঐতিহাসিকরা কৃষক সমাজের উপর গুরুত্ব দিতে থাকেন। ঔপনিবেশিক যুগে কৃষি সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁরা নতুন 'কাঠামো' তৈরি করেন। স্বাধীনতা লাভের পরই ১৯৫২ সালে প্রকাশিত S.J. Patel-এর লেখা *Agricultural Workers in Modern India and Pakistan* গ্রন্থটিকে এই 'কাঠামো' রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল ঃ রামকৃষ্ণ মুখার্জির The Dynamics of a Rural Society (১৯৫৭)। এঁদের বক্তব্য অনুযায়ী উপনিবেশিক যুগে কৃষিসমাজে কতগুলি বাজারের সৃষ্টি, চাষীদের ঋণগস্ততা, চাষীদের অবলুপ্তি, ভূমিহীন কৃষকদের উদ্ভব এবং স্বনির্ভর চাষীদের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভাঙন ইত্যাদি।

পরবর্তীকালের গবেষণায় দেখা যায় এই সব ধারণার অনেকগুলিই তথ্যসম্মত নয়। সংশোধন শুরু হয় ধর্ম কুমারের *Land and Caste in South India. Agricultural Labour in Madras Presidency during the Nineteeth Century (1965)* গ্রন্থটির মাধ্যমে। প্রচুর তথ্য উপস্থাপিত করে তিনি দেখালেন যে "Pre-colonial and early colonial already Possessed a vast agraian under-class of bonded labourers who traditionally belonged to the untouchable castes." রজত ও রত্না রায় দেখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে একদল ধনী চাষী তাদের জমি চাষ করাতো ভাগচাষী ও 'bonded labourer' দের মাধ্যমে।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের ধনী ও গরীব চাষীর মধ্যে বিভাজনের তত্ত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। Eric Stokes বললেন, "there was no agrarian polarisation," এই জটিল প্রশ্নটিকে ঘিরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। নীল চার্লসওয়ার্থ দেখালেন যে ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যকরণের ফলে অনেক চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে ডঃ সুগত বসুর সিদ্ধান্ত হল যে ''Rich farmers were to be seen only among reclaimers of land in a few frontier areas.'' সম্প্রতি Nariaki Nukazato অধ্যাপক বিনয়ভুষণ চৌধুরীর বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক চৌধুরীর মতে, ''The growing number of share -croppers among the peasants indicated an incipient process of depeasantisation even while outwardly the small-holding system appeared to be intact''. অনেক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রেণীই একমাত্র নির্ণায়ক ছিল না। M.C Pradhan, David Polock এবং Stephen F.

Dale দেখিয়েছেন যে "caste and community were capable of producing important rural solidarities among members setting them apart from other peasants."

ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড গ্রামীণ মানুষদের জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার যে বিষয়সূচী তৈরী করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে আলিগড়ের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা সেই পথ অনুসরণ করেন। তাঁরা প্রাক-ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের কৃষিজীবন ও রাষ্ট্রীয় গঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৯৬০ এর দশকে আলিগড়ের বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব দেখিয়েছিলেন "The overwhelming presence of the Mughal state in the life of the heavily taxed peasantry." তিনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহের বর্ণনা দেন। জাপানী ঐতিহাসিক Hisorhi Fukazawa একদিকে রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে গ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মার্কিন ঐতিহাসিক স্টেইন বলেছেন যে "The state, rooted in the life of the peasant community, had a weaker and more segemented character ". আর একজন মার্কিন ঐতিহাসিক David Ludden দক্ষিণ ভারতের তিরুনেলভেলী জেলায় স্থানীয় শাসক ও গ্রামবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর ফলে কৃষকদের ইতিহাস মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের কৃষক আন্দোলননের স্তর অতিক্রম করে এক বিস্তৃততর আঙ্গিকে প্রবেশ

এভাবে একদল অ-মার্কসবাদী ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এঁরা কৃষক বিদ্রোহ আলোচনায় 'sophisticated new variety' নিয়ে আসেন। এই ঐতিহাসিকদের পথপ্রদর্শক হলেন Eric stokes তিনি কৃষকদের অবস্থা ও কৃষকআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে জাতি, বাজার , ট্যাক্সের চাপ, এবং তরাওঅন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলি একত্রে সংকলিত করে একটি বই আকারে প্রকাশিথ হয়েছে। বইটির নাম *The Peasant and the Raj : Studies in Agrarian Society snd Peasant Rebellion in Colonial India (1978).* বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ D.N Dhanagare এর লেখা Peasant Movements in India (1983) বইটিতেও প্রচলিত মার্কসবাদী বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন, "Peasant actions were typically circumscribed by the locality, based in caste of communal ties."

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের পুরানো বামপন্থী ইতিহাসে ভারতীয় শ্রমিকদের সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইউরোপীয় শ্রমিকদের কোন পার্থক্য দেখানো হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকরা শ্রমিকদের বিপ্লবী ক্ষমতা ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অভাব লক্ষ্য করেছেন। নতুন শ্রমিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন শিল্প শ্রমিকদের মানসকিতা ও চেতনা গরীব ঠিকা শ্রমিকদের থেকে আলাদা ছিল না। এই ধরনের সংশোধিত শ্রমিক ইতিহাসের অন্যতম প্রবক্তা হলেন মরিস ডি মরিস, আর .কে. নিউম্যান, সুজাতা প্যাটেল প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মরিস ডি মরিস-এর বইটির নাম হল ঃ *The Emergence of an Indutrial Labour Force in India : A stdy of the Bombay Cotton Mills 1845-1947.* নিউম্যান-এর বই এর নাম হল ঃ Workers and Unions in Bombsy 1919-29: A study of Organisation in the Cotton Mills. সুজাতা প্যাটের এর বই-এর নাম হল ঃ *The Making of Industrial Relations,* The Ahmedabad Textile Industry 1918-1939. অধ্যাপক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর *Rethinking Working Class History: Bengal 1890-1940* গ্রন্থে নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পাটকল শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী মনে করেন, "The hierarchical precapitalist

culture of the workers made them prone to communal violence and inclined them to dependence on the 'Sardars' who recruited them". রাজনারায়ন চন্দ্রভারকরও দেখিয়েছেন যে শ্রমিকরা স্থানীয় দাদাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা সম্প্রদায়গত ভাবে সংঘবদ্ধ ছিল। Sir Henry Maine এবং Kapil Khmar শ্রমিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভারতীয় সমাজকে 'status snd community'-র ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন। ডঃ রজত রায় মন্তব্য করেছেন, "The long term effect of colonial rule was to bring the classes into play in a new national area."

প্রশ্ন

১। কোন সময় থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী স্থান পেয়েছে?
২। শ্রমিক ও কৃষকদের ইতিহাসটা কিভাবে ভারতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে?

১.৫.১৩.৩ ঃ সূচনা—শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা

একটি নতুন আর্থ-সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শিল্পে নিযুক্ত বেতনভোগী শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ভারতবর্ষে উনিশ, শতকের শেষপাদে হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণী, তাদের অবস্থা ও আন্দোলন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের আগ্রহ এরপর আস্তে আস্তে দেখা যায়। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। অথচ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে ইতিহাসচর্চা জোরকদমে চলেছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই ইতিহাসচর্চা থেমে থাকেনি। বরং ভারতে বিশ শতকের শেষ দু-তিন দশকের কথা বাদ দিলে এই ইতিহাসচর্চার গতি ছিল বেশ মন্থর। কিন্তু বিগত দু-দশকে এই ক্ষেত্রে বহু গবেষণা হয়েছে, গ্রন্থ বেরিয়েছে, প্রবন্ধ সংকলন হয়েছে, ইংরেজী ভাষায় রচিত আন্তর্জাতিক মানের পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের একাডেমিক পত্রিকায়, এমনকি লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাতেও বহু মূল্যবান নিবন্ধ, স্মৃতিচারণ ছড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন শুধু ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছেই একটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু নয়, এমনকী সাধারণ মানুষ ও অন্যন্য বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছেও এ বিষয়টি একিট পরিচিত বিষয় শুধু নয়, যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহও সৃষ্টি করেছে সকলের মধ্যে।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই শ্রমিক ইতিহাসচর্চা জোর কদমে চললেও ভারতীয় শ্রমিক নিয়ে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছিল মাত্র গত শতাব্দীতে। বিগত দু দশকে এই শ্রমিক ইতিহাস চর্চা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে প্রবন্ধ এমনকি ম্যাগাজিনেও স্থান পেয়েছে। তাই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন শুধু ইতিহাসের ছাত্র ও গবেষকদের কাছেই পরিচিত বিষয়বস্তু নয়। এমনকি সাধারণ মানুষও অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতদের কাছেও বিষয়টি যথেষ্ট কৌতূহল ও উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে বাংলা, বিহার, বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই), আমেদাবাদ, কানপুর দক্ষিণ ভারতের প্রধান শরহগুলিতে নতুন নতুন কলকারখানা, পাটশিল্প, সূতীবস্ত্রশিল্প, কয়লাখনি, বাগিচা. রেল ও ট্রামের মত আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা চালু হবার পর শিল্প শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। পূর্বতন কারিগর শ্রেণী, বা হস্তশিল্প, কুটীর শিল্প ও অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের শ্রমজীবি মানুষের সঙ্গে এই আধুনিক শিল্পের মজুরিভোগী শ্রমিকদের পার্থক্য ছিল এবং তা এখন নানা লেখায় পরিষ্কার। প্রধানতঃ বিদেশি পুঁজির লগ্নিতেই ভারতরে শিল্পায়নের

সূত্রপাত, যদিও কিছু পরেই দেশীয় পুঁজিপতিদেরও আবির্ভাব। যে যুগে দেশের মানুষ বিদেশি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, সেই সময়েই শ্রমিককে লড়তে হয়েছে যুগপৎ বিদেশি সরকার ও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে। ভারতে শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, মালিক -শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠল। নতুন সামাজিক শ্রেণী হিসাবে তাদের জন্মের পর ঔপনিবেশিক যুগেই তাদের নিয়ে নানা স্তিাভাবনা ও সেই চিন্তাভাবনারফসল হিসাবে ইতিহাস রচনা শুরু হল।

প্রশ্ন

১। ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে ইতিহাসচর্চার সূচনা কখন থেকে শুরু হয়?

২। কিসের ভিত্তিতে ভারতে শিল্পায়নের সূত্রপাত ঘটে?

১.৫.১৩.৪ ঃ শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা (Trend of Labour Historiography)

তবে ঔপনিবেশিক যুগে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা শৈশব অবস্থায় ছিল বলা যেতে পারে। আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও 'তলা থেকে ইতিহাস' (History from below) রচনার সম্ভাবনাগুলি একেবারেই খতিয়ে দেখা হয়নি। বরং সে সময়কার ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' মনোভাবাপন্ন। এ ধরনের ইতিহাসে কায়িকশ্রমে নিযুক্ত সাধারণ শ্রমিকের প্রকৃত চিত্র ধরা পড়েনি।

একথা সত্যি যে, ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের 'নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চা' বা 'নিপীড়িতদের ইতিহাসচর্চা' হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ধারা ভারতবর্ষ ও তৃতীয় বিশ্বের দরজায় প্রবেশ করার ফলেই এদেশে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। এই দেশের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার তাই হিলটন, হিল, এ.এল .মর্টন, ই. পি.টমসন. হবস্‌বম, গ্রামশ্চি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী। তাঁরা শুধু নিম্নবর্গ তথা শ্রমিক শ্রেণীর ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিতই করেননি, উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। এইসঙ্গে সামাজিক অচ্ছুৎদের ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন আছে তা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এরই সূত্র ধরে ১৯২০ এর দশক থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ভারতে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত হয়েছে ধরা যেতে পারে। যদিও ভারত ইতিহাসের মূল ধারার সঙ্গে দীর্ঘকাল তা আদৌ অন্তর্ভূক্ত ছিল না। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শ্রমিকদের একটি আলাদা অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করে মূলতঃ তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, কাজের পরিবেশ, খাদ্য , বাসস্থান ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও ইতিহাস লেখার কাজ শুরু হয়। ইতিহাসচর্চার এই ধারায় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিকগণ হলেন— রজনীকান্ত দাস (১৯২৩), কেলম্যান (১৯২৩), ব্রাউটন (১৯২৪), চমনলাল (১৯৩২), বি.শিবারাও (১৯৩৯), আর.কে মুখার্জী (১৯৫১), কে.পি.চট্টোপাধ্যায় (১৯৫২) ইত্যাদি। যেহেতু বাংলা ও বোম্বাই ছিল তদনীন্তন কালে শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলির একেবারে উপরে তাই সর্বভারতীয় আলোচনাতে এই দুই অঞ্চলের শ্রমিকদের নানা কথা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলন নিয়েও ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত সেই বিশের দশক থেকেই। কারণ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সংক্ষেপে AITUC গড়ে উঠেছে। এর পূর্বে মাদ্রাজে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে Textile Labour Union গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কলকারখানা, চটকল, বস্ত্রকল ও আরও নানা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন একের পর এক

গড়ে উঠতে লাগল। বামপন্থী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠল । কম্যুনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও অনেকে শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে এগিয়ে এলেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২০ পর পরবর্তী প্রায় ৫০ বছর ধরে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারা এগিয়ে চলল। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কালানুক্রমিক ধারায় প্রধান প্রধান ধর্মঘটের কথা ও আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির কার্যকলাপ ও দাবি দাওয়ার কথা নিয়ে ঐতিহাসিক কর্ণিক (১৯৬৭), রজনীকান্ত দাস (১৯২৩) ও আরও কেউ কেউ ইতিহাস লিখলেন। শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা ও আন্দোলনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন মার্কসবাদ ঐতিহাসিকেরা। এর পথিকৃত নিঃসেন্দেহে রজনী পাম দত্ত (ইণ্ডিয়াটুডে,১৯৪০)। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী লেখকরা এই ধারা তো বজায় রাখলেনই, সেইসঙ্গে এই ধারার আলোচনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন বিষয় সংযোজিত করলেন। অনেক মাক৪সবাদী ঐতিহাসিক ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকালের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে নানা নতুন নতুন দিকের উন্মোচন ঘটালেন। ডগম্যাটিক সংকীর্ণতার গণ্ডী ছাড়িয়ে শ্রমিক ইতিহাসকে নতুন আলোকে বিচার করবার চেষ্টা শুরু করলেন।

ঔপনিবেশিকযুগে এমনকি আজ থেকে দু-দশক পূর্বেও ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা শৈশব অবস্থায় ছিল। কারণ সে সময়কার ইতিহাস ছিল 'এলিটিস্ট' মনোভাবাপন্ন, সেখানে নিম্নবর্গের মানুষদের কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু ১৯২০-এর দশক থেকে হিলটন, হিল, টমসন, হবস্‌বম, গ্রামশ্চি, রজনী পাম দত্ত প্রমুখের হাত ধরে ভারতে এক নতুন ধরনের ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হয় যেখানে কায়িকশ্রমে নিযুক্ত অর্থাৎ নিম্নবর্গ বা নিপীড়িতদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার ১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিক ইতিহাস চর্চা সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন ধারা আসতে থাকল। তার মধ্যে প্রধান ধারা হল এক সঙ্গে সারা ভারতের কথা না বলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট শিল্পের শ্রমিক নিয়ে গবেষণা— যেমন বোম্বাই, আমেদাবাদ, কানপুর বা কোয়েম্বাটুরের সুতাকল বা জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিক। শুধু প্রদেশভিত্তিক ইতিহাসই নয়, বিষেষীকরণ আরও এগিয়ে চলল যখন গবেষক-ঐতিহাসিকেরা এক-একটি সংক্ষিপ্ত পর্বের (Phase) উপর তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করতে লাগলেন।

সময়ের পর্বভিত্তিক গবেষণা ছাড়াও, একটি মাত্র নির্দিষ্ট শিল্প বা তৃণমূল স্তরের একটি মাত্র অঞ্চলের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ইতিহাসচর্চার বিষয় হিসেবেপ এসে দেল। সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে চটশিল্পের উপর। চা- বাগিচা শিল্প নিয়েও চটশিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে নানা দিক দিয়ে আলোচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন— রণজিৎ দাশগুপ্ত, দীপেশ চক্রবর্তী নির্বাণ বসু, পরিমল ঘোষ, অর্জন দি হান, শুভ বসু,. অমল দাস ও আরও অনেকে।

বোম্বে, আমেদাবাদ, কানপুরের সুতোকল শ্রমিকদের নিয়েও এখন পর্যন্ত বেশ ভাল ইতিহাসচর্চা রয়েছে ও হচ্ছে। এক্ষেত্রে মরিস.ডি মরিস. চার্লস মায়ার্স, আর, কে. নিউম্যান, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ চন্দ্রভারকার, চিত্রা যোশী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। জামশেদপুরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকদের নিয়েও সময়ের পর্বভিত্তিক আলোচনা ও বিশেষীকরণ বেশ ভালভাবেই শুরু হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের নিয়ে আলাদাভাবে অনুসন্ধান চলেছে। মহিলা শ্রমিক নেত্রীদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করেছেন মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ নারী শ্রমিকদের জীবন ও দাবি দাওয়া নিয়ে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা

ও ইতিহাসচর্চা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন— সুনীল সেন, শমিতা সেন, নির্মলা ব্যানার্জী, এগেলস ডাগমার ও আরও কেউ কেউ। সামাজিক শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব নিয়েও ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করেছেন। শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটিও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শ্রমিকদের সম্প্রদায়গত চেতনা নিয়ে লিখেছেন দীপেশ চক্রবর্তী। অবশ্য এর বিপরীত মতও পাওয়া গেছে অন্য শ্রমিক ইতিহাসচর্চায়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসচর্চার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল জাতীয় আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটে বামপন্থী শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অনুকূল-প্রতিকূল সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উবদান রেখেছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনাও কিছু কিছু হয়েছে। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতাদের জীবনীমূলক আলোচনা ও তাদের মূল্যায়ন নিয়েও ইতিহাস লেখা হয়েছে। জীবনীমূলক অভিধান রচনা করেছেন পঞ্চানন সাহা।

তবে সংগঠিত শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে যা বড় বড় শিল্পগুলি সম্পর্কে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি হলেও মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রমিকও অসংগঠিত নানা শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা তুলনামূলকভাবে কম। তবে সুখের বিষয়, এই অভাববোধ শ্রমিক ইতিহাসচর্চাকারীদের মধ্যে অধুনা এসেছে এবং কেউ কেউ এ কাজে এগিয়ে এসেছেন। আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের নানাা শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় স্বাধীনতা উত্তরকালে নানা শিল্পের শ্রমিকদের নানা সমস্যা-আন্দোলন নিয়ে ইতিহাসচর্চা অপেক্ষাকৃত কম বললেই চলে। অবশ্য সাম্প্রতিককালের শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে কিছু কিছু ইতিহাসচর্চা হয়েছে। নয়া অর্থনীতির ফলস্বরূপ রিন্ট্রেঞ্চমেন্ট ও নয়া প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা ও লেখা হয়েছে।

প্রশ্ন

১। কয়েকজন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসবিদদের নাম লেখ?

২। ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন?

১.৫.১৩.৫ ঃ উপসংহার (Conclusion)

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তের আসা যায় যে ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ইতিহাসচর্চা এখন মোটেই পিছিয়ে নেই। ভারত-ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক বিষয় হিসেবে শ্রমিকদের ইতিহাস নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহু বিচিত্র পথে এই গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ধারা এখন এগিয়ে চলেছে।

১.৫.১৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (References Books)

1. Sanjay Subrahmanyan (ed) : Money and Market in India;1100-1700.
2. Sugata Bose : PeasantLabour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770.
3. Sumit Guha : The Agrarian Economy of the Bombay-Deccan,1881-1941.

4. R.S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900.
5. R.K.Ray (ed) : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
6. T. Roy : Traditional Industry in the Economy of Colonial India.
7. Burton Stein and Sanjay Subrahmanyan (ed) : Institutions and Economic change in South Asia.
8. Dwijendra Tripathi (ed) : Business Communities of India.
9. A.K. Banerjee : Aspects of Indo-British Economic Relations, 1858-98.
10. Ranajit Guha : Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
11. Narahari Kabiraj : A Peasant Uprising in Bengal.
12. Narahari Kabiraj : Wahabi and Farazi Rebels of Bengal,
13. Blair B. Kling : The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862.
14. Majid Siddiqui : Agrarian Unrest in Northern India : The United Provinces 1918-32.
15. E.D. Murphy : Unions in Conflict : A Comparative Study of four South Indian Textile Centres, 1918-1939.
16. Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : the Bengal Jute Industry.
17. H.J Mc Closkey : Ecological Ethics and Politics.
18. D.E. Worster : Nature's Economy : The Roots of Ecology.
18. William Tucker : Progress and Privilege: America in the Age of Enviromentalism.
19. বিনয়ভূষণ রায় : উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান সাধনা।
20. C.A. Bentley : Malaria and Agriculture in Bengal.
21. Pandita Ramabai : The High Caste Hindu Worman.
22. B.C. Law : Women in Buddhist Leterature.
23. Bharati Ray (ed) : From the Seams of History : Essays on Indian Women.
24. Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteeth century.
25. অমল দাশ : ইতিহাস—অনুসন্ধান (১৫)—সম্পাদনা গৌতম চট্টোপাধ্যায়—সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা।
26. নির্বাণ বাসু (সম্পাদনা) : বাংলার শ্রমিকচর্চা সংক্রান্ত রচনাপঞ্জী।
27. সুমিত সরকার : আধুনিক ভারত।
28. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস. আধুনিক ভারত ইতিহাস, সভাপতির ভাষণ, ১৯৮২।

১.৫.১৩.৭ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Discuss the views of various authors on the economic history of Colonial India.
2. What are the differences between colonialist and nationalist works on Indian economic history?
3. How did the peasant and working class histories begin?
4. Discuss the history related to peasants and working class before independence.
5. Give an account of the history of Peasant and working class after independence.
6. Discuss the historical works related to gender.
7. ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।
8. ভারতের ইতিহাসে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা কর।
9. শ্রমিক ইতিহাসচর্চা প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কতটা প্রসারলাভ করেছিল? এই ইতিহাসচর্চার প্রকৃতি কী ছিল?
10. সাম্প্রতিককালে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি আলোচনা কর।
11. শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা কী?

একক-১৪

Religion, Culture, Environment and Science and Technology

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৫.১৪.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

১.৫.১৪.১ ঃ পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Environment, Science And Technology)

১.৫.১৪.২ ঃ নারী-ইতিহাস (Women History)

১.৫.১৪.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

১.৫.১৪.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignment)

১.৫.১৪.০ ঃ উদ্দেশ্য (objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ধারা

(২) আধুনিক ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং গবেষণার ফলে এই সব ক্ষেত্রে ইতিহাস অগ্রগতি

(৩) ভারতীয় ইতিহাসে নারীর গুরুত্ব ও গবেষণার প্রসার

(৪) নারী ইতিহাসচর্চার মূল্যায়ন—প্রাক্ স্বাধীনতাযুগে এবং উত্তরপর্বে

১.৫.১৪.১ ঃ পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Environment, Science and Technology)

আধুনিক ভারতের ইতিহাস ও ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। জনসংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ভারতের প্রাকৃতিক ভূচিত্র পাল্টে গিয়েছে। এই বিরাট রূপান্তর ইদানীংকালে ভারতের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একথা মনে করলে ভুল করা হবে যে ভারত ইতিহাসের মূল উপাদান হিসাবে প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিগত প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। তথাপি কেবলমাত্র ১৯৯০ এর দশক থেকেই ভারতের বেশ কিছু ঐতিহাসিক এগুলিকে স্বাধীন গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের কল্যাণ ও দেশের আবহাওয়ার উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে তাঁরা একমত নন। তাঁদের মতভেদের ফলে দেশের জনমত, সরকার এবং রাজনীতির মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে। এর ফলে দেশে বিভিন্ন Lobby বা গোষ্ঠীর উদ্ভব

হয়েছে। যেমন—Science lobby, economics and planning lobby এবং environment lobby, তবে আসন্ন আকস্মিক দুর্বিপাকের আকাঙ্খায় সবাই সন্ত্রস্ত। বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে 'Greenhouse effect' এর ফলে গ্লেসিয়ারের ক্ষয়প্রাপ্তি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের এই সংকটকে কেন্দ্র করে গণবিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিকদের প্রভাবিত করেছে। ১৯৯০ এর দশক থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। তারও আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে থাকে। যেমন—ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা বিবৃত হয়েছিল? বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং প্রযুক্তির মান কেমন ছিল?

ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান ঔপনিবেশিক ভারতে ছড়িয়ে দেবার সুবাদে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল।

*বিশেষত ১৯৯০ দশকের পর থেকে ভারতের ইতিহাস চর্চায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। এবং এই আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের **Lobby** বা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। ১৯৯০ এর দশক এর আগেও যদি দেখি তবে সেখানেও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেখা যায়। যেমন-ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা বিবৃত হয়েছিল? বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতে বিজ্ঞানের অবস্থা এবং প্রযুক্তির মানই বা কেমন ছিল? এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে ভারত ইতিহাস চর্চায় এক নতুন শাখা বিশেষ ভাবে স্থান পেয়েছে।*

ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের ধারণা ছিল, এটা প্রধানতঃ ধর্মনির্ভর, বিজ্ঞান নির্ভর নয়। কিন্তু সাত শতাব্দী আগে প্রথম দিকের মুসলমান ভ্রমণকারীদের মত কিন্তু আলাদা ছিল। ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আলবিরুনী ভারতের ধর্ম ও বিজ্ঞানের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মুসলমানরা কিছু কারিগরী দ্রব্য এদেশে এনেছিলেন। যেমন, কাগজ ও 'Persian wheel'. ইউরোপও সে সময়ে চীন ও মুসলমান জগৎ থেকে কিছু প্রযুক্তিবিদ্যা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সতেরো শতকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং আঠারো শতকে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশরা ভারতে তাদের বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকৃষ্টতা দাবী করতে থাকে। উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান আনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করেননি। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রাচীন যুগে ভারতে বৈজ্ঞানিক ট্রাডিশন অব্যহত ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই দ্বৈত ধারণা ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মধ্যে। তিনি একদিকে নাইট্রেটের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান রাসায়নিক আবিষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে *The History of Hindu Chemistry* বইটিও রচনা করেন। ১৯০২ এবং ১৯০৮ সালে দুখণ্ডে প্রকাশিত এই বইখানির মাধ্যমে এই পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী ব্রিটিশদের 'imperialist idea of science as the achievement of Western enlightened thought alone'-ধারণাকে ইতিহাসগতভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়েছে বহুমাত্রিক সভ্যতার মাধ্যমে, শুধু ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা নয়। জেসেফ নিড্হামের লেখা *Science and Civilisation in China* বইটিতেও একই সুর শোনা যায়।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যেও আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় সভ্যতার তার ঐতিহাসিক প্রভাব সম্পর্কে দুটি ভিন্নমুখী চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। ডঃ রজত রায় লিখেছেন, "Mohan Das Karamchand

Gandhi denouced railways lawyers and doctors, and declared machineryto be a 'great sin".Hind Swaraj-এ গান্ধীজী লিখেছিলেন, ''It id machinery that has impoverished India''. তাঁর শিষ্য জওহরলাল নেহরু কিন্তু এই মত গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি *The Unity of India* নামে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "Politics led me to economics, and this led me inevitably to science and the scientific approach to all our problems of hunher and poverty''. ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে, বড় বড় বাঁধ নির্মাণ করে এবং ইস্পাত কারখানা স্থাপন করে ভারতের 'landscape'-এর রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। আধুনিককালের সংস্কারপন্থী পরিবেশবাদী ঐতিহাসিকরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের প্রশ্নে বিতর্কের ক্ষেত্রে নেহরুর চেয়ে গান্ধীজীর উপরই বেশী নির্ভর করেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্বে যে পরিবেশগত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল সেটি হল ঃ how far had the face of the country changed over time? রাধাকম মুর্খাজী তাঁর ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত *The Changing face of Bengal: a study in Riverine Economy* গ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে নদী ও পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন। তবে পরিবেশ পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলে না। উনিশ শতকের গোড়ায় D,Butter নামে এক ব্রিটিশ অফিসার পরিবেশ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তার নাম হল ঃ *An Outline of the Topography and Statistics of the Southern Districts of Oudh.* ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত এই রিপোর্টে তিনি বিগত কয়েক দশকের গ্রীষ্মকালীন গরম হাওয়া বা 'loo' এর 'unremitting asvance' সম্পর্কে লিখেছিলেন। ঔপনিবেশিক অফিসারদের ঐতিহাসিক ভূগোল সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল। আলেকজান্ডার কানিংহামের লেখা *The Ancient Geography of India* গ্রন্থটি এক্ষেত্রে পথ দেখিয়েছিল। এইসব লেখাগুলি থেকে বোঝা যায় আধুনিক বিজ্ঞান ভারতে প্রবেশ করার আগেই জনসংখ্যা ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইতিমধ্যেই ভারতের পরিবেশে পরিবর্তন ঘটেছিল।

১৯৯০ এর দশকে নতুন করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিক চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন, What was the popular reception of science-acceptance or resistance? What was the impct of ecological change upon the question of welrare-partially beneficial or wholly negative? তবে ঐতিহাসিক গবেষণার নিরিখে এই প্রশ্নগুলি একেবারে নতুন নয়। নতুন ইতিহাস চর্চার নতুনত্ব হল এই যে তাঁরা সব প্রশ্নগুলিকে একত্রে নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এর আগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। একদিকে দেশপ্রেমী ভারতীয়রা বৈদিক যুগের অনেক আবিষ্কারের কথা বলে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নগণ্য করার চেষ্টা করেছেন। আবার অন্যদিকে কিছু ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক বক্তব্যেক পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলেছেন।

সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে 'power and politics' সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে প্রকাশিত বিখ্যাত বই হল অধ্যাপক দীপক কুমার এর লেখা *Science and the Raj.* এক্ষেত্রে আরও কতকগুলি বই হল ঃ ডেভিড আর্নল্ড-এর *Colonizing the Body : State, Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India:*জ্ঞান প্রকাশের *Another Reason : Science and the Imagination of Modern India:* ডেভিড আর্নল্ডের *Science, Technology and Medicine in Colonial India.* নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিক ডেভিড আর্নল্ড ওজ্ঞান প্রকাশ

দুজনেই দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের মাধ্যমে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দুজনেই নতুন প্রযুক্তিকে দেখেছেন 'a link between space and the state'. এঁদের মতে বিজ্ঞান হল ক্ষমতা ও আধিপত্যের মাধ্যম। ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আধিপত্য প্রসারের নীতি গ্রহণ করেছিল; এর মধ্যে ঔপনিবেশিক মানুষদের জন্য কল্যাণকামনা ছিল না। এঁদের মতে বিজ্ঞান নির্ভর রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রসারের ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জনস্বাস্থ্যের অবনতি ও মৃত্যুর কারণ হিসাবে প্লেগ, ম্যালেরিয়া, বসন্তস কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির উপর ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া এইসব রোগের জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার কথাও আলোচিত হয়েছে। কঠোর ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও বই প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৯০ এর দশকে ইতিহাসের একটি বিশেষ শাখা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস রচনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৮৭ সালে C.A. Bayly মন্তব্য করেছিলেন, "Ecological change in India is the coming subject but no overview has appeared". বেইলী নিজেই এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে ১৮৭০ সালের পরের একশো বছরে ভারতীয় উপমহাদেশে এক বিপুল পরিমাণ বৃক্ষশূন্যতার সূচনা হয়েছিল। নতুন প্রজন্মের পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল ঃ রামচন্দ্র গুহ-র The Unquiet Woods : Ecological Change and peasant Resistance in the Himalaya. বইটি ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি অধ্যাপক গুহ নিম্নবর্গীয় ঐতিহাসিকদের 'থিম' অনুযায়ী পরিবেশের পরিবর্তন অপেক্ষা "dominance and resistance"-এর কথাই বেশি বলেছেন। হিমালয় অঞ্চলের বনসম্পদের বাণিজ্যিক গণ শোষণের বিরুদ্ধে হিমালয়ের পাদদেশের মানুষের গণ আন্দোলনের উত্থানের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাড্‌গিল এর লেখা *This Fissured land : an ecological history of India* গ্রন্থটি। এখানে আলোচনার বিষয়বস্তুর পরিধি অনেক বিস্তৃত ছিল। এঁদের সিদ্ধান্ত হল ঃ 'In India the ongoing struggle between the peasant and industrial modes of resources use has come in two stages : colonial and post colonial. It has left in its wake a fissured land, ecologically and socially fragmented beyond belief and, to some observers, beyond repair".উপনিবেশিক নীতির ক্ষতিকারক পরিবেশগত ফলাফল সম্পর্কে দুখানি উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। একটি Richard H. Grove-এর লেখা Green Imperialism : Colonaial Expansion, Tropical Island Edens, and the Origins of Environmentalism 1600-1860. বইটি ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। আরেকটি বই এর লেখক হলেন Mahesh Rangarajan. বইটির নাম হল ঃ *Fencing the Forest: Conservation and Ecological change in India's Central Provinces 1860-1914.* বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। পরিবেশের ইতিহাসের কতকগুলি মূল বিষয় হল ঃ বনবাসীদের অধিকার হারানো, তাদের প্রতিরোধ এবং বনসংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা।

প্রথাগত ইতিহাসে ইতিমধ্যেই পরিবেশের উপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণ, সেচ খাল খনন, জমা-জল, রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ এলিজাবেথ হোয়াইকোম্ব—এর *Agraian Conditions in Northern India : The United provinces under British Rule, 1860-1900* আয়ান স্টোন এর Canal Irrigation in British India :

Perspectives on Technological change in a Peasant Economy. এম. মুফাখারুল ইসলাম এর Irrigation, Agriculture and the Raj: Punjab 1887-1947. বইগুলি থেকে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তা হল, রাস্তা ওখাল জলের স্বাভাবিক গতিধারাকে ব্যাহত করেছিল, যদিও জলসেচের সুবিধার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। Robert Varady-র রেলপথের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা থেকে জানা যায় কীভাবে রেলপথ নির্মাণের ফলে হিমালয় অরণ্য অঞ্চল এবং সমতলের বনাঞ্চল অবলুপ্ত হয়েছিল। রাস্তা এবং রেলপথ তৈরির ফলে বিভিন্ন রোগ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিবেশ ইতিহাসবিদ ছাড়াও অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা কৃষির সম্প্রসারণের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল শিরিন মুসভি-র *Man and Nature in the Mughal Era (1993).* তবে পরিবেশের উপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে জানতে হলে শুধু পরিবেশ ইতিহাসবিদ নয়, মূলস্রোতের অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকদের কাজগুলি নিয়ে একত্রে আলোচনা করা দরকার। তবেই একটি 'balanced picture' পাওয়া সম্ভব।

পরিবেশের ইতিহাসের উত্থানের ফলে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নতুন করে চিন্তা শুরু করেছেন। এর কারণ হল, ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সম্পর্কে পরিবেশ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ। কারিগরী উন্নতি আগেকার অসমালোচনামূলক ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বর্তমানে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকরা একরকম নিশ্চিত যে বৃটিশ শাসন, ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সূচনা করে ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চেয়েছিল। তবে তাঁরা মনে করেন যে একেবারে শুরুতে ভারতীয়রা রেলপথ ও টেলিগ্রাফ স্থাপনের বিরোধিতা করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ হিসাবে J,H,Kaye ভারতীয়দের এই ব্রিটিশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর বিখ্যাত *A History of the sepoy war in India* গ্রন্থে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বক্তব্য হল ঃ বিদ্রোহ দমনের পর প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের প্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল। L.S.S O'Malley এনামে একজন ঔপনিবেশিক অফিসার তাঁর বিখ্যাত *Modern India and the West : a study of the interactions of the civilisations* গ্রন্থে 'Mechanism and Transport' নামে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি রেলপথ, যোগাযোগ, বেতার, ফিল্ম, প্রভৃতির নতুন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে এর ফল ভারতের অনুকূলেই গিয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর প্রযুক্তি সম্পর্কে গ্রন্থ মূলত ঃ ইতিহাসের বিশ্লেষণাত্মক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। ভারতের এই গতিধারা অনুযায়ী ভারতের কয়েকজন প্রথম সারির বিজ্ঞানীও 'technicaleducator' রা নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী'তে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯৭৭ সালে এই বক্তৃতাগুলি বি.আর.নন্দার সম্পাদনার *Science and Technology in India* নামক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফলাফল সম্পর্কে অসমালোচনামূলক সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয় এবং জওহরলাল নেহরুর প্রগতিমূলক নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থে প্রযুক্তিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। প্রযুক্তির নিজস্ব পৃথক ইতিহাস গড়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক দেখাতে চান যে পশ্চিম থেকে অ-পশ্চমী সমাজে প্রযুক্তির হস্তান্তরের ফলেই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

Daniel R.Headrick-এর লেখা *The Tentacles of Progress : Technology Transfer in the Age of Imperialism, 1850-1940* গ্রন্থে এই ধরনের বক্তব্যের প্রকাশ ঘটেছিল। Roy McLeod ও Dipak Kumar সম্পাদিত *Technology and the Raj* গ্রন্থে ভারতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থের ভারতীয় রেলপথের উপর একটি প্রবন্ধে Ian Derbyshire বলেছেন, "Technical development remained colonial-dependent." F.Lehmann হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, 'during the entire period of British rule in India, not more than 700 locomotives were built in the country, despire the vast railway network that existed in 1947". অন্যান্য রেল ইঞ্জিনগুলি বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল যেগুলির অধিকাংশই সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে তৈরি হয়েছিল। একই ধরনের বক্তব্য রেখেছেন Daniel Thorner. তিনি বলেছেন, "India alone of the countries with great railway networks is unindustrialized".

প্রথমে ব্রিটেন থেকে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তান্তরের ঐতিহাসিক ভূমিকার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃপরিবেশের চেয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বেশি করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু পরিবেশের ইতিহাসের উত্থানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকায় সমালোচনা একটি নতুন মাত্রা পায়। রেলপথের উপর অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক ও পরিবেশ ইতিহাসবিদদের প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে সম্পাদনা করেছেন Ian. J. Kerr. বইটির নাম Railways in Modern India. তিনি রেলপথের শুভ ও অশুভ দুরকম ফলাফল নিয়েই লেখা প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক হল ভারতে ইউরোপীয় ঔষধের আমদানী। এক্ষেত্রেও আধুনিক গবেষকরা এর সদর্থক ও নঞর্থক দুই ধরনের ফলাফলের উল্লেখ করেছেন। তবে নতুন গবেষণা "has still not dislodged the impression that technology brought important benefits".

যাই হোক, গবেষণার অগ্রগতির ফলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশের ইতিহাস ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন

১। ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের কি ধারণা ছিল?

২। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের নতুন ভাবনাটা কি?

১.৫.১৪.১ ঃ নারী-ইতিহাস (Women History)

দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে এর পরিবর্তন ঘটলেও অধ্যাপিকা রেখা পাণ্ডের ভাষায় বলা যায়, "In the Indian context Women's history is still at its infancy". এর অর্থ এই নয় যে, আসলে নারীদের সমস্যা নিয়ে কোন গভীর চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল একটি "independent and natural discipline". হিসাবে নারী ইতিহাস তখন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়নি। তবে ভারতে বিভিন্ন নারী ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হবার ফলে এবং সিলেবাসে নারী ইতিহাস স্থান পাওয়ার বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় নারীদের অবহেলিত হওয়ার প্রধান কারণগুলি হল ঃ

(১) ভারতীয় ইতিহাসচর্চা ছিল প্রধানত পুরুষকেন্দ্রিক। যদিও কিছু কিছু গ্রন্থে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা থাকত, সেগুলি স্থান পেত একেবারে পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে। বৈদিক, পরবর্তী বৈদিক, মধ্যযুগ ও বিজয়নগর সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে লেখা থাকলেও এই পর্বে ভারতের ইতিহাসে নারীদের ভূমিকার যথাযথ বিশ্লেষণ করা হয়নি।

(২) প্রচলিত ভারতের ইতিহাসচর্চায় রাজনীতি, যুদ্ধ, কূটনীতি প্রভৃতি যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্বদেওয়া হত সেখানে নারীদের ভূমিকা তুলে ধরার কোন সুযোগ ছিল না। সুলতানা রাজিয়া বা ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপে তুলে আনা হয়েছিল এই কারণে যে তারা নারী হয়েও পুরুষের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

(৩) নারীদের প্রধান কাজগুলি যথা সন্তানের জন্ম দেওয়া, রান্না করা, চাষের কাজে অংশগ্রহণ, লোকশিল্পে অংশগ্রহণ প্রভৃতিকে ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবার মত উপযুক্ত বা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে চাননি। এইজন্য নারী ইতিহাসের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

(৪) নারী ইতিহাস অবহেলিত হওয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল উপাদানগত অপ্রতুলতা। প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের কথাই বেশি জানা যায়, নারীরা সেখানে অবহেলিত। রেখা পাণ্ডে তাই মন্তব্য করেছেন, "Nurnismatics , archaeology, inscriptions and literary texts reflect an elite world, and coupled with the pre-occupation with Political history, have completely ignored women".

উনিশ শতকের কয়েকজন ইউরোপীয় লেখক ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং তাদের রচনায় ভারতীয় নারী গুরুত্ব পায়। ভারতীয় নারীদের অবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বগত বিতর্ক দেখা দেয়। প্রাচ্যবাদী ইউরোপীয়রা ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসা করলেও উনিশ শতকে ইউটিলিটারিয়ান ও ইভানজেলিস্টরা (Utilitarians and Evangelists) সমকালীন ভারতীয় সমাজের কঠোর সমালোচনা করেন। তারা ভারতীয় নারীদের 'low status'-এর কথা তুলে ধরেন। এই সমালোচনার জবাবে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য উল্লেখ করে দেখান যে ভারতীয় নারী 'high status'-এর অধিকারী ছিল। উইলিয়াম জোন্স এবং এইচ.টি.কোলব্রুক প্রমুখ প্রাচ্যবাদীরা সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শনের প্রশংসা করেন। কিন্তু তাদের রচনাতেও নারীদের স্থান ছিল নগণ্য; জোন্স কেবলমাত্র গার্গীকে একজন শিক্ষিতা মহিলা হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সতীদাহ প্রথা বা ভারতের বিধবা মহিলাদের কথা বলেননি। কোলব্রুক ধর্মীয় সাহিত্যে সতীদাহ প্রথার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

প্রাচীন ভারতে পুরুষকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চা উপাদানগত অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণে ভারতের ইতিহাস চর্চায় নারীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু আসলে এই নয় যে, নারীদের সমস্যা নিয়ে কোন গভীব চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। আসলে যেটা হয়েছিল তা হল নারী ইতিহাস এমন স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়নি। কিন্তু উনবিংশ এবং বিংশ শতকে থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীরা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও তাদের চিন্তা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং এর ফলে নারী ইতিহাস চর্চা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

Clarisse Bader তাঁর "Women in Ancient India"(1925) গ্রন্থে আর্যযুগের ভারতীয় নারীদের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন আর্য নারীদের ধর্মীয় নমনীয়তা, স্বার্থত্যাগ, পরিবারের প্রতি সীমাহীন দায়িত্ববোধ ও

আনুগত্য প্রভৃতি গুণ পশ্চিমী মহিলাদের অনুকরণযোগ্য। Bader ভারতীয় নারীদের স্বামীর সঙ্গে সতী হওয়ার ঘটনাকে তাদের 'আধ্যাত্মিক সাহসিকতা' বলে বর্ণনা করেছেন। Isabel Blen Horner বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের উপর নির্ভর করে নারীদের একটি নতুন বিভাগ সংযোজন করেছেন, সেটি হল 'Women Workers' : তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Women Under Primitive Buddhism' (1930) গ্রন্থে প্রচলিত মাতা, কন্যা, স্ত্রী ও বিধবাদের কথা না বলে নারী শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

জেমস মিল তাঁর 'History of British India' (1871) গ্রন্থে হিন্দু সভ্যতার নিষ্ঠুরতার কথা বলেছেন। কারণ হিন্দুরা নারীদের কোন সম্মান দেয়নি। মিলের মতে, "They excluded women from sacred texts, while depriving them of education, of a share of paternal property, and held them as unworthy to eat with their husbands." নারীদের শিক্ষা ও পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে যেহেতু হিন্দু সমাজ মেয়েদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে পারেনি সেজন্য ভারতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ প্রয়োজন । তিনি আরো বলেছেন যে, হিন্দু পুরুষরা Self-rule এর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। মিলের বক্তব্যকে অনেক ব্রিটিশ প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ সমর্থন করেন। পশ্চিমী ধারণায় শবদাহের সময় কোন বিধবার মৃত্যু এবং শিশুকন্যার বিবাহ মানেই ভারত বলে মনে করা হতে থাকে। Katherine Mayo তাঁর বিখ্যাত 'Mother India' (1927) গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের শোচনীয় দুর্গতি এবং বিশেষ করে শিশুপত্নীদের কষ্টের কথা বলেছন। এইজন্য ভারতীয় পুরুষদের উপর তিনি দোষারোপ করেছেন।

(১) পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের সমালোচয় বলা যায় যে, তারা ভারতীয় সমাজের আংশিক ছবি তুলে ধরেছেন, পূর্ণাঙ্গ নয়। এর কারণ হল তাদের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা। এই উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না। কারণ এই ধরনের সাহিত্যে প্রধানত ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। যেমন নারীর পুনঃবিবাহের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, সন্তানহীন বিধবার দত্তক গ্রহণ, শিক্ষার অধিকার, জনসমাবেশে নারীদের উপস্থিতির প্রশ্ন প্রভৃতি। এই ধরনের সাহিত্যে কেবলমাত্র মেয়েদের সাংসারিক জীবন ও স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্কের কথা বিশেষভাবে বলয়ছে। সমাজের অন্যান্য কাজকর্মের কথা স্থান পায়নি। এই সাহিত্যে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কথা বলা আছে।

(২) পশ্চিমী লেখকদের রচনায় ভারতীয় নারীদের 'low status'-এর ব্যাখ্যার পিছনে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এর মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত শাসন এবং ভারতীয় সমাজের রূপান্তরের নৈতিক অধিকার দাবী করার চেষ্টা করেছিল।

(৩) এইসব লেখকরা কেবলমাত্র বিশেষ একটি শ্রেণী অথবা উচচশ্রেণীর নারীদের সম্পর্কে লিখেছেন। অধ্যাপিকা পাণ্ডে তাই মন্তব্য করেছেন, "Women of other castes and sections were totally omitted from scrutiny and were not a matter of concern".

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই ভারতের বুদ্ধিজীবীরা নারী সচেতন হয়ে ওঠেন। সতী, শিশুকন্যা বিবাহ, কন্যাহত্যা ও বিধবাদের সম্পর্কে তারা চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। তার সমাজ সংস্কারের কথা বলতে থাকেন। এর বিরোধিতাও করা হয়। দুপক্ষই কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের যুক্তির সমর্থনে সংস্কৃত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু ঐতিহাসিকদের রচনায় নারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

(১) এক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য বই হল A.S. Altekar-এর ''position of women in Hindu Civilization''. (1938), বইটি ব্রাহ্মণ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছিল। গ্রন্থটিতে প্রাচীন আইনবিদদের নারীদের শিক্ষা, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবাদের অবস্থা, নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। Altekar-এর মতে কোন দেশের সভ্যতাকে বুঝতে হলে সেই দেশের নারীদের অবস্থা কী ছিল তা আগে জানা দরকার। তাঁর মতে, বিবাহ আইন ও প্রথায় নারীদের কেবলমাত্র 'market commodities' বলে মনে করা হত, না 'husband's valued partner' হিসাবে দেখা হত, তার মধ্যেই নারীদের প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। আলতেকার মনে করেন, হিন্দু নারীরা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান চাইত এই কারণে যে বিধবারা পিতা মাতার দুঃখের কারণ ছিল অথবা পিতা মাতা তাদের কন্যাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত না বলে। কারণ সে যুগে পুনঃবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। আলতেকার লিখেছেন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হত না এই কারণে যে শত্রুদের হাত থেকে তা রক্ষা করবার মত ক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি আরো বলেছেন যে মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হত এই কারণে যে তারা যাতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম গ্রহণ করতে না পারে। অবশ্য আলতেকার ও উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের কথা বলেছেন। এর ফলে প্রাচীন যুগের নারী ইতিহাস রচনার বিশ্লেষণধর্মিতা বাধা প্রাপ্ত হয়।

(২) Devaki Indra তাঁর 'Status of Women in Ancient India' (1940)গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে আদি আর্য সমাজের মেয়েদের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈকি অবস্থা পূর্ববর্তীযুগের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। J.B. Chowdhuro তাঁর 'Position of Women in Vedic Ritual' (1956) গ্রন্থে ভারতীয় নারীদের রক্ষণশীলতা এবং তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের কতা বলেছেন। ''The Status of Wmmen in fhe Epic'' (1966) গ্রন্থে Shakambari Jayal দেখিয়েছেন যে, প্রথমে নারীদের 'high status' থাকলেও পরবর্তী বৈদিক যুগ অনার্য স্ত্রীদের আগমনের ফলে অবস্থান অবনতি ঘটে।

(৩) ডি.ডি. কোশাম্বী আর.এস.শর্মা প্রমুখ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা প্রচলিত রাজনৈতিক ইতিহাসেদ্দ ওপর বেশি জোর দেওয়া ফলে নারী ইতিহাস তাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। রোমিলা থাপারের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়।

(৪) সরোজ গুলাটি এবং কমলা গুপ্ত প্রমুখ medievalist ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে সমালোচনা প্রতিবাদ করেছেন, তাদের মতে এইসব নারীরা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন তখন তাদের সম্পর্কে অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল। যেমন রাজিয়া একজন 'wise, just, generous, a protector of her subjects and leader of her armies' হওয়া সত্ত্বেও দাস ইয়াকুত এর সঙ্গে তার সম্পর্ব্বকে কেন্দ্র করে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। একইভাবে নূরজাহানের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভকেও সমকালীন ইতিহাসে অযথা সমালোচনা করা হয়েছে এবং 'Petticoat Government' বলে নিন্দা করা হয়েছে। রেখা মিশ্র তাঁর 'Women in Mughal India' (1967) গ্রন্থে মহিলাদের

রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কথা লিখেছেন। অবশ্য সরোজ গুলটি 'Women and Society' গ্রন্থে মহিলাদের সাংসারিক কাজকর্মের কথা বললেও 'Production Process'-এ মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুই বলেনি।

১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর পর্বে নারী ইতিহাসচর্চায় নতুত্ব দেখা যায়। উনিশ শতকের সামাজিক সংস্কারের গণ্ডি পেরিয়ে ঐতিহাসিকরা নারী ইতিহাস আলোচনায় জাতীয়বাদী প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। Joanna Liddle এবং Roma Joshi তাদের 'Daughters of Independence' গ্রন্থে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল "women could not envisage an independent programme for they had to find their understanding of women's participation within the conceptional framework of the national movement'. স্পষ্ট করে বলা যায় জাতীয় আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। Partha Chatterjee 'Recasting Women' (1989) গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে 'Nationalism' এবং 'Women Question' এর মধ্যে সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ 'Women Question' এর সমাধান করেছে।

K.Lalita 'Women Writing in India' (1991-1993) গ্রন্থে কৃষক সংগ্রামে নারীদের ভূমিকার কথা বলেছেন। তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তিনি বলেছেন।

বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা নারী ইতিহাস রচনার ফলে নারী ইতিহাসচর্চা বর্তমানে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। তাই বিভিন্ন যুগে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এখনো প্রকাশিত হয়নি। তবে বর্তমানে ইতিহাস রচনায় 'male and elite perspective'-এর সঙ্গে সঙ্গে নারী ইতিহাসও যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে। যার উদ্দেশ্য হল ঃ Building a new comprehensive history in which women are given a proper palce as par with man".

প্রশ্ন ১। ভারতীয় ইতিহাস চর্চার নারীদের অবহেলিত হওয়ার কারণগুলি কি ছিল?

১.৫.১৪.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (References Books)

1. Sanjay Subrahmanyan (ed) : Money and Market in India; 1100-1700.
2. Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital : Rural Bengal since 1770.
3. Sumit Guha : The Agrarian Economy of the Bombay-Deccan,1881-1941.
4. R.S. Rungta : The Rise of Business Corporations in India, 1851-1900.
5. R.K. Ray (ed) : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
6. T. Roy : Traditional Industry in the Economy of Colonial India.
7. Burton Stein and Sanjay Subrahmanyan (ed) : Institutions and Economic change in South Asia.

8. Dwijendra Tripathi (ed) : Business Communities of India.
9. A.K. Banerjee : Aspects of Indo-British Economic Relations, 1858-98.
10. Ranajit Guha : Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India.
11. Narahari Kabiraj : A Peasant Uprising in Bengal.
12. Narahari Kabiraj : Wahabi and Farazi Rebels of Bengal.
13. Blair B. Kling : The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1862.
14. Majid Siddiqui : Agrarian Unrest in Northern India : The United Provinces 1918-32.
15. E.D. Murphy : Unions in Conflict : A Comparative Study of Four South Indian Textile Centres, 1918-1939.
16. Samita Sen : Women and Labour in Late Colonial India : the Bengal Jute Industry.
17. H.J McCloskey : Ecological Ethics and Politics.
18. D.E. Worster : Nature's Economy : The Roots of Ecology.
18. William Tucker : Progress and Privilege: America in the Age of Enviromentalism.
19. বিনয়ভূষণ রায় : উনিশ শতকে বাংলার বিজ্ঞান সাধনা।
20. C.A. Bentley : Malaria and Agriculture in Bengal.
21. Pandita Ramabai : The High Caste Hindu Worman.
22. B.C. Law : Women in Buddhist Leterature.
23. Bharati Ray (ed) : From the Seams of History : Essays on Indian Women.
24. Usha Chakraborty : Condition of Bengali Women around the second half of the Nineteeth century.

১.৫.১৪.৪ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Write a note on the role of technology in modern history.
2. Discuss some of the historical works on science, technology and environment.
3. Why did the early writers of Indian history relegate women to the background?

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

একক ১৫

Social History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৬.১৫.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৬.১৫.১ ঃ ইতিহাসে বিতর্ক (Debates in History)

১.৬.১৫.২ ঃ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৫৪২ খ্রীঃ)

১.৬.১৫.৩ ঃ হেনরী পিনের বিতর্ক

১.৬.১৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

১.৬.১৫.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

১.৬.১৫.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবেন ঃ

১) ইতিহাস বিতর্কের কারণ

২) ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য ও নানা অভিমত

৩) হেনরী পিরেনের তত্ত্ব

৪) এই তত্ত্ব নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক

৫) এই তত্ত্বের গুরুত্ব

১.৬.১৫.১ ঃ ইতিহাস বিতর্ক

ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক। বিক্ষিপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ ঐতিহাসিক নথিপত্রের ফলে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা বোর সুযোগ ঘটে।

ইতিহাস চর্চার একটি প্রধান বিষয় হল কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক বিতর্ক। কারণ এই বিতর্কের সাহায্যেই আজ সমৃদ্ধশালী হয়েছে ইতিহাস চর্চা ও ইতিহাস চর্চার জগৎ।

সৃষ্টি হয় ঐতিহাসিক বিতর্কের। তবে এই বিতর্কই ইতিহাসকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। ঐতিহাসিক আর্থার মারউইক অবশ্য মনে করেন, বিতর্ক দুর্ভাগ্যজনক। কারণ, এর ফলে ইতিহাস গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ অতীত সম্পর্কে গভীর বোধ বা অনুভূতির সৃষ্টি ব্যাহত হয়। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক বিতর্ক ইতিহাস চেতনার প্রসারে সাহায্য করে, মতানৈক্যের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত হয় এবং নথিপত্রগুলি নতুনভাবে পরীক্ষিত হয়। এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই অদ্ভুত হয়েছে ইতিহাসের অনেক নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন তত্ত্ব। আবির্ভাব ঘটেছে নতুন নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর। এর ফলে ইতিহাসের অন্তরালে জমে থাকা অনেক নতুন তথ্য ও ঐতিহাসিক সত্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব হয়েছে। সমৃদ্ধশালী হয়েছে ইতিহাসচর্চা ও ইতিহাসের জগৎ।

১.৬.১৫.২ ঃ ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)

এমনই একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয় হল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)। এই গৃহযুদ্ধের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিয়েছে।

লং পার্লামেন্ট (Long Parliament) কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল — এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের প্রকৃতির ব্যাখ্যা অন্তর্নিহিত আছে। লং পার্লামেন্টের বিভাজনের প্রকৃত কারণ অথবা গৃহযুদ্ধের চরিত্র কী ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করেন। রাজতন্ত্রী ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবে কেন হয়েছল তা বুঝতে হলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধর্মীয়, সাংবিধনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পার্থক্যগুলি আলোচনা করা দরকার। স্টুয়ার্ট আমলে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করার মতো। কতগুলি ধর্মীয় নমীতি ও নিয়ম ইংল্যাণ্ডের জনগণের উপর চাপানোর ফলে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যায়। যদি রাজা চার্লস এবং আর্চবিশপ লড 'প্রেয়ার বুক' জোর করে চাপানোর চেষ্টা না করতেন তা হলে হয়তো লং পার্লামেন্ট ডাকার দরকার হত না।

১৬৪২ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ খুঁজে পেতে হলে আমারে লং পার্লামেন্ট কেন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল এবং রাজা ও পার্লামেন্টের অধিকারের বিরোধ– এই দুটি বিষয় জানা দরকার।

আর্চবিশপ লড কর্তৃক নানান ধরনের ধর্মীয় আচার ও নিয়মকানুনের পরিবর্তন ইংল্যাণ্ডের পিউরিটান জনগণকে আহত করেছিল। পার্লামেন্ট যখন নতুন বিশপের নতুন নিয়মকানুনের প্রতিবাদ করল তখন তারা খুব সহজেই ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের সমর্থন পেল। পরবর্তীকালে এই ধর্মীয় নীতি নিয়ে পার্লামেন্টের বিবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে জনসাধারণ অব্যাহত পায়নি। গৃহযুদ্ধের সময় এই ধর্মীয় বিরোধের প্রতিফলন নিশ্চিতভাবে পড়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের সাংবিধানিক পটভূমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একদিকে রাজার প্রচলিত বিশেষ ক্ষমতা ভোগের দাবী এবং অন্যদিকে পার্লামেন্টের ধর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, বৈদেশিক নীতি, কর স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে

অধিকার অর্জনের নিরলস প্রচেষ্টা দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে যে উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিফলন গৃহযুদ্ধের মধ্যে খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রাজা চার্লস যখন বললেন, "Parliamentary Privileges had their l/imitations and since they emanated from the grace and the permission of the king and they were never above Remembers of the Parliament" তখন বিক্ষুব্ধ পার্লামেন্ট জানাল "The privileges of the Parliament are the birthrights and due inheritance of the people of England". এইজন্য ঐতিহাসিক গার্ডিনার গৃহযুদ্ধকে 'Puritan Revolution' বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ তার মতে এই যুদ্ধ ছিল পার্লামেন্টের ধর্মীয় ও সাংবিধানিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান গার্ডিনারের মত সমর্থন করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, "In motive the great rebellion wsas a war not of clauses but of ideas."

যদিও গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে গার্ডিনার ও ট্রেভেলিয়ানের ধ্রপদী ব্যাখথ্যা একনো পর্যন্ত অব্যাহত আছে তবুও আধুনিক ঐতিহাসিকরা মধ্য সপ্তদশ শতকের গৃহযুদ্ধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পিউরিটান রেভোলিউশনের সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা রইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদের সৃষ্টি করেছে। শুধুমাত্র বিভিন্ন রধরনের মতামতই নয়, ঐতিহাসিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত মতও প্রকাশ পেয়েছে।

গৃহযুদ্ধের আধুনিকতম ব্যাখ্যা হল যে সমাজের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির বিরাট রূপান্তর ঘটেছিল।

(১) অধ্যাপক টনি দেখিয়েছেন যে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জমি পুনঃবন্টনের ফলে যে সম্পত্তিগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছিল, তার প্রতিবিধান করার জন্য গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। টনির মতে, একটি নতুন জেন্ট্রি বা জমিদার শ্রেণী ইংল্যান্ডের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল।

(২) টনির মতে, জেন্ট্রিরা Capitalism এর পক্ষে বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল টনি ও তার সমর্থকদের মতে, গৃহযুদ্ধের সময় শ্রেণী সংগ্রাম ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। যখন স্টুয়ার্ট রাজারা রাজত্ব করতে আসেন তখনই জেন্ট্রি পরিচালিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজ জড়গণের মধ্যে সবচেয়ে কর্মক্ষম শ্রেণী হিসাবে পরিচিত ছিল। এই নতুন জেন্ট্রি শ্রেণীর উত্থান টিউডর আমল থেকে শুরু হয়েছিল। তারা ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহী করে তুলেছিল। প্রকাশ্য যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই দুই পক্ষের প্রচার যুদ্ধ চলেছিল। এতে যেমন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করেছিল তেমনি অপরদিকে ধনী ও জমিদাররা বাদ যায়নি।

টনির Thesis-এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছেন অধ্যাপক ট্রেভার রোপার।

(ক) তিনি মনে করেন না যে নব জাগ্রত পিউরিটানিজমের সঙ্গে ক্যাপিটালিজমের সমীকরণ সঠিক।

(খ) তিনি এটা মনে করেন না যে যুদ্ধের পূর্বে এই জেন্ট্রি শ্রেণীর উত্থান হয়েছিল। অপরদিকে তিনি কতগুলি উদিাহরণ দিয়ে দেখান যে এক শ্রেণীর জমিদারদের উত্থান নয় বরং পতন শুরু হয়েছি। ট্রেভার রোপার ক্রমওয়েলকে একজন 'ক্ষীয়মান ভদ্রলোক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "The great rebellion was not the clear headed self-assertion of he rising bourgeoisie

and the gentry but rather the blind protest of the depressed gentry." তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, জেন্ট্রিদের একাংশ বা mee gentry অন্য এক ধরনের court gentry-দের বিরোধিতা করে ও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। অধ্যাপক রোপার এই mere gentry-দের Round heads-দের সঙ্গে এবং court gentry-দের Cavalier সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অধ্যাপক ক্রিস্টোফার হিল বলেছেন যদি আমরা ক্রমওয়েলের মত Independent কে declining gentlemen-এর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে বোধহয় গৃহযুদ্ধের প্রকৃত চরিত্র পাওয়া যাবে না। কারণ যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন ওয়েস্টমিনিস্টারের নেতৃত্বে Independent-দের হাতে ছিল না। বরং ওয়ারউইক এসেক্স, হ্যাম্পডেন প্রমুখ পিয়ারদের হাতে তা ছিল। হিলের মতে, Independent রা যুদ্ধ জয়ের বড় হাতিয়ার হলেও তারা গৃহযুদ্ধ শুরু করেনি।

কিন্তু আধুনিক গবেষকরা গৃহযুদ্ধের অর্থনৈতিক বক্ত্র্যাখ্যার ওপর অত্যধিছক গুরুত্ব আরোপ মেনে নিতে পারেননি। ওদের মতে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড কখনোই পরিষ্কারভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত হয়নি। উভয়পক্ষই ব্যবহারজীবি, 'country gentlemen' এবং 'Universit graduate-দের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। এমনকি ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। কেবলমাত্র সমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ব্রানটন ও পেনিংটন পার্লামেন্টের সদস্যদের Family, Local, Economic এবং Patronage এর উপর ভিত্তি করে নানাভাবে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু তাদের মতে, এই প্রতিটি গ্রূপ কোন বিশেষ আদর্শ ও নীতরি দ্বারা একতাবদ্ধ ছিল না। সুতরাং তাদের মতে, গৃহযুদ্ধকে কখনোই শ্রেণীসংগ্রাম বলা যায় না।

অধ্যাপক হিল, ব্রন্টন ও পেনিংটন-এর বক্তব্যের প্রতিয়বাদ করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে লতাদের বিশ্লেষণের মদ্যেই দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের সদস্যদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাঁর মতে ব্রান্টন ও পেনিংটন landed এবং mercantile interest-এর মধ্যে পার্থক্য দেখাননি।

আসলে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক পার্থক্য। কারণ একদিকে ধনী ও সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল এবং অন্যদিকে উচ্চশ্রেণী ও জমিদার যারা রাজাকে সমর্থন করেছিল এবং এই দুই এর সংঘাতেই গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

হিল, ব্রানটন ও পেনিংটন-এর সমালোচনা করে বলেছেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক বিভাজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ তাঁর মতে, ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল এবং রতারা পার্লামেন্টেরীয়দের সমর্থক ছিল। তুলনায় উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল আর্থিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল এবং তারা Royalist দের সমর্থন করত। তবে হিল এবং ব্রান্টন ও পেনিংটন সকলেই একমত যে পার্লামেন্টের সদস্যরা গোষ্ঠীবদল করত। দেখা গেছে অনক সদস্য যারা প্রথমে রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তারাই পরে Royalist-দলে যোগদান করেছিল।

এর মধ্যে আমরা হিল এ মতামতকেই গুরুত্ব দিতে পারি। হিল বলেছেন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পার্থক্য গৃহযুদ্ধের মূলে ছিল। তিনি মনে করেন, ধমী ও সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টকে সমর্থন করেছিল এবং উচ্চশ্রেণী ও জমিদার শ্রেণী যারা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল না তারা রাজাকে সমর্থন করেছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক পার্থক্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

প্রশ্ন

১। ১৬৪২ খ্রীঃ ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের মূল বিতর্কগুলি কি?
২। ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের সম্পর্কে ক্রিস্টোফার হিল এর বক্তব্য কী?

১.৬.১৫.৩ ঃ হেনরী পিরেন বিতর্ক

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান জগৎ, ইসলামীয় সাম্রাজ্য এবং ক্যারোলিঞ্জিয় রাজ্যের বিকাশের উপর আরবদের সম্প্রসারণের প্রভাব সম্পর্কে বেলজিয়ান ঐতিহাসিক হেনরী পিরেনের অভিমত ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। 'Medieval Cities' নামক গ্রন্থে পিরেন-এর মতবা প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর 'Muhammad And Charlemagne' গ্রন্থে তাঁর সিদ্ধান্ত তত্য ও পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত হয়। তাঁর বক্তব্য ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজকে বিস্মিত করেছিল। হেনরী পিরেনোর মূল বক্তব্য হল ঃ খ্রীষ্টীয় চতুথ৪ ও পঞ্চম শতকে বর্বরজাতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক যে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি, তা সপ্তম শতকে ইসলামর শক্তির অসামান্য বিস্তারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। পরোক্ষভাবে ইসলামই ছিল ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ।

পিরেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের মধ্যে ভেদরেখাকে কৃত্রিম ও অবান্তর বলে মনে করতেন। তঁ—ার পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনকে প্রাচীন ইউরোপের ইতিহাসের ছেদ চিহ্ন বলে মনে করতেন। পিরেন এই মত মেন নেননি। তাঁর মতে, বর্বর আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের আয়তদন হ্রাস পেলেও তার রাষ্ট্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়নি। রোমান সব্যতা ও সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষত থাকে। বৃদ্ধি পায় ভূমধ্যসাগরের উপর নির্ভরতা। ভূমধ্যসাগরের আমদানী বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। রোমানদের জীবনে বর্বরদের রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ ঘটলে তাদের সাময়িক জয়ের ফলে জার্মান সংস্কৃতি রোমান সংস্কৃতির স্থান দখল করতে পারেনি। রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ৪৭৬ খ্রীঃ থেকে ফ্রাঙ্কশাসক শার্লামেনের আবির্ভাব পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক ইতিহাসের মধ্যে কোন ছেদ হেনরী পিরেন দেখতে পাননি। মেরোভিঞ্জিয়ান আমলে আগের মতই প্রাচ্য দেশগুলর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন অব্যাহত ছিল। হেনরী পিরেন মনে করেন, বর্বর আক্রমণের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক জগতের শ্রী ও সমৃদ্ধি হ্রাস করলেও কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা বাণিজ্যের অপমৃত্যু ঘটেনি। বর্বর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী নগরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বেশিরভাগ নগরের সজীবতা বজায় ছিল। নগরগুলির পৌর চরিত্র বিনষ্ট হয়নি। পিরেন পরবর্তীকালের নগরগুলিতেও রোমান নামে অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন।

পিরেন মনে করেন, বর্বর আক্রণ সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার অব্যাহত গতি কেবলমাত্র সপ্তম শতকে ইসলামীয় শক্তির অভিঘাতে স্তব্ধ হয়ে যায়। ইসলামের দিগ্বিজয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চীন সাগর থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত ভূভাগে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় অপ্রতিহত গতিতে। মুসলমানদের অকস্মাৎ আক্রমণ ও অভূতপূর্ব সাফল্যে ইউরোপের ইতিহাসের ধ্রুপদী অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হয়। রোমান আইএনর জায়গা দখল করল মুসলমান আইনকানুন। গ্রীক ও লাতিনের স্থান অধিকার করল আরবী। সুদীর্ঘকালের রোমন প্রভাবাধীন ভূমদ্যসাগর 'মুসলমান হ্রদে' পরিণত

হল। ভূমধ্যসাগরের উপকূলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৬৫০ খ্রীঃ থেকে আরবদের হস্তগত হবার ফলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে পশ্চিম ইউরেপের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পিরেন মনে করেন, অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপের বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপ হয়ে পড়েছিল নিঃসঙ্গ অবরুদ্ধ। পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু ভূমধ্যসাগর থেকে সরে গেল উত্তর ইউরোপে। রোমের জায়গা দখল করল আখেন। বহু শতাব্দীর পুরানো সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ছিন হল পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। হেনরী পিরেন মনে করেন, এভাবেই ইউরোপে ধ্রুপদী যুগের অবসান ঘটেছিল এবং মধ্যযুগ শুরু হয়েছিল।

ঐতিহাসিক পিরেন-এর মতে, ক্যারোলিঞ্জিয় অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনাই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মুসলমান শক্তির বিস্তারের প্রতিক্রিয়া মাত্র। ইসলামের বিজয় ক্যারোলিঞ্জিয় ফ্রাঙ্কদের ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হতে সাহায্য করেছিল। যে ফ্রাঙ্করা এতদিন লাতিন ইউরোপে অনুজ্জ্বল ভূমিকায় ছিল, তারা ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে আসার সুযোগ পেল। ইসলামীর অভিঘাতে সৃষ্ট ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শূন্যতা পূর্ণ করা ও ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব ফ্রাঙ্কদেরই নিতে হয়েছিল। ভূমদ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের বিচ্ছিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমী সভ্যতার অশিষ্টকে কেন্দ্র করে রোমে এক নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম হয়। সৃষ্টি হয় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের যা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবমুক্ত। সুতরাং পরোক্ষভাবে মুসলমানগণই ছিল ফ্রাঙ্ক রাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ। অর্থাৎ ''মহম্মদই শার্লামেনকে সম্রাট করেছিলেন''। পিরেন মনে করেন, ইসলামী আক্রমণের ফলেই অষ্টম শতংকের শুরুতে প্রাচ্যের বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে পশ্চিম ইউরোপ অবরুদ্ধ হয়। এই অবরুদ্ধ অর্থনীতির ফলে উদ্ভব হয় সামন্ততন্ত্রের । পিরেন-এর মতে শার্লামেন সামন্ততন্ত্রের ফল। এ প্রসঙ্গে পিরেনের বিখ্যাত মন্তব্যটি স্মরণীয়— "Without Islam, the Frankish Empire would probably never have existed and Charlemagne without Muhammad would be inconceivable." তাঁর মতে, কতকগুলি অর্থনৈতিক কারণ এবং ঘটনাবলী এই দুই ব্যক্তির জীবনকে যুক্ত করেছিল। পিরেন-এর সব শেষ বক্তব্য হল — সকল ক্ষেত্রেই শার্লামেনের যুগকে পুনরুজ্জীবনের যুগ বলে মেনে নেওয়া হলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধারণা সঠিক নয়।

মধ্যযুগে খ্রীষ্টান জগৎ, ইসলামীয় সাম্রাজ্য এবং ক্যারালিঞ্জিয় রাজ্যের বিকাশের উপর আরবদের সম্প্রসারণের প্রভাব সম্পর্কে হেনরী পিরেনের বক্তব্য হল ঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে বর্বরজাতির আক্রমণে পশ্চিম ইউরোপের ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক যে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি, তা সপ্তম শতকে ইসলামের শক্তির অসামান্য বিস্তারে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আসলে পরোক্ষভাবে ইসলামই ছিল ফ্রাঙ্করাজ শার্লামেনের সম্রাটের মর্যাদায় ভূষিত হবার মূল কারণ।

হেনরী পিরেনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকই তা গ্রহণ করতে রাজী নন। আধুনিক গবেষণা বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের পিরেন-এর মত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলেই জন্মলাভ করেছে পিরেন বিতর্ক।

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক আর. এইচ. সি. ডেভিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে মুসলমান আক্রমণের আগেই ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের অবনতি দেখা দিয়েছিল। তাঁর মতে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য চার শতক ধরে হ্রাস পেতে থাকে এবং সপ্তম শতকের শেষে তা চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য ডেভিস মনে করেন যে মুসলমান আক্রমণই এই বাণিজ্যিক পতনের জন্য দায়ী করা সমীচীন হবে না।

দ্বিতীয়তঃ, রবার্ট লোপেজ ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকে কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের অন্তর্হিত হওয়া সম্পর্কে পিরেনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। লোপেজের মতে, পিরেন কর্তৃক উল্লিখিত চারটি অন্তর্হিত হওয়া দ্রব্যের মধ্যে তিনটি—স্বর্ণমুদ্রা, বস্ত্র ও প্যাপিরাসের উপর মেরেভিঞ্জিয়ান সরকারের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ছিল। পিরেন বলেছেন, আরবরা ৬৩৯ খ্রীঃ থেকে ৬৪২ খ্রীঃ এর মধ্যে মিশর অধিকার করে এবং একমাত্র মিশরেই প্যাপিরাস তৈরী হত। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে লোপেজ দেখিয়েছেন যে ৬৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত মেরোভিঞ্জিয়ান চ্যান্সারিতে সরকারী কাজে প্যাপিরাস ব্যবহৃত হত।

তৃতীয়তঃ, ড্যানিয়েল সি, ডেনেট ও এ্যান রাইসিং যুক্তি দেখিয়েছেন যে সপ্তম অথবা অষ্টম শতকে আরবদের ভূমধ্যসাগর বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল এবং তারা ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্য থেকে পশ্চিমকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এমন কোন প্রমাণ নেই।

চতুর্থতঃ, ডেভিস প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি ধরেও নেওয়া হয় যে অষ্টম শতকের প্রথমে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য হয়েছিল, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই প্রমাণ কি আছে যে মুসলমান আক্রমণের ফলেই এই বাণিজ্য বন্ধ হয়েছিল?

সুতরাং, হেনরী পিরেন-এর 'catastrophic' বা 'আকস্মিক বিপর্যয়'-এর তত্ত্বটি মেনে নেওয়া কঠিন। আরবদের অতর্কিত আক্রমণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ধ্বংস হয়নি। পিরেন যতটা অনুমান করেছিলেন মহম্মদ-এর জীবন ইউরোপের ঘটনাবলীকে ততটা প্রভাবিত করেনি। তবুও একথা বলা যায় যে, যদিও পশ্চিমী বাণিজ্যের আকস্মিক বন্ধ হওয়ায় ঘটনাটি অতিরঞ্জিত তবুও আগের তুলনায় অষ্টম ও নবম শতকে যে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল সেদিকে পিরেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রশ্ন

১। হেনরী পিরেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপেই ইতিহাসের মধ্যে ভেদরেখাকে দ্বিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

২। হেনরী পিরেন কোন দেশের ইতিহাসিক এবং তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম লেখ।

১.৬.১৫.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

1. অমলেশ ত্রিপাঠী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
2. Arthur Marwick : The Nature of History
3. Albert Soboul : Understanding the French Revolution
4. g. M. Trevelyan : English Social History
5. D. H. Pennington : Seventeenth Century Europe
6. L. W. Owie : Seventeenth Century Europe.
7. Sumit Sarkar : Modern India
8. R. C. Majumdar : The sepoy Mutiny and The Redvolt of 1857
9. The Cambridge Economic History fo Europe.

১.৬.১৫.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. Analyse the debate among historians on the nature of the Civil War in England.
2. Do you think that the civil War in England was a 'Puritan Revolution'?
3. 'Charlemagne without Muhammed would be inconceivable'—Do you agree with this view of H. Pirenne.
4. Evaluate the importance of Pirenne Thesis.

একক ১৬

Economic History

বিন্যাস ক্রম ঃ

১.৬.১৬.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

১.৬.১৬.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং তার প্রকৃতি

১.৬.১৬.২ ঃ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ—যুগ সন্ধিক্ষণের বিতর্ক

১.৬.১৬.২.১ ঃ মরিস ডব ও পল সুইজি

১.৬.১৬.২.২ ঃ মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার

১.৬.১৬.৩ ঃ ফরাসী বিপ্লব কি বুর্জোয়া বিপ্লব?

১.৬.১৬.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

১.৬.১৬.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

১.৬.১৬.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক বিতর্ক সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থনৈতিক ইতিহাস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে। সাম্প্রতিক কালে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলিতে অর্থনৈতিক ইতিহাস কিভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে — তা শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি এই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস পাঠ করে শিক্ষার্থী দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক যথা ঃ (১) সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এবং (২) ফরাসী বিপ্লব একটি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল কিনা সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কগুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে।

১.৬.১৬.১ ঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং তার প্রকৃতি

অর্থনৈতিক ইতিহাস মূলত অর্থনৈতিক এবং অতীতে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত চর্চা। প্রধানত ঐতিহাসিক পদ্ধতি, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বের একত্রে প্রয়োগে এই ধরনের ইতিহাসের আলোচনা সংঘটিত হয়। বর্তমান সময়কালের ঐতিহাসিক আলোচনায় অর্থনৈতিক ইতিহাস অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস ছাড়া আধুনিক ইতিহাসের আলোচনায় মূল্যহীন। সামাজিক ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে মূলত আর্থিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাস, জনসংখ্যাগত এবং শ্রমিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধীনস্থ। উল্লেখ্য অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত চর্চা 'Cliometrics' নামেও পরিচিত।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে জার্মানিতে Gustav Von Schmoller এর অধীনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এক নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী Historical School of Economic History) গড়ে তোলেন। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা পরিমাণগত এবং গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করেছিলেন। সমগ্র বিংশ শতক জুড়ে তাদের আলোচনায় প্রধানত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পেয়েছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসার ঘটান William Ashle (1860-1927)। ব্রিটেনে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক George Unwin। ফ্রান্সে অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রসারিত হয়েছিল অ্যানাল ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর দ্বারা। প্রধানত 'Annales', 'Histoire', 'Sciences Sociales' ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসার ঘটান।

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি বহুল চর্চিত বিষয়। প্রধানত কৃষিজীবি এবং বাণিজ্যিক সমাজ থেকে ভারত কিভাবে শিল্পোন্নত তথা মিশ্র অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হল, তা অর্থনৈতিক ইতহাসের মূল বিষয়বস্তু। হরপ্পা সভ্যতার (৩৩০০-১৫০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে) বাণিজ্য, ষোড়শ মহাজনপদের সময়কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাণিজ্য, নগরায়ণের বিকাশ, ৩০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে মৌর্য যুগের কৃষি ও বাণিজ্যের মেলবন্ধনে এক অভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দিল্লী সুলতানি যুগের ইকতা, রাজস্ব ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরীক্ষ-নিরীক্ষা, এরপর মুঘল যুগের রাজস্ব ব্যবস্থা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, বাণিজ্য, সম্পদের নির্গমন, অবশিল্পায়ন, রেলপথের প্রসার, কৃষির বাণিজ্যকরণ দেশীয় শিল্পের প্রসার ইত্যাদি ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু। ডি. ডি. কোশাম্বী, রোমিলা থাপার, ডি. এন. ঝাঁ, ঈশ্বরী প্রসাদ, ইরফান হাবিব, সুমিত সরকার, রজনীপাম দত্ত, অমিয় বাগচী, তীর্থঙ্কর রায়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখ ভারতীয় ঐতিহাসিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা আলোচনা করেছেন।

সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চায় ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাস সংক্রান্ত বিতর্ক বরাবরই আকর্ষণীয় এবং ইতিহাসচর্চাকে তা বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণত নিত্যনতুন ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদঘাটনে আলোচনা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিতর্কগুলিতে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণত এই বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসে গতিপ্রকৃতি নির্ধারণকারী অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কারণ সেগুলি ইতিহাসে খুবই প্রাসঙ্গিক। এদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব, ইউরোপে সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ এবং ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়া প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি আলোচনা করা হবে।

১.৬.১৬.২ ঃ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ — যুগ সন্ধিক্ষণের বিতর্ক

অর্থনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক — যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহাসিকেরা একটি বিষয়ে একমত হয়েছন। এটি হল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সামন্ততন্ত্র তীব্র হয়ে উঠেছিল। তবে ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতন দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। উল্লেখ্য এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা

একমত হলেও এর পতনের কারণ সম্পর্কে তাঁরা একমত হতে পারেননি। কারণ এটি শুধু এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবসানই নয়, বরং এর সঙ্গে অপর একটি যুগ ব্যবস্থার উত্থানের প্রশ্নও জড়িত আছে। যা ধনতন্ত্র নামে পরিচিত। এই রূপান্তরের ঘটনা এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে বিংশ শতকের গোড়ায় এক বিতর্ক দেখা দেয় — যা 'যুগসন্ধিক্ষণের বিতর্ক' বা 'Transition debate' নামে পরিচিত। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের হাত ধরে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের প্রথাকে, তার পদ্ধতিকে, এবং নিয়মপ্রণালীকে ঘিরে পণ্ডিত মহলে প্রচুর মতামত আছে। তিনপ্রকার গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমতঃ ডব-সুইজি; দ্বিতীয়ত ঃ মাইকেল পস্টান ও বরার্ট ব্রেনার এবং তৃতীয়তঃ হবসবম—ট্রেভর — রোপার। এক্ষেত্রে প্রথম দুটি বিতর্ক বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

১.৬.১৬.২.১ ঃ মরিস ডব ও পল সুইজি

ব্রিটিশ মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ মরিস ডব ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'Studies in the Development of Capitalism' গ্রন্থে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও তার পতন সম্পর্কে দুটি অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভরকেন্দ্র ভূমিদাস প্রথার অবসানই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের সূচক। দ্বিতীয়তঃ সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের জন্য দায়ী ছিল সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় নিহিত অন্তর্বিরোধ। মূলত ডবের আলোচনায় সামন্ততন্ত্রের পতন উৎপাদন সম্পর্কের বা Production relation-এর মধ্যেই নিহিত ছিল।

ডবের মতে, দশম শতাব্দীতে কৃষি নির্ভর ইউরোপীয় অর্থনীতিতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষ স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির চাপে সামন্তপ্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে ভূমিদাসে পরিণত হয়। প্রতিটি সামন্তপ্রভুর অধীনস্ত এলাকা বা ম্যানর-এ বসবাসকারী ভূমিদাস বা সার্ফরা জমির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে গণ্য হত। এই ভূমিদাস প্রথাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি ম্যানরে যা উৎপন্ন হত তা ম্যানরেই সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে যেত। ম্যানরের বাইরে বা বাজারে কেনাবেচার কোনো উদ্দেশ্যে উৎপাদনের কোনো তাগিদ ছিল না। তাই সামগ্রিকভাবে এই ধরনের অর্থনীতিকে বলা হত Economy of no outless।

কিন্তু সাধারণত ম্যানরে ব্যবহার হয় এমন অধিকাংশ বস্তু ম্যানরে প্রস্তুত হলেও কিছু দৈনন্দিন জিনিসপত্র যেমন— নুন, মশলা ইত্যাদি ম্যানরের বাইরে থেকে আনতে হত। —যা যোগান দিত বণিকেরা। ম্যানরের দুষ্প্রাপ্য পণ্যের পরিবর্তে এঁরা ম্যানর থেকে শস্য এবং খাদ্য বা পণ্যদ্রব্য নিময়ে নগরবাসীদের চাহিদা মেটাতেন। একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে ইউরোপীয় দুরবাণিজ্যের প্রসার ঘটলে এই বণিকেরা সুদূর এশিয়া থেকে আমদানি করা পণ্যদ্রব্য (যেমন — মশলা, রেশম, মসলিন, ধূপ ইত্যাদি) ইউরোপের প্রায় সর্বত্র পৌঁছে দেন। ইউরোপের এক প্রান্তের জিনিস (যেমন উত্তর ইউরোপের পশম, পশুচামড়া, ফরাসি মদ) অন্য প্রান্তের বাজারে পৌঁছাতে থাকে।

তবে ডবের মতে, উন্মুক্ত বাণিজ্যিক দিগন্তই সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ নয়। তাঁর মতে, বণিকদের দ্বারা ম্যানরের বাইরে থেকে আনীত নতুন নতুন এবং মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য সামন্তপ্রভুরা প্রজাদের উপর বাড়তি কর চাপাতে থাকেন। পশ্চিম ইউরোপের বাড়তি করের চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেক সময় ভূমিদাস ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী নগরাঞ্চলে বা জঙ্গলে গা ঢাকা দিত। ভূমিদাস প্রথার আইন অনুসারে কোনো ভূমিদাস যদি পালিয়ে গিয়ে একবছর গা ঢাকা দিতে সফল হত, তবে সে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। এহেন পরিস্থিতিতে সামন্তপ্রভুরা তাদের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে খাজনা শস্যের বদলে নগদে চাইতে শুরু

করে। একে বলে 'খাজনা নগদীকরণ'। ডবের মতে, এটিই ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের সূচক। কারণ নগদীকরণের পরে সামন্তপ্রভুদের উৎপাদনের উপর পূর্ববৎ নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। ইতিমধ্যে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে প্রজারা ম্যানরের বাইরে বাজারের জন্য উৎপাদন করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ডব বলেছেন, 'there sems, in fact, to be as much evidence that the growth of money economy per se led to an intensification of serfdom as there is evidence that it was the cause of the feudal decline.'

ডবের মতে, মামুলি প্রযুক্তি, সাধারণ উৎপাদনের সাধন দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন বিশাল বৃদ্ধি করা সম্ভব ছিল না বলেই ভূমিদাসরা পালাতে চেয়েছিল। পক্ষান্তরে সামন্তপ্রভুরাও উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে চাহিদা এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যা সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মেটানো সম্ভবপর ছিল না। চাহিদা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিরোধকেই ডব সামন্ততন্ত্রের 'অন্তর্বিরোধ' (Internal Contradiction) বলেছিলেন। ডবের মতে, যেসব ভূমিদাসরা পালাতে পারত না, তাদের পুরানো ব্যবস্থার ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অতিরিক্ত শ্রম দিতে হত। এছাড়া তাদের সংখ্যাও খুব অল্প ছিল। এই পরিস্থিতিই সামন্তপ্রভুদের কিছু কিছু উপযোগী উপায় যেমন—শ্রমের নগদ মজুরী, ভাড়াটিয়া কৃষকদের (Tenant farmers) খাসজমি লিজ দেওয়া প্রভৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল—এটিই শেষ পর্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ পল সুইজি ডবের এই অন্তবিরোধের তত্ত্ব মানেন না। সুইজির দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্রের অবসানে ইউরোপীয় অর্থনীতিতে দূরবাণিজ্যের প্রসারই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। ১৯৫০ সালে 'Science and Society' নামক পত্রিকায় সুইজি 'Feudalism : A Critique' প্রবন্ধে বলেছেন, একাদশ শতকের শেষ লগ্ন থেকে পৃথকভাবে ভূ-মধ্যসাগরীয় এবং উত্তর সাগরীয় বাণিজ্য বাড়তে থাকার ফলে পশ্চিম ইউরোপের নগরজীবন জঙ্গম হয়ে উঠতে শুরু করে। ধর্মযুদ্ধ এবং ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকা খ্রিষ্টীয় চেতনা ইউরোপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে ইতালিয় বণিকেরা ভূ-মধ্যসাগরীয় এশিয়া এবং আফ্রিকার পণ্যসম্ভার নিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপে প্রবেশ করতে থাকেন। ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স, রাইনল্যাণ্ড প্রমুখ অঞ্চলে বণিকদের সঙ্গে এই ইতালিয় বণিকদের বাৎসরিক মিলন ক্ষেত্র ছিল শম্পান (Champagne) মেলা। এই আন্তঃ ইউরোপীয় বাণিজ্য পথকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-মধ্য ইউরোপের অসংখ্য নতুন নগরের পত্তন হয় বা ক্ষয়িষ্ণু বহু নগর পুনর্জীবন লাভ করে।

সুইজির মতে, এই নগরায়ণের প্রক্রিয়া ছিল সামন্ততন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ। এই সময় নগরবাসীদের চাহিদা এবং ক্রয়ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে। নগরাঞ্চলে ম্যানরের উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের (শস্য, সবজি ইত্যাদি) চাহিদা বাড়ার কারণে নগদীকরণ প্রক্রিয়াও কার্যকরী হয়েছিল। অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ পলায়নোন্মুখ প্রজারা পশিচম ইউরোপের নগরাঞ্চলে আশ্রয় নিলে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এর ফলে ইউরোপীয় শিল্পক্ষেত্রও আয়তন বাড়তে থাকে। উৎপাদন এই সময় ক্রমশ বাজারমুখী হয়ে পড়লে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে অবসান ঘটে সামন্ততন্ত্রের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'It seems to me that the important conflict in this connection is nor between "money economy" and "natural economy" but between production for the market and production for use." যদিও তিনি বলেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতনে অর্থনীতির বাণিজ্যকরণ ছিল এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

১.৬.১৬.২.২ ঃ মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার

সমসাময়িক ইতিহাসবিদ মাইকেল পস্টান উভয়ের উপরোক্ত মতামত মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে, ইতিহাসের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের মূল ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদি তারতম্যে। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষবিন্দু এবং অবসানের আলোচনাতেও মাইকেল পস্টান তাঁর জনসংখ্যা-বিষয়ক (demographic) তত্ত্বের অবতারণা করে দেখান যে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্কট তাঁর কাঠামোতে নিহিত ছিল না। তা ছিল সামন্ত সমাজের আয়তন এবং শক্তি বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

পস্টান বলেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে খদ্যের চাহিদাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু কৃষির উৎপাদনশীলতা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। এই পরিস্থিতিতে পূর্বের পতিত জমিগুলি তখন চাষ করা শুরু হয়। কৃষিজমির উপর চাপ বাড়তে থাকায় জমির উর্বরতা কমতে থাকে। পরিণামে খাদ্যমূল্য বাড়তে থাকে এবং সামন্তপ্রভুরা তাদের খাজনার পরিমাণ বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জমি ব্যবহারের বিনিময়ে ভূমিদাসের প্রদত্ত খাজনা নির্দিষ্ট থাকার ফলে সামন্তপ্রভুরা অন্যান্য খাতে বাড়তি খাজনা আদায় করতে সচেষ্ট হন। যেমন — অন্যান্য ধরনের জরিমানা, কর (taillage), সামন্তপ্রভুর জমিতে বাড়তি শ্রম (Labor Services)। জনসংখ্যা এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবনধারণের স্বার্থে কৃষিজীবী শ্রেণী সামন্তপ্রভুর উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শ্রমজীবী এবং জমির তুলনামূলক চাহিদা যোগানের নিরিখে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামন্তপ্রভুর অনুকূলে চলে যায়।

পস্টান এই মতামত তুলে ধরেন যে, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটেছিল জনসংখ্যাগত কারণেই। কৃষির উপর চাপ বৃদ্ধির কারণে জমির উর্বরতা হ্রাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতির কারণে ব্যাপক হারে জনসংখ্যায় হ্রাস পেতে শুরু করে। ফলস্বরূপ শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগানের তুলনায় বেশি হতে থাকে। চাষের কাজে প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হারাবার আশঙ্কায় সামন্তপ্রভুরা খাজনার ভার কমানো ছাড়াও কৃষিজীবীদের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতেই খাজনার নগদীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রশস্ত হয় কৃষিজীবীর স্বাধীনতরা ক্ষেত্র। দুর্বল হতে থাকে ভূমিদাসপ্রথা এবং সামন্ততন্ত্র।

অপর একজন ব্রিটিশ মার্কসীয় ইতিহাসবিদ রবার্ট ব্রেনার সামন্ততন্ত্রের পতন এবং ধনতন্ত্রের উত্থানের পথ ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে 'Past and present' পত্রিকায় ব্রেনার তাঁর 'Agrarian class structure and Economic Development in pre-industrial Europe' প্রবন্ধে 'বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্ব' এবং 'জনসংখ্যা তত্ত্ব'র মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের পতনের যুক্তি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। বাণিজ্যিকীকরণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, পশ্চিম ইউরোপের মত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও বাণিজ্য বিপ্লব সামন্তপ্রভুদের চাহিদা বৃদ্ধি করেছিল। ফলে খাজনার নগদীকরণের ক্ষেত্র উপস্থিত ছিল। বাণিজ্যের পরিমাণ এতটা কম ছিল না যে, পূর্ব ইউরোপে নগরায়ণ সম্ভবপর হত না। ব্রেনার প্রশ্ন তুলেছেন যে, পূর্ব ইউরোপে তাহলে পশ্চিম ইউরোপের মত পরিবর্তন হল না কেন? অন্যদিকে জনসংখ্যা বিষয়ক বক্তব্য তুলে ধরে ব্রেনার আরো প্রশ্ন করেন যে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের দুটি দিকেই জনসংখ্যা বেড়েছিল, এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে দু'দিকেই জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। তাঁর মতে, একই ঘটনা পরম্পরার দুটি পৃথক পরিণত হবার কারণ কি?

ব্রেনার মনে করেন যে, সামন্ততন্ত্রের পতন সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় রাজনীতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাঁর মতে রাজনীতিক শক্তি সমাজের অর্থনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এবং অনেক ক্ষেত্রে সমাজের আর্থ-সামাজিক চরিত্র নির্ধারণে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস খুব প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে থাকে। ব্রেনার বলেন যে, পশ্চিম এবং পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাস একরকম ছিল না। সামন্ততন্ত্রের শীর্ষ বিন্দুতেও পশিচম ইউরোপে (বিশেষত—ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চল, নেদারল্যান্ডস) রাজশক্তি এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষ তীব্র হয়। রাজশক্তি কোথাও সামন্ত শ্রেষ্ঠ হিসাবে (যেমন — ফ্রান্স) বা দেবাধিকার প্রাপ্ত শক্তি হিসাবে (যেমন— জার্মান শাসনাধীন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য) রাজন্যবর্গের বা অভিজাতবর্গের মোকাবিলা করতে উদ্যোগী হয়। এর জন্য রাজাকে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হয় এবং তার সাধন যোগান দিতে পারত একমাত্র কৃষিজীবী মানুষ। তাই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর রাজশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় ছিল রাজকীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামন্তপ্রভুর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে রাখা। ঠিক এই কারণেই পশ্চিম ইউরোপে ভূমিদাসত্বের তীব্রতম পরিস্থিতিতেও ভূমিদাসদের ন্যূনতম কিছু অধিকার ছিল যা সামন্ত প্রভুরাও লঙ্ঘন করতে পারত না। এছাড়া জনসংখ্যার চাপে অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনার ব্যাপারে এবং নতুন বসতি পত্তনের ক্ষেত্রে এই কৃষিজীবীরা সামন্তপ্রভুদের অধিকার আরও সীমিত রাখতে সফল হয়। ফলে রাজশক্তি এবং প্রজাবর্গের মিলিত চাপে সামন্তপ্রভুরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা দেয় খাজনার নগদীকরণ, ভূমিদাস প্রথার অবসান এবং সামন্ততন্ত্রের পতন।

অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বাদ দিলে রাষ্ট্রশক্তি বলতে কিছু ছিল না। ফলে সামন্তশক্তির হাতেই সামগ্রিক নিরাপত্তার ভার ন্যস্ত থাকার ফলে বণিকরা এই অঞ্চলে সম্পূর্ণত সামন্তশক্তির মুখাপেক্ষা হয়ে বাণিজ্য চালাত এবং এ থেকে লাভবান হয়েছিল শুধু সামন্ত শ্রেণী। এই কারণে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও রাজনৈতিক শক্তির বিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই পূর্ব ইউরোপে সামন্ততন্ত্র আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে বলে মনে করতেন রবার্ট ব্রেনার।

উক্ত ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও মার্ক ব্লখ, রোদনী হিলটন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা সামন্ততন্ত্রের পতনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, চতুর্দশ শতকেই সামন্ততন্ত্রের পতন তরান্বিত হয়। কারণ চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপের অর্থনীতি এক সঙ্কটের মুখোমুখি হয় যা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূর করে ধনতন্ত্রের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১.৬.১৬.৩ ঃ ফরাসী বিপ্লব কি বুর্জোয়া বিপ্লব?

১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত ফ্রান্সের ফরাসী বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরির্তনের সূচনা করেছিল। মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকারভোগী শ্রেণীর (যাজক ও অভিজাত) বিরদ্ধে অধিকারহীন শ্রেণীর (বুর্জোয়া, কৃষক, শ্রমিক, সাঁকুলেৎ প্রভৃতি) এই বিপ্লব ফ্রান্সে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সূচনা করেছিল। 'তৃতীয় এস্টেট' (অধিকারহীন) নিজেকে জাতীয় সভা হিসাবে ঘোষণা

করে রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরোধিতা করেছিল। 'সাংবিধানিক সভা' ১৭৮৯ সালের ২৬শে আগস্ট 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা' (Declaration of the Right of Man and Citizen) করে সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করে।

জাতীয় সভা ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার কাজে ব্রতী হলে এই সভা সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়। সংবিধান সভা ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে সংবিধান রচনার কাজ আরম্ভ করেছিল, ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তা শেষ হয়।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ইতিহাসের যে বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, তা হল ফরাসী বিপ্লবের চরিত্র বা প্রকৃতি নির্ণয় করা। উল্লেখ্য অর্থসঙ্কটে অসহায় এবং অভিজাত বিদ্রোহে ভীত ফরাসী রাজ ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অধিকারহীন তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছিল ধনী ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও চাকুরীজীবী বুর্জোয়ারা। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতেই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

ষোড়শ লুই জাতীয় সভা ডাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকে জাতীয় সভা সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব ও অভিযোগগুলি জানাতে কেহিয়ার্স বা আবেদন পত্র পাঠাতে বলেন। উল্লেখ্য তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষ থেকে যে কেহিয়ার্সগুলি আসে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই কেহিয়ার্সগুলি রচনার সময় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিরাই প্রধান ভূমিকা নেয়। ঐতিহাসিক কোব্বানের মতে, শহুরে অধিবাসীদের কেহিয়ার্সে স্বচ্ছল কৃষকদের অভিমত প্রতিধ্বনিত হয়। কেহিয়ার্সগুলিতে জমি বন্টনের দাবী ছিল না। লাফায়েৎ বা মিরাব্যু (বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ) সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন না। প্রধানত অপ্রতিহত স্বৈরতন্ত্র থেকেই বুর্জোয়া শ্রেণী মুক্তি চেয়েছিল। অর্থবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর বুর্জোয়ারা পুরানো ব্যবস্থায় নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের বাধাকে সরাতে চেয়েছিলেন।

জাতীয় সভার অধিবেশন বসলে দেখা যায় এই সভার ১২১৪ জন মোট সদস্যদের মধ্যে যাজক ও অভিজাতদের মোট সদস্য ছিল ৫৯৩ জন এবং তৃতীয় শ্রেণীর সদস্য ছিল ৬২১ জন। তৃতীয় শ্রেণীর পক্ষে প্রধানত বুর্জোয়ারাই নির্বাচিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যদের মধ্যে আইনজীবী ছিল ২০%, চাকুরিজীবি ৫%, বণিক ও শিল্পপতি ছিল ১৩%, কৃষকের প্রতিনিধি ছিল ৭-৯%। ইতিমধ্যে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের প্রচার ও যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেশ কিছু যাজক ও কিছু অভিজাত নিজ নিজ শ্রেণী ত্যাগ করে বুর্জোয়া সদস্যদের সঙ্গে যোগ দেয়।

একদিক থেকে এই বিদ্রোহকে 'বিপ্লব' বলা যায়। কারণ অভিজাত ও যাজক এই দুই সুবিধাভোগী শ্রেণীর চিরাচরিত বৈষম্যমূলক অধিকার নাশ করার কাজে বুর্জোয়া শ্রেণী সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল। যদি শ্রেণীসংগ্রামকে 'বিপ্লব' বলা হয়, তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই সংগ্রাম ছিল বিপ্লব। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতারা যে বিপ্লবী সংবিধান রচনা করে তা সামন্তপ্রথার মৃত্যু ঘণ্টা বাজায়। বুর্জোয়া বিপ্লব দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের পতন তরান্বিতহয়। বুর্জোয়া শ্রেণী যে নতুন সংবিধান রচনা করেন তাতে ফরাসী দার্শনিক মন্তেস্কুর 'ক্ষমতা বিভাজন নীতি' অনুসরণের মাধ্যমে রাজার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর জয়লাভের ফলে কোনো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে ঘটেনি। এমনকি রাজতন্ত্রও বহাল ছিল। বুর্জোয়ারা অভিজাতদের বিশেষ অধিকার কেড়ে নিয়ে রাজনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা নিজ শ্রেণীর হাতে ন্যস্ত করে। তারা সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দ্বারা গ্রামীণ কৃষক ও শ্রমিকদের ভোটাধিকার না দিয়ে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার চালু করে। ফলে সম্পত্তিভোগী বুর্জোয়া শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করে। সুতরাং এই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে 'প্রকৃত বিপ্লব' বলা যায় না।

কোনো কোনো গবেষক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপ্লবকে প্রকৃত বিপ্লব বলতে আপত্তি প্রকাশ করেছেন। কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী রক্তপাত ও হিংসার পথে না গিয়ে রাজনৈতিক ও আইনের চাপে জাতীয় সভায় তাদের অধিকার আদায় করে। যদিও খুব শীঘ্রই সাঁকুলেৎ ও জনসাধারণ বুর্জোয়াদের ক্ষমতাচ্যুত করে। এইভাবে বুর্জোয়া বিপ্লব শেষ পর্যন্ত জাতীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

সাংবিধানিক সভার বুর্জোয়া সদস্যরা সম্পত্তির অধিকারকেই একমাত্র পবিত্র অধিকার বলে গণ্য করত। এই কারণে এই সভা ফ্রান্সের সকল নাগরিককে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেয়। ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন এই কারণে বলেন যে, যাজক, অভিজাত ও সাধারণ লোকের পরিবর্তে এই সংবিধান পাউণ্ড, সিলিং ও পেনীর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণী গঠন করে। ভোটাধিকার নীতির এই বঞ্চনার ফলে ফ্রান্সের প্রায় ৩০ লক্ষ নাগরিক ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়. মানব জাতির ঘোষণাপত্রে সাংবিধানিকসভা রুশোকে অনুসরণ করে বলে যে, 'সকল মানুষ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায়। তাহলে এই ৩০ লক্ষ নাগরিককে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সংবিধান সভা পরস্পরবিরোধী কাজ করেছিল। ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল নাগরিকদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কৃষক ও সাঁকুলেৎ সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে বুর্জোয়ারা সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। লেফেভর-এর মত ঐতিহাসিক বলেন যে, সংবিধান সভা ফ্রান্সে অর্থনৈতিক সমতার দিকে নজর না দিয়ে পুঁজিবাদী বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

১.৬.১৬.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

1. রীলা মুখার্জী—'রূপান্তরিত ইউরোপ'
2. Meenakshi Phukan—'The Rise of the Modern West'
3. প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী—'ফরাসী বিপ্লব'
4. 'ইউরোপের যুগান্তর'—সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়
5. 'The Transition from Feudalism to Capitalism'—Paul Sweezy
6. The 'French Revolution' Vol-I—George Lefebvre

১.৬.১৬.৫ ঃ নমুনা প্রশ্ন (Model Questions)

1. ঐতিহাসিক বিতর্কে অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃতি আলোচনা কর?
2. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলি আলোচনা কর?
3. মরিস ডব ও পল সুইজি কিভাবে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়টি আলোচনা করেছেন?
4. সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের বিষয়ে মাইকেল পস্টান ও রবার্ট ব্রেনার — এর বক্তব্যগুলি আলোচনা কর?
5. তুমি কি মনে কর যে, ফরাসী বিপ্লব একটি বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল?

ইতিহাস

দ্বি-বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ -২

Ancient Societies Beyond India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

বিষয় সমিতিঃ

১) ডঃ সুভাষ বিশ্বাস (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৫) ডঃ বিদ্যুৎ পাতর সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) অধ্যাপক তপতী চক্রবর্তী (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) -সদস্য।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন,

শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ডঃ বিদ্যুৎ পাতর (সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- মুদ্রণ মার্চ ২০২১ ।

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.)Manas Kumar Sanyal , Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.10.2021

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

COR-102: Ancient Societies beyond India

BLOCK-1: Journey of the Human Society.

Unit-1: Theories related with the evolution of human society.

Unit-2: Stages of Human Society.

BLOCK-2: Early Latin American Civilization.

Unit-3: Olmec, Maya, Aztec, Inca-the human background-the Asian link & Iberian influence.
Unit-4: Changing features in pre Columbus era.

BLOCK-3: Sub-Saharan Africa & Ancient Egypt

Unit-5: Sources, Sub- Saharan Africa, social structure, position of women.
Unit-6: Kingship, priesthood, Osyrian cult.
Unit-7: The Hittait invasion, Law and Punishment, mummification.

BLOCK-4: The Age of Antiquity: Greece

Unit-8: The polis.
Unit-9: Social structure—Position of Helots, Periokois and women, Greek pantheon.
Unit-10: Olympic, Society and Culture reflected in the classical comedies and tragedies.

BLOCK-5: The Birth of Classical Civilisation: Pax Romania

Unit-11: The Etruscans, Rise of the Romans, Relation between patrician and plebian.
Unit-12: The eclectic nature of the Roman culture and religion, Roman law.
Unit-13: Condition of slaves and women, Gladiator

BLOCK-6: The Oriental Society in Ancient times: China

Unit-14: Chinese Society during the Tsang and Han dynasties
Unit-15: Chinese pantheon, Confucius and ideology, Buddhism and Taoism, TsunZu, Shintoism, Position of women.
Unit-16: Chinese influence on the Japanese society and culture, South East Asia in making.

ইতিহাস

সেমেস্টার ভিত্তিক পছন্দসই মিশ্রপাঠ (CBCS) যুক্ত স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম.এ. প্রথম সেমেস্টার

বাধ্যতামূলক পাঠ - ২

Ancient Societies

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন

ড: সুকান্ত প্রামাণিক (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

পরামর্শদাতা

শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)
অধ্যাপক দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য্য (অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

ডিসেম্বর ২০১৮
মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয়

মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংর(িত। মুক্ত(ও দূরবর্তী শি(া অধিকরণ, কল্যাণী বি(বিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত(কোন অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠপ্রণেতা সং(ি-ষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

SYLLABUS

CC-2: ANCIENT SOCIETIES

CC-2, 4 Credits, 100 Marks, 120 Hours

CC-2: Ancient Societies

BLOCK-1: Journey of the Human Society

Unit-1: Theories related with the evolution of human society.

Unit-2: Stages of Human Society.

BLOCK-2: The Ancient Indian Society

Unit-3: Indus Valley/Harappan civilization-Town planning, Production system, Trade and commerce.

Unit-4: Vedic Society, *Varnashrama*, *Dharma*, position of women

BLOCK-3: Ancient Egypt

Unit-5: Sources, social structure, position of women.

Unit-6: Kingship, priesthood, Osyrian cult.

Unit-7: The Hittait invasion, Law of Punishment, Mummification.

BLOCK-4: The Age of Antiquity: Greece

Unit-8: The polis, Greek pantheon.

Unit-9: Social structure—Position of Helots, Periokois and women.

Unit-10: Olympic, Society and Culture reflected in the classical comedies tragedies.

BLOCK-5: The Birth of Classical Civilisation: Pax Romania

Unit-11: The Etruscans, Rise of the Romans, Relation between patrician and plebian.

Unit-12: The eclectic nature of the Roman culture and religion, Roman law.

Unit-13: Condition of slaves and women, Gladiator

BLOCK-6: The Oriental Society in Ancient times: China

Unit-14: Chinese Society during the Tsang and Han dynasties

Unit-15: Chinese pantheon, Confucius and ideology, Buddhism and Taoism, TsunZu.

Unit-16: Position of women.

Contents

Blocks	Titles	Pages
1	Journey of the Human Society	1-13
2	The Ancient Indian Society	14-27
3	Ancient Egypt	28-46
4	The Age of Antiquity: Greece	47-63
5	The Birth of Classical Civilisation: Pax Romania	64-80
6	The Oriental Society in Ancient times: China	81-88

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright is reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials have been composed by distinguished faculty from reputed institutions, utilizing data from e-books, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani

Block / পর্যায়—১

Journey of the Human Society

মানব সভ্যতার যাত্রাপথ

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ ভূমিকা

৩ ঃ মানব সমাজ উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ (Unit-1)

৩.১ ঃ মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ

৩.২ ঃ সভ্যতার উদ্ভব প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ

৩.৩ ঃ প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবিলাতত্ত্ব।

৪ ঃ মানব সমাজের বিবর্তনের স্তরসমূহ (Unit-2)

৪.১ ঃ মানব সমাজের বিভিন্ন ধাপ।

৪.২ ঃ নব্যপ্রস্তর বিপ্লব ও তার গুরুত্ব

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

৭ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) মানবসমাজ বিকাশের প্রধান তত্ত্বসমূহ কি কি?

২) আদিম মানব জাতির জীবনযাত্রা।

৩) মানব সমাজের বিভিন্ন স্তরায়ণ।

২ ঃ ভূমিকা

ইতিহাস হল সমাজ বদ্ধ মানুষের অতীত জীবন চর্চার পুনঃনির্মাণ। কিন্তু সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কারণ এই সংক্রান্ত কোন সমসাময়িক তথ্যসূত্র নেই, যা থেকে মানব সভ্যতা বা মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে এই আদিপর্বের পুনঃনির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়। মানব সমাজ বলতে আমরা কি বুঝি, সেই ধারণার ভিত্তিতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ন্যূনতম ৭০০০ বছরের প্রাচীন হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, যখন মানবজাতি কৃষিকাজ শুরু করে এবং স্থায়ী বাসস্থানের প্রচলন ঘটে। কিন্তু আবার অন্য তত্ত্ব অনুসারে, এই সময় আধুনিক মানব (হোমোসেপিয়েন্স-সেপিয়েন্স) এর পূর্ব পুরুষ হোমো-হাবিলিস বিবর্তনের মাধ্যমে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা হোমোসেপিয়েন্স-সেপিয়েন্স এর সমাজব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্যেই আমাদের আলোচনা আবর্তিত করব। আধুনিক মানুষের উদ্ভব আনুমানিক ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৪০ হাজার বছর পূর্বে হয়েছিল। এবং বর্তমানে যে মানবপ্রজাতিতে আমরা অর্ন্তভূক্ত তার উদ্ভব হয়েছিল আনুমানিক একলক্ষ বছর পূর্বে। আমরা মানব সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্বগুলি নিম্নে আলোচনা করব।

৩ ঃ মানব সমাজ উদ্ভবের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ একক-১ (Unit-1)

৩.১ ঃ মানব সমাজ বিবর্তনের বিভিন্নতত্ত্বসমূহ ঃ

বৃহত্তরদৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষের মধ্যে, পারস্পরিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণ প্রয়োজনে সংগঠিত হওয়া পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানবসমাজ গড়ে ওঠে। মানবসমাজ গড়ে ওঠার কারণ হিসাবে অর্থনৈতিকতত্ত্ব, সামাজিকতত্ত্ব এবং ধর্মীয় যেসব তত্ত্বসমূহের কথা জানা যায়, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ তত্ত্বের সমর্থনে যুক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। এবং প্রতিটি তত্ত্বই প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের নিজস্ব স্বাধীন মত প্রকাশের ফলে মানব সভ্যতার এই আদিতম পর্বের পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি ভিন্ন মতের তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। যার মধ্যে কোন তত্ত্বটি হয়তো অন্যগুলির চেয়ে কিছুটা অধিক যুক্তিগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়।

মানব সভ্যতা ও সমাজের উদ্ভবের পশ্চাতে একটি অন্যতম প্রধানতত্ত্ব হল চার্লস ডারউইনের ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের’ তত্ত্ব ('Theory of Natural Selection')। 1871 খ্রিষ্টাব্দে রচিত 'The desent of man' গ্রন্থে তিনি মানব সমাজের বিবর্তন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি মানব ও অন্যপ্রাণীদের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টির উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি সমমনস্ক লেখকদের সমর্থন করে মন্তব্য করেন যে নৈতিক চেতনাই মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে, এবং সেই বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো মনে করেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণা এবং নৈতিকতার চিন্তার বিবর্তন, গোষ্ঠীভূক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত সুবিধালাভের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মত আধুনিককালের Boyd, Richerson, Clutton Brock প্রমুখে সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের সমতুল। তিনি আরো দেখিয়েছেন, মনুষ্যেতর জীবরাও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তি, নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন এবং পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি

নেকড়ের পালের কথা উল্লেখ করেছেন। নেকড়েরাও শিকার ধরার সময় পরস্পরকে সহায়তা করে, মাছেরাও দলবদ্ধভাবে থাকে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপনা করেন যে সামাজিকপ্রাণীরা নিজস্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক পর্বের মানুষ, নিজ খাদ্যসংগ্রহ ও জীবনরক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হয়েছিল, সেখান থেকে মানব সমাজের যাত্রার সূত্রপাত হয়। পাশাপাশি, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকেও বিভিন্ন মানব প্রজাতির উপস্থিতির দ্বারা প্রমাণ করা যায়। জীবাশ্ম দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আধুনিক মানব হোমো হাবিলিস, হোমো ইরেক্টাস, হোমোসেপিয়েন্স নিয়েন্ডারথাল প্রভৃতি পর্বের মধ্যে দিয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। উপরন্তু দেখা যায়, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মানব প্রজাতির ধারা পৃথিবীতে জীবিত ছিল। ডারউইনের তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে দেখা যায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্য মানব প্রজাতি বিবর্তিত না হতে পেরে অবলুপ্তির পথে চলে যায়, এবং কেবলমাত্র AMM বা Anatomically Modern Man (হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স) টিকে রইল। এই আধুনিক মানব বিভিন্নভাবে নিজের গোষ্ঠী বা সমাজকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীপর্যায়ে মানুষের বিবর্তন আর ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সমগ্র সমাজের বিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতকের অন্তিমভাগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে ডারউইনের থেকে স্বতন্ত্রভাবে অগাস্টে কমটে (August, Comte), হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer),এবং লুইস হেনরি মরগ্যান (Lewis Henry Morgan) তাদের সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তন তত্ত্বের অবতারণা করেন। যে সমাজ একটি অনুন্নত পর্যায়ে থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমশ বিবর্তনের মাধ্যমে, সময়ের সাথে সাথে উন্নত হতে থাকে। তারা পশ্চিমী সভ্যতার সংস্কৃতির ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। একে একে এই সমস্ত প্রাথমিক সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ (Socio cultural Evolution theories), যেমন—সামাজিক ডারুইনবাদ, বিজ্ঞানসম্মত জাতিবাদ, বিভিন্ন নিন্দনীয়, কার্যকলাপ যথা— দাসব্যবস্থা, ঔপনিবেশিকবাদকে সমর্থন করার জন্য বহুধা নিন্দিত হয়েছে। তবে মানব সভ্যতার বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বরূপে এর উদ্ভব হয়। অতপরঃ উনবিংশ শতক থেকে সমাজ ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান ধ্রুপদী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে।

- সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তন।
- সামাজিক আবর্তন তত্ত্ব।
- মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

এই তত্ত্বগুলি একটি সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়, এই সমস্ত তত্ত্বই মনে করে মানব সমাজ একটি সুনির্দিষ্ট পথধরে সামাজিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে গেছে। সেই কারণে প্রতিটি অতীত ঘটনাক্রম কেবল মাত্র কালানুক্রমিকভাবে নয়, বরং কার্যকারণ সূত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘটনাক্রমের সঙ্গে সংযুক্ত। এই তত্ত্বগুলির বক্তব্য অনুসারে, এই অতীত ঘটনাক্রমে পুনরুদ্ধার করে সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের মূল সূত্র বা Law of History-কে খুঁজে পাবে।

Socio cultural Evolution বা সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ হল সংস্কৃতি ও সমাজের বিবর্তনের সেই তত্ত্ব যা সময়ের সাথে সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের বিবরণ দেয়। এই তত্ত্ব কোন একটি সমাজের মধ্যে ক্রম বর্ধমান জটিলতার উদ্ভবের যেমন বিবরণ দেয়, অনুরূপভাবে, তার পাশাপাশি কোন সমাজের অবক্ষয়ের

প্রক্রিয়া সমূহের বিবরণ দেয়, এবং কোন বৃহৎ পরিবর্তন ছাড়াও কোন সমাজের মধ্যে বিবিধতার বর্ণনাও প্রদান করে। সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠনকে পর্যালোচনা করা হয়, এবং তার মাধ্যমে যে নতুন সমাজ কাঠামো উদ্ভূত হয়, তা তার পূর্ববর্তী সামাজিককাঠামো থেকে গুণগতভাবে আলাদা। অধিকাংশ উনবিংশ এবং বিংশ শতকের সমাজ-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব সভ্যতার বিবর্তনকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখতে চেয়েছেন। তাদের মতে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বিভিন্ন পৃথক পৃথক পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরে সামাজিক বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। ট্যালকট পারসনস (Talcatt Parsons), সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনেরতত্ত্বকে বিশ্ব ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। বর্তমান সময়ের তাত্ত্বিকরা পৃথক সমাজের পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। সামাজিক বিবর্তনে যে সমাজ যতটা উন্নতি করেছে তার ওপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের ধারণা বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এবং সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকরা, নব্য বিবর্তনবাদ, সামাজিক জীববিদ্যা এবং আধুনিকতা তত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে সমাজ বিবর্তনের আলোচনা করেছেন। অপর একটি সমাজবিবর্তনের তত্ত্ব হল **সামাজিক আবর্তন তত্ত্ব**। এটি হল সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম প্রাচীনতমতত্ত্ব। সমাজ-সাংস্কৃতিক বিবর্তনবাদ যেমনভাবে সমাজের বিবর্তন ও মানুষের ইতিহাসকে নতুন, বিশেষ দিকে অগ্রগতি এবং ক্রমবিকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীতে সামাজিক আবর্তনতত্ত্ব অনুসারে সমাজ ও ইতিহাসে ঘটনাও বিবর্তন বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। তবে এই তত্ত্ব সামাজিক উন্নতিকে নস্যাৎ করে না। Sima Qianand এর তত্ত্বে, P.R. Sarkar এর তত্ত্বে এই তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রাচীন সমাজে এই তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। ভারতীয় সমাজে সময়ের বারংবার আবর্তিত হয়। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, যুগের পর অবক্ষয়িত কলিযুগের আগমন ঘটে। এই চিরাচরিত যুগগুলি অতঃপর পুনরাবর্তিত হয়। অ্যারিস্টটল তাঁর On Philosophy গ্রন্থে ধ্বংসের পরে সভ্যতার পুনঃজন্মের কথা বলেছেন। তবে তিনি এই চক্রে সীমা কতবছর তা উল্লেখ করেননি। পলিবিয়াম তাঁর History গ্রন্থে ছয়ধরনের শাসন ব্যবস্থা পুনরাবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল, Monarchy, Tyranny, Aristocracy, Oligarchy, Democracy, Mob rule। এই চক্র প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা তৈরী হয়। পরবর্তীকালে দিয়োভালি গিলোনির 'Chronicle of Florence' গ্রন্থে চক্রাকার তত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলী তাঁর Discourses গ্রন্থে পলিবিয়াসের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। এছাড়া অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার ও আর্নল্ড টয়েনবির রচনার এইতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক George Boas ইতিহাসের চক্রকে ঘড়ির পেণ্ডুলামের সাথে তুলনা করেন, সেটি বারংবার একইস্থানে ফিরে আসে। ঐতিহাসিক ভিকো মনে করতেন অতীতে যা ঘটেছিল, তা ভবিষ্যতে ঠিক তাই ঘটবে। তিনি ইতিহাসের সমান্তরাল অগ্রগতির ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তবে তাঁর Recurrence ঠিক অতীতের পূর্ণ প্রতিফলন নয়, এটি সময়ান্তরে সংগঠিত বিবর্তন।

মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণতত্ত্ব। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল সমাজ এবং তাঁর বিবর্তনকেন্দ্রিক মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতিফলন। এইতত্ত্বের প্রথম প্রতিফলন ঘটে কার্লমার্কসের বস্তুগত ইতিহাসের ধারণার মাধ্যমে। মার্কসীয় মতার্দশে কোন সমাজের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক সামাজিক বিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হয়।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজ বিবর্তনের ও বিজ্ঞানের কারণ অনুসন্ধান করে উৎপাদনের উপকরণের সাথে সামাজিক শ্রেণী সমূহের সম্পর্কের মধ্যে। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীসমূহের

আন্তঃসম্পর্ক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক চিন্তাধারা সবই অর্থনৈতিকক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

মানব সমাজকে বংশ পরম্পরায় বেঁচে থাকতে হলে জীবনধারণের বস্তুগত উপাদান সমূহের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন খুবই জরুরী। মার্কস দেখিয়েছেন, উৎপাদন এবং বিনিময় বজায় রাখার জন্য মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়।

যদিও, উৎপাদন বিমূর্ত প্রক্রিয়ার সংগঠিত হয় না। উৎপাদন ভিত্তিক সম্পর্ক মানুষের অকস্মাৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হয় না। মানুষ সংগঠিত ও সমাজবদ্ধভাবে কর্ম সম্পাদন করেন, সমাজে কর্ম বিভাজন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। মার্কস আরও দেখিয়েছেন যে, কিছু মানুষ শ্রমদান না করে, অন্যের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে জীবন যাপন করেন। এই ধরণের মানুষরা সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন। সমাজের চরিত্রের ওপর এই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকেন। সমাজের চরিত্রের ওপর এই নিয়ন্ত্রকের চরিত্র নিরূপণ করা হয়। উৎপাদন মানুষের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই উৎপাদন সম্পর্ক নির্ধারিত হয় কোন নির্দিষ্ট সময়ে সহজলভ্য উৎপাদিকা শক্তির ওপরে ভিত্তি করে। মার্কসীয় মতে উৎপাদিকা শক্তি বলতে বোঝায় যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, জমি, কাঁচামাল এবং পাশাপাশি মানুষের চিন্তা চেতনা কর্মক্ষমতা প্রভৃতি।

মানবসমাজের বিবর্তনে মার্কসীয় ঐতিহাসিকরা আদিম সাম্যাবস্থা, প্রাচীন সমাজ, সামন্তব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবধি বিবর্তনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই প্রতিটি স্তরে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে আদান প্রদান এবং তাদের জীবনযাত্রা ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিচালনা করে। উৎপাদনে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ও প্রতিটি পর্বে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন দাস সমাজে একটি শাসক শ্রেণীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যারা দাস মালিক ছিলেন এবং তাদের অধীনে ছিল ক্রীতদাসরা। ভূমি মালিক ও ভূমিদাসদের কেন্দ্র করে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেখানে পুঁজিপতিরা পুঁজির মালিক। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ, যথা—শ্রম, ভূমি ও পুঁজি সমাজের উচ্চশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে দাসমালিকদের যেমন নিজের শ্রমের ওপর অধিকার ছিল না, ভূমিদাসদের জমিতে কোন অধিকার ছিল না, তেমনই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে পুঁজিপতিদের থেকে অর্থভিন্ন অন্যকিছু লাভ করে না। মার্কসের মতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনই সমাজ ব্যবস্থাকে পরিচালিত করেছে এবং সমাজের উদ্ভবে অর্থনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল। মার্কস আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে অর্থনেতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সামাজিকসংগঠন, রাজনৈতিকব্যবস্থা, আইন, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা, ধর্ম, প্রভৃতি উদ্ভূত হয়। অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তির ওপরে এই রূপ সামাজিক ও আদর্শগত উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে ধর্মবোধ পরিবর্তনশীল। ক্রীতদাস ব্যবস্থা বর্তমানে নিন্দিত কিন্তু সেই প্রথাকে অ্যারিস্টটলের মতো ব্যক্তিত্ব এই প্রথাকে একদা সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ মানবসমাজের সংগঠন অর্থনৈতিক ভিত্তি ও তার ওপরে গড়ে ওঠা উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিকে নির্মিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বকে নিম্নোক্ত সাধারণ নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

(1) মানবসমাজের মূলভিত্তি হল জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির মধ্যে মানুষের উৎপাদনের প্রয়াস।

(2) সামাজিক শ্রেণীভিত্তিক সমাজে শ্রেণীভিত্তিক কর্মবিভাজন দেখা যায়। যেখানে কিছু মানুষ অন্যের শ্রমের ওপর জীবন যাপন করেন।

(3) শ্রেণীবিন্যাসের প্রকৃতি, উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(4) উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(5) সমাজ একস্তর থেকে অন্যস্তরে বিবর্তিত তখন হয়, যখন একটি নতুন উদ্ভূত শ্রেণী পুরাতন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুরাতন ক্ষমতাশীল শ্রেণিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। পুরাতন শ্রেণী সম্পর্ক, নতুন ব্যবস্থায় আর ক্রিয়াশীল থাকে না। এইভাবে সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ বিবর্তিত হয়েছে।

৩.২ ঃ সভ্যতার উদ্ভবপ্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ

মানব সমাজের উদ্ভবের বিভিন্নতত্ত্বের পাশাপাশি সভ্যতা কখন এবং কি পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠে সেই পরিস্থিতি সংক্রান্ত মতবাদগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। মানব সভ্যতা গড়ে উঠতে গেলে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেইগুলিকে বিভিন্ন মতবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ক. জলবায়ু ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ভূগোলবিদ এসলওয়ার্থ হান্টিটনের মতে সভ্যতা গড়ে ওঠার প্রধান নিয়ামক শক্তি ছিল জলবায়ু। সভ্যতা গড়ে তোলার পশ্চাতে সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা ও আদ্রতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অনুকূল পরিবেশ সভ্যতা গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায় বলে এই মতের প্রবক্তরা মনে করেন অনুকূল আবহাওয়াকে কেন্দ্র করেই ভারতে হরপ্পীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। আবার মরুভূমির আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মিশরে মমি তৈরি হয়, নীলনদের বন্যা মোকাবিলায় মিশরে সেচব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। আবার আবহাওয়া পরিবর্তনে সভ্যতার অবক্ষয়ও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খ. ভূপ্রকৃতি ঃ ইংরেজ ঐতিহাসিক টমাস বাকল ও জার্মান ঐতিহাসিক কার্লরিচার মনে করেন যে অঞ্চলে পর্বত, বনভূমি ও মরুভূমির বৈচিত্র্যপূর্ণ সমন্বয় দেখা যায়, সেখানেই সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাদের মতে,এই ধরনের ভূ প্রাকৃতিক অবস্থান মানুষের বিভিন্ন চাহিদাপূরণ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি এখানে নদীর প্রাচুর্য পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ভারতবর্ষ উত্তরে হিমালয় ও তিনদিকে সাগরবেষ্টিত হওয়ায় স্বতন্ত্রদেশ হিসাবে এর আবির্ভাব সহজতর হয়ে ছিল। হিমালয় পর্বত যেমন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করেছে, তেমনই বৃষ্টিপাতে সহায়ক হয়েছে। হিমালয়ে উদ্ভূত নদী ভারতবর্ষকে করেছে শস্যশ্যামলা। সমভূমির প্রাচুর্য থাকায় কৃষি সভ্যতা বিকশিত হতে পেরেছে।

গ. যাযাবরদের হাতে গড়ে তোলা সভ্যতা ঃ কৃষির উদ্ভবের পূর্বে মানুষ যাযাবর ছিল। এই যাযাবরদের হাতধরেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সভ্যতা গড়ে ওঠে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী এ. এল ওপেনহাইমার তাঁর 'Ancient Mesopotamia' গ্রন্থে মনে করেন, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠায় যাযাবরদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই মতবাদ অনুসারে, শিকারী যাযাবর গোষ্ঠীই নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে কৃষিকাজের প্রচলন ঘটান। এইভাবে সভ্যতার বিস্তার ঘটে।

ঘ. প্রাকৃতিক নিয়ম মতবাদ ঃ রাশিয়ার বিজ্ঞানী নিকালাই দানিলেভস্কি সভ্যতার প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এইরকম বারোটি সভ্যতার পর্যালোচনা করে বলেছেন, প্রতিটি সভ্যতা স্বতন্ত্র অবস্থান থেকে বিকাশ লাভ করে। ঐতিহাসিক ওসওয়াল্ড স্পেংলার তাঁর The decline of the west গ্রন্থে একই অভিমত পোষণ করে স্পেংলার মনে করেন, প্রতিটি সভ্যতার স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে, এবং চূড়ান্ত উন্নতির পর পতনের দিকে ধাবিত হয়। দার্শনিক ভিকো মনে করে প্রাকৃতিক নিয়মে সভ্যতা গড়ে ওঠে, তার পেছনে আধ্যাত্মিক প্রেরণাও কাজ করে।

এইভাবে বিভিন্ন পণ্ডিত সভ্যতা গড়ে ওঠার বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

৩.৩ ঃ প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবিলা তত্ত্ব ঃ

সভ্যতার উৎপত্তি সংক্রান্ত আধুনিক ও যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক আর্নল্ড.জে. টয়েনবি। তিনি তাঁর দশ খণ্ডে প্রকাশিত Study of History গ্রন্থে সভ্যতা সংক্রান্ত মতামত পোষণ করেছেন। তার মতে, ভৌগলিক পরিবেশ বা মানুষের নৃতাত্ত্বিক উন্নয়নের ফল হিসাবেই সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। বরঞ্চ মানুষের প্রয়োজনের এবং সেই প্রয়োজন মেটাতে সম্মুখীন হওয়া প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে গিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলেছে। তার তত্ত্ব পরিচয় পেয়েছে Adversity theory of Challenge and Response নামে।

তিনি উপস্থাপনা করেছেন যে পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশের কঠোরতাই শেষ পর্যন্ত বড় বড় সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। প্রাচীন মানুষ যখনই ভৌগলিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি হয়েছে তখনই সেটিকে অতিক্রম করার প্রয়াস করেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি সভ্যতার প্রয়োজনকে আরও স্পষ্ট করেছে। মানবসভ্যতা বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক, সামাজিক,অর্থনৈতিক বাধা অতিক্রম করতে নতুন নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবন মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। টয়েনবি প্রতিকূল পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সভ্যতা গড়ার ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রভাবক চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল— (১) রুক্ষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা (২) নতুন ভূমির প্রেরণা (৩) আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবিলার প্রেরনা (৪) দায়মুক্তির প্রেরণা (৫) চাপ মোকাবিলার প্রেরণা।

(১) রুক্ষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রেরণা ঃ টয়েনবির মতঅনুসারে কৃষি অনুকূল অঞ্চলে মানব বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই অবস্থায় উত্তরণ করতে মানুষকে শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করতে হয়েছে। নীলনদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মিশরে উন্নত সেচব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। পাহাড়ি রুক্ষ জমি ও অপ্রতুল কৃষি জমির কারণেই আসীরিয়ার মেসোপটেমিয়ার মূল ভূখণ্ড নেমে আসে। খাড়া পাহাড়ের কারণে গ্রিস জুড়ে একক সভ্যতা গড়ে না উঠলেও সেই কারণে গ্রিসে গড়ে উঠেছে নগররাষ্ট্র ভিত্তিক সভ্যতা। ঈজিয়ান অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বাণিজ্য নির্ভর সভ্যতা। এইভাবে রুক্ষ প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা একদিকে কৃষিজীবী গোষ্ঠীকে যোদ্ধা জাতিরূপে পরিবর্তিত করে, তেমনই যাযাবর গোষ্ঠীকে কৃষিজীবিতে পরিণত করে।

(২) নতুন ভূমির প্রেরনা ঃ অনেক সময় পুরানো স্থান ত্যাগ করে মানুষকে অন্যস্থানে যেতে হয়। ইহুদিদের প্রবক্তা আব্রাহাম নিজভূমি ক্যালডিয়াতে ধর্ম প্রচারে বাধাপ্রাপ্ত হন, পরে প্যালেস্টাইনে ধর্ম প্রচার করেন। তেমনি বৈদিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতারা নতুন ভূমি (সিন্ধু ও পাঞ্জাব) কে দেব নির্মিত দেশ বলে অভিহিত করে। রোম সাম্রাজ্যের মূলভূমিতে তা টিকে ছিল। যেখানে মধ্যযুগের সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেন।

(৩) দুর্যোগ মোকাবিলা প্রেরনা ঃ প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দুর্যোগে অনেক সময় মানুষকে প্রেরনা প্রদান করেন। স্পার্টার ভূমিদাস হেলটরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত, সেই বিদ্রোহ থেকে সতর্ক থাকতে স্পার্টাতে গড়ে ওঠে সমরতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র। গ্রিসের সভ্যতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল পার্সীয় সভ্যতার আক্রমণে, কিন্তু সেই অসম লড়াই লড়তে গিয়ে তারা পারসীক সভ্যতাকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়।

(৪) দায়মুক্তির প্রেরনা ঃ টয়েনবির ধারণা মতে মানুষ যেকোনো বিরুদ্ধ অবস্থার মুখে টিকে থাকার জন্য নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে, যেমন—রোমে দাস ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও দাস নিগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় দাসরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ৭৩ খ্রিঃপূর্বাব্দে দাস বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। দক্ষিণ ইতালিতে

দুবছর স্পার্টাকাসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমে অভিজাতদের শ্রেণী শোষণের প্রতিক্রিয়ায় প্লেবিয়ান দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, তাতে জয়ী হয় শ্রমজীবি প্লেবিয়ানরা।

(৫) চাপ মোকাবিলার প্রেরনা ঃ যখন কোন জাতিগোষ্ঠীর সামনে স্নায়বিক বা দৃশ্যমানচাপ উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশে তারা নিজেদের প্রস্তুত করে। টয়েনবি এক্ষেত্রে বহিরাক্রমণ বা সামরিক চাপের কথা বলেছেন। মিশরের ক্ষেত্রে দ্বাদশ রাজবংশ অবসানের পর বহিরাক্রমণ হয়। বহিরাগত হিকসসরা অধিকার করলে মিশরের জনসাধারণ ও শাসকশ্রেণী সেই চাপের ফলে ঐক্যবদ্ধ হয়। এবং তার ফলে তারা হিকসসদের বিতাড়িত করে। অন্যদিকে শশাঙ্ক পরবর্তী গৌড়ে যে অরাজক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, তার চাপ মোকাবিলায় অভিজাত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা গোপালকে সিংহাসনে মনোনীত করে পাল বংশের স্থাপন করেন।

টয়েনবি প্রতিবন্ধকতা ও মোকাবিলা তত্ত্ব পণ্ডিত মহলে অনেকটাই গৃহীত হয়েছে। তবে সমালোচকরা এর কিছু সীমাবদ্ধতার কথা ও উল্লেখ করেছেন। তারা মনে করেন সর্বদা যে মানুষ প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে পারবে তা নাও হতে পারে। যদি মোকাবিলা করতে না পারে, সেক্ষেত্রে সেই সভ্যতার বিনাশ ঘটবে। কারণ প্রতিবন্ধকতার চাপ যদি প্রবল হয়, তাহলে শ্রম ও মেধা সত্ত্বেও সেই প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে সে ব্যর্থ হয়।

সভ্যতার উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মন্তব্য করলেও প্রতিটি মতে কোন না কোন বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এদিক থেকে সমাজ বিজ্ঞানী পিতিমির সরোকিনের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চার খণ্ডে লিখিত Social Cultural Dynamics (1937-1947) এবং Society Culture and Personality (1947) গ্রন্থে সুস্পষ্টতই বলেছেন, পৃথিবীর সকল সভ্যতা কোন ঐক্যবদ্ধ বা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সৃষ্টি হয়নি, সভ্যতার উত্থান নিয়ে নির্দিষ্ট মত থাকা উচিত নয়। শুধু পরিবেশগত মিলের কারণে কখনো একাধিক সভ্যতার মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যেতে পারে।

৪ ঃ মানব সমাজের বিবর্তনের স্তরসমূহ একক-২ (Unit-2)

৪.১. ঃ মানব সমাজের বিভিন্ন ধাপ

মানব সভতা বর্তমান স্তরে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করেছে। যদি বিশ্বের বিভিন্ন মানব সভ্যতার পর্যালোচনা করা যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে আমাদের বর্তমান সমাজের আবির্ভাব হয়েছে। মানব ইতিহাস অনুধাবন করতে গেলে এই স্তরগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। লেনস্কির মতে সামাজিক পরিবর্তনের মূল হল প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। এই পদ্ধতিকে তিনি বলেছেন সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তন, যা সম্পাদিত হয় সমাজ নতুন প্রযুক্তি লাভ করলে। তিনি মানব ইতিহাসকে পাঁচটি সমাজ ব্যবস্থায় ভাগ করেন।

(১) **শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক সমাজ ঃ** শিকারী ও খাদ্যসংগ্রাহক সমাজ পর্বটি মানব সভ্যতার সর্বপ্রথম স্তর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মানব ইতিহাসের প্রায় ৯০ শতাংশ সময়কাল মানুষ, এই স্তরে অবস্থান করেছিল। এই সমাজের মানুষেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বংশগত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতো।

অধিকাংশ সময়ে তারা খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন যাপন করতো। অভিপ্রয়ণকারী পশুপাখিদের সাথে তাদের ও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হত বলে, সাধারণত তারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করতো না, এই ধরনের সমাজ আকারে ক্ষুদ্র ছিল। এর সদস্য সংখ্যা ২৫ থেকে ৪০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমাজ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকতে প্রত্যেক সদস্যকে পরিশ্রম করতে হত এবং আহরিত দ্রব্য নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে হত। মার্কস এই ব্যবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। মূলত প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষজন পাথরের হাতিয়ার তৈরী করত, এই ধরনের মানুষরা শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহক জীবন যাপন করত। খ্রীঃ পূর্ব 10000 অব্দে মধ্যপ্রস্তর যুগ শুরু হওয়া পর্যন্ত ইহাই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম। আদি প্রস্তর যুগের মধ্য পর্যায়ে কিছু শিকারীজীবি গোষ্ঠী শিকার ধরার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষত্ব অর্জন করতে শুরু করে যার ফলে মাছ ধরার বড়শি, জাল প্রভৃতির আবিষ্কার এই সময়ে দেখা যায়। এই ধরনের মানুষজন গুহাবাসী ছিল, তাদের জীবন যাত্রার প্রমাণ পাওয়া এই ধরনের বিভিন্ন গুহাবাসে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষে ভীমবেটকা গুহাচিত্রের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেখানে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দ্বারা শিকার ধরার দৃশ্য সুন্দরভাবে চিত্রায়িত আছে।পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট গাছের ফলমূল সংগ্রহ করাও এই ধরনের গোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা ছিল।

(২) **উদ্যানপালক ও পশুপালক সমাজ ঃ** মানবসমাজ মধ্যপ্রস্তর (Mesolithic) যুগ থেকে বিভিন্ন প্রাণীকে পোষমানাতে শুরু করে। সর্বাধিক প্রাচীনতম পোষা প্রাণী হল কুকুর। অতঃপর বিভিন্ন প্রাণীকে পোষমানাতে শুরু করে। এই ধরনের গোষ্ঠীরাও একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাযাবর জীবন যাপন করতেন। উদ্যানপালক সমাজ বিভিন্ন ছোট ছোট উদ্ভিদ চাষ করার প্রবণতা দেখা যায়। এই সমাজের মানুষ যাযাবর হলেও খাদ্যের উৎসের নিকটে থাকার চেষ্টা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সমাজে সর্বপ্রথম প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রবণতা দেখা যায়। এই অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রবণতা সমাজের অগ্রগতির অন্যতম সূচক হিসাবে পরিগণিত হয়। এর ফলে প্রত্যেককে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করার প্রয়োজন হয় না। বৈদিক সমাজ এই রূপ পশুচারণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থায় পশুর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। গো বা গাভী ছিল এই অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(৩) **কৃষিজীবী সমাজ ঃ** আনুমানিক খ্রিঃ পূর্ব পাঁচ হাজার বছর পূর্বে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ সর্বপ্রথম স্থায়ী কৃষিকাজ ব্যবস্থার পত্তন ঘটায়। বিভিন্ন নতুন কৃষিজ যন্ত্রপাতি যথা পশুর টানা লাঙ্গল প্রভৃতির সাহায্যে অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং বস্তুগত উদ্বৃত্ত উৎপাদনের মানবজাতির সক্ষম হয়। খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে পরিণত হবার কারণে নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষের কৃষিকাজের এই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড 'নব্যপ্রস্তর বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। কৃষিকাজ প্রচলনের সাথে সাথে বিভিন্ন বড় সভ্যতা গড়ে ওঠে। কৃষির উদ্বৃত্তই মানুষকে বাণিজ্যের পথে নিয়ে যায় এবং তা থেকেই বিভিন্ন শিল্পকর্মের সূচনা আমরা দেখতে পাই। এই আদি কৃষি সভ্যতা থেকেই বৃহৎ নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকেই উদ্ধৃত ব্যবস্থা ও কৃষি

সমাজেই তা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনবিশ্বে হরপ্পীয়, মেসোপটেমিয়, মিশরীয়, চীন সকল সভ্যতাই ছিল কৃষিভিত্তিক।

(৪) **শিল্পোন্নত সমাজ ঃ** পূর্বেই বলা হয়েছে যে কৃষিজ উদ্ধৃত্ত উৎপাদনে মানুষ বাণিজ্য বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পজাতদ্রব্যের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি চলে আসে, প্রযুক্তিগত উন্নতির বিষয়টি। যার ফলে শিল্পের যুগের সূত্রপাত হয়। 1750 খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ মনুষ্যও পশুশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে শুরু করে। ইহা খাদ্য উৎপাদন প্রভূত বদল আনে। খাদ্য উৎপাদনে ট্রাক্টর ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য এনে দেয়। তবে শিল্পবিপ্লব সমাজের মূলকাঠামোতে বিস্তর বদল আনে, মানব সভ্যতার উদ্ধৃত্ত উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থা পুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিবর্তিত হয়।

(৫) **শিল্প পরবর্তী যুগ ঃ** শিল্প পরবর্তী যুগে আমরা বর্তমানে বাস করি, যেখানে প্রভূত নগরায়ণ, প্রযুক্তির অসামান্য উন্নতি দেখা যায়। এবং এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল যে মানুষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে আরো উচচস্তরে নিয়ে যাবার প্রয়াস সর্বদা বজায় রেখে চলেছে।

এইভাবে মানব সভ্যতা ক্রমশ বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছে।

৪.২ ঃ নব্যপ্রস্তর বিপ্লব ও তার গুরুত্ব

ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের তৃতীয় বা শেষ পর্যায় হল নব্যপ্রস্তর যুগ। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, চিন্তাধারা, জীবিকা নির্বাহের জন্য নিত্য নতুন পরিকল্পনা সব কিছু বিকশিত হয়েছিল। এ যুগে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে, যদিও এই সামগ্রিক উন্নতি রাতারাতি সম্ভব হয়নি। উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ থেকে চলে আসা মানুষের প্রয়াস ধীরে ধীরে মধ্যপ্রস্তর যুগে অর্থাৎ সংগ্রহের পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদনের পর্যায়ে এসে পৌঁছায়।

পাথর দিয়ে পাথরে আঘাত করে তৈরি হত মানুষের প্রথম দিকে অসম, অমসৃণ হাতিয়ার। এই পর্বের শেষ দিকে এল পাথর দিয়ে পাথর ঘষে বা একটা কঠিন পাথরের চাইয়ের উপর অপেক্ষাকৃত নরম পাথর হাতে ঘুরিয়ে নির্মিত মসৃণ হাতিয়ার বা 'Ground tool'। এই হাতিয়ারগুলি আগের তুলনায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মসৃণ, সুষম আকারযুক্ত এবং সূচালো ছিল। মসৃণ, লম্বা ও ধারওয়ালা কুঠার বা খননকারী লাঠির আগা কিংবা তীরের ফলা, যেমন ভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, প্রাচীন প্রস্তর যুগ অথবা মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের চেয়ে তা অনেক বেশি কার্যকরী হয়ে উঠলো। বিখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ডের মতে, এই সকল 'Neolithic' বা নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বস্তুনির্ভর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে গেল। একে তিনি নব্যপ্রস্তর বিপ্লব বলেছেন।

উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগে মানুষ ছিল প্রধানত খাদ্য সংগ্রাহক। বন্য ফলমূল, লতা-পাতা, জন্তুর মাংস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। তখন জীবিকা নির্বাহ ছিল খুবই কঠিন। মধ্য প্রস্তরযুগে প্রস্তরায়ুধের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন এলেও কিন্তু খাদ্য আহরণের ক্ষেত্রে নতুন কোন মৌলিক পরিবর্তন এ যুগে ঘটেনি। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, তখনও পর্যন্ত মানুষ

ছিল প্রধানত খাদ্য সংগ্রাহকই। চাইল্ডের যুক্তি হল, একবার যেই নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার তৈরি করা শুরু হয়ে গেল, অমনি তার পরে জমি কর্ষণ করা অনেক সহজ হয়ে গেল। মানুষ আবিষ্কার করলো যে কেবলমাত্র বুনো শস্যদানা সংগ্রহ করার মধ্যে আটকে না থেকে খাদ্যভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে হলে ঐ শস্যবীজ মাটিতে রোপণ করতে হবে। মসৃণ পাথরের কুঠার গাছ কাটতে অনেক বেশি সাহায্য করলো। খননকারী লাঠি বীজ রোপণের জন্য মাটিকে আরও নরম করতে সক্ষম হল। মসৃণ ও সূচালো বর্শার ফলা আর তীরের ডগা শিকার করার কাজকে আরও সহজতর করে তুললো। বাসস্থান, পোশাক এবং দরকারি বহু সামগ্রীর আবির্ভাব ঘটে এ যুগেই। ভাবলে অবাক হতে হয়, লোহা, তামা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার ছাড়াই সে যুগের মানুষ শুধু পাথর, হাড় ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে এই সকল অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষিকাজের যথেষ্ট উন্নতির ফলে গবাদি পশুর গৃহপালন একটা দৃঢ়তর ভিত্তি পেল। শস্য কাটা হয়ে যাবার পর সেই পড়ে থাকা জমিতে গরু-মোষের জাব বা খাদ্য পাওয়া গেল। আর গবাদি পশু থেকে দুধ আর মাংস দুটোই পাওয়া যাবার ফলে শিকারের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমে গেল। গ্রামে বসবাসকারী কৃষিজীবি গোষ্ঠী কালে কালে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হল। যারা উৎপাদন করতো না, তারাও তখন এই বাড়তি ভাগ পেল, গায়ের জোরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করল। পরে ধর্মীয় পদ্ধতি আর চালু রীতিনীতিতে এই অধিকার নিশ্চিত করা হল। উদ্বৃত্তের এমন বেদখলের ভিত্তিতেই আবির্ভূত হল শ্রেণী, ব্যক্তি সম্পত্তি ও রাষ্ট্র।

নব্য প্রস্তরযুগে খাদ্যোৎপাদন থেকে শুরু করে গ্রামের উদ্ভব ও অন্যান্য বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রথমেই নজর আসে, বালুচিস্তানের বোলান নদীর তীরে মেহেরগড়ের প্রথম ও পরবর্তী পর্যায়ে প্রাপ্ত শস্যদানা চাষাবাদের স্পষ্ট নিদর্শন বহন করে। এখানে কয়েক ধরনের চাষা করা ও বুনো যব একত্রে পাবার ফলে অনুমতি হয় যে, বুনো থেকে চাষ করা পর্যায়ে উত্তরণ ঘটেছিল। বিপুল পরিমাণে পোড়া তুলো-বীজের প্রাপ্তি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করে এই কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্পাস চাষ হত। প্রথম পর্যায়ের শস্যভাণ্ডারগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিশাল রূপ নিয়েছিল। এই তথ্য নিশ্চিতভাবে সমকালীন যুগের কৃষি উন্নতির পরিচয় বহন করে। নানা ধরনের মসৃণ পাথরের উপকরণের মধ্যে কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ার হল বিটুমেন খণ্ডের সঙ্গে আটকানো কাস্তের পাত। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাপ্ত কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত এটাই প্রাচীনতম হাতিয়ার। কৃষিজ উৎপাদনের কারণেই সম্ভবত পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করে তোলার বিষয়টি ত্বরান্বিত হয়েছিল। প্রাপ্ত হাড় থেকে গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গরু,ভেড়া ও ছাগলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পর্যায়েই মোষের হাড়ও পাওয়া গেলেও তা বুনো পোষ মানানো, তা স্পষ্ট নয়। কুঁজ-ওয়ালা ষাঁড়ের অস্তিত্বও ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের সিদ্ধান্ত, মাংসের উৎস হিসাবে বুনো পশুর তুলনায় গৃহপালিত পশুর সংখ্যাই ছিল বেশি।

কৃষিজ উৎপাদনের সূত্র ধরে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শিল্পের ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে অদ্ভুত রকমের মসৃণ বিচিত্র সব পাথরের হাতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হামানদিস্তা, গুঁড়ো করার পাথর, জাঁতা, টুকরো টুকরো ফলক প্রভৃতি। নলখাগড়ায় তৈরি ঝুড়ি এবং তার সঙ্গে উল অথবা পশু লোমের তৈরি কাপড় অর্থাৎ বয়ন শিল্পেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে নতুনত্বের মধ্যে ব্যাপকভাবে মৃৎশিল্পের সঙ্গে কিছুটা পরে এসেছিল চুপড়ি, যা কাদামাটির পাত্রের ছাঁচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষদিকে কুমোরের ঘুরন্ত চাকার প্রচলন ঘটে, যা তৎকালীন যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এই পর্যায়েই

তথাকথিত 'কারুশিল্পীর সমাধি'তে এই শিল্পী মানুষটির সমাধির সাথে একটি নব্যপ্রস্তর যুগীয় পালিশ করা কুঠার, তিনটি চকমকি পাথরের ভিতরের অংশ ও তার নয়টি জ্যামিতিক ছোট ছোট অংশ বা 'মাইক্রোলিথ' এবং ষোলটি ছোট ছোট ফলক পাওয়া গেছে।

এই যুগে সমাধি দেবার পদ্ধতিতে পাওয়া যায় নতুনত্বের ছোঁয়া। প্রথম পর্যায় থেকেই সমাধিতে গেরিমাটির প্রাপ্তির ফলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করতে পেরেছেন যে মৃত ব্যক্তিকে লাল রং মাখিয়ে সমাধিতে দেওয়া হত। মৃতের শরীরগুলি সব সময়েই কুঁকড়ে শোয়ান ও মাথাগুলি সবক্ষেত্রে এক দিকে নয়। অর্থাৎ একটা অজানা বা অজ্ঞাত কোনো শক্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল এবং সেই মতো কোনো নিয়ম পালন করতো। সমাধিতে মৃতের সাথে দেওয়া হত সামুদ্রিক ঝিনুক জাতীয় জিনিসের লকেট, বালা ও মালা, পাথরের পুঁতি, লকেট, পাথরের ব্যাট এবং হাড়ের আংটি প্রভৃতির সঙ্গে নীলকান্ত মণি, নীলার মতো দামী পাথর যেগুলো সম্ভবত বাণিজ্য মারফৎ কোনো দূর দেশ থেকে আনীত। একটি বিশেষ কবরে মৃত ব্যক্তির পায়ের কাছে পাঁচটি ছাগলের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। সমাধি পদ্ধতি এবং সমাধিগুলিতে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর উপস্থিতি, কিছু সমাধিতে মূল্যবান সামগ্রীর উপস্থিতি এবং অন্য সমাধিগুলিতে সেই সমস্ত সামগ্রীর অনুপস্থিতি, নিশ্চিতভাবে লোকাতীত জীবনের প্রতি আত্মা ও বিশ্বাস এবং সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসের চিত্রকে প্রতিফলিত করে। শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থা ও হস্তশিল্প সামগ্রীর প্রকারভেদ থেকেও শ্রেণীবিভাজনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

মেহেরগড়ের প্রথম পর্যায় নব্যপ্রস্তর যুগ হলেও শেষ দিকে মানুষ তাম্র ধাতুর ব্যবহার শেখে। মেহেড়গড় সভ্যতার তৃতীয় পর্যায়ে তাম্রশ্মীয় যুগের আবির্ভাব ঘটে। বালুচিস্তানের এর আশেপাশে আরও অনেক প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলিতে নব্য প্রস্তর যুগের ধারা বহমান। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বালুচিস্তানের উচচভূমিতে কোয়েডার কাছে মেহেরগড়ের অনুরূপ বা তার কিছুটা পরের সময়ে কিলি গুল মহম্মদ-এর কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে এখানে বসতির নিদর্শন আছে। কাদামাটির দেওয়াল দেওয়া বাড়ি, ছাউনিতে সম্ভবত লতাপাতার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু হিসাবে গরু, ভেড়া, ছাগলের হাড় পাওয়া গেছে। প্রথম পর্যায়ের মৃৎপাত্রের নিদর্শন না থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের হাতে তৈরি মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পর্যায়েই ঢেউ খেলানো রেখাতে চিত্রিত কিছু হাড়ের হাতিয়াল ও তৃতীয় পর্যায়ে লালের উপর কালো চিত্রন বিশিষ্ট মৃৎপাত্রের বহু প্রচলন দেখা যায়। এছাড়াও মধ্য বালুচিস্তানের কালাত অধিত্যকায় আনজিরা ও সিয়াদামব নামক দুটি প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। এই কেন্দ্রদ্বয় প্রথম পর্যায়ের মৃৎপাত্রগুলি লাল রঙের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল পাথরের ভিতরে উপর কাঁচা ইটের বাড়ি।

খ্রিষ্টপূর্ব 700 অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বালুচিস্তানের গ্রাম সংস্কৃতির সঙ্গে মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান ও পারস্যের সংস্কৃতির যে যোগাযোগ ছিল তা মৃৎপাত্র গুলির ধরণ, কলাকৌশল এবং লাপিস-লাজুলি, নীলকান্ত মণি প্রভৃতির ব্যবহার থেকে স্পষ্ট ধরা পড়ে। শুধু বালুচিস্তান নয়, কাশ্মীর উপত্যকার বুর্জাহোম প্রত্নকেন্দ্রে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 2800-2500 অব্দের মধ্যবর্তী প্রাচীন নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতার পরিচয় মেলে। এই পর্যায়ের মৃৎশিল্পের কোনো জ্ঞান ছিল না। ঐ অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে খ্রিষ্টপূর্ব 2500-2000 অব্দের মধ্যে, যেখানে রঙ করা মৃৎপাত্রগুলির প্রাপ্তির মাধ্যমে মৃৎপাত্রের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া

যায়। জন্তুর হাড় দেখে বোঝা সম্ভব হয়েছে যে গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল, মোষ, শূকর এমনকি কুকুরও গৃহে পালিত হত। এক্ষেত্রেও পশুচারণ বা পালন শিকারের প্রবণতাকে ধীরে ধীরে হ্রাস করে। মাটি কর্ষণ করার ছুরির প্রাপ্তি কৃষিকাজের বিষয়কে প্রমাণিত করে। বিভিন্ন প্রত্নবস্তু থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই পর্যায়ে গম, বার্লি, ডাল ও কড়াইশুঁটি চাষ হত এবং পরবর্তী পর্যায়ে চালের অস্তিত্বের প্রমাণ নব্যপ্রস্তর যুগের শেষদিকে ধান চাষেরও বহন করে। পাঞ্জাবে ঘালিঘাই এর সোয়াট উপত্যকায় খ্রিষ্টপূর্ব 3000-1900 অব্দের মধ্যেকার নব্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রথম দিকে হাতে তৈরি অতি সাধারণ মানের মৃৎপাত্র পাওয়া গেলেও পরের দিকে নির্মাণ শৈলীর ক্ষেত্রে যুর্জাহোমের সাথে এর কিছু মিলও লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সোয়াট উপত্যকায় যব ও গমের চাষ হতে থাকে। এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতীয় উপমহাদেশে সমস্ত অঞ্চলে পরিবর্তনগুলি একই সময়ে হয়নি। একটা অঞ্চলে যে সংস্কৃতি বহুদিন আগে প্রবেশ করেছে, অন্য এলাকায় সেই বিশেষ সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটেছে অনেক পরে।

৫ ঃ উপসংহার

এই পর্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে মানব সভ্যতা বিভিন্ন স্তরেরবিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। সমাজের উদ্ভব বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা নিজস্ব মত প্রদান করেছেন। পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তর বিন্যাস ও বিবর্তন অধ্যয়ন করলে তবেই মানব ইতিহাসের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন সম্ভবপর হবে।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

১। Lenski : Human Societies : An Introduction to Macrosociology.

২। Marshal David Sadlins and Elman Service Ed.: Evolution and culture.

৩। এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ ঃ বিশ্বসভ্যতা।

৪। ইরফান হাবিব ঃ প্রাক ইতিহাস।

৭ ঃ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। মানব সভ্যতা বিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বগুলি কি কি?

২। 'নব্য প্রস্তর বিপ্লব' কথাটির মানব জীবনে তাৎপর্য কি?

৩। সভ্যতা উদ্ভব-সংক্রান্ত মতগুলি আলোচনা কর।

৪। টয়েনবির মতে সভ্যতার বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

Block / পর্যায়–২

Ancient Indian Society

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ হরপ্পা সভ্যতা (Unit-3)

২.১ ঃ হরপ্পা সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার

২.২ ঃ হরপ্পার নগর পরিকল্পনা

২.৩ ঃ কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্য

২.৪ ঃ হরপ্পার ধর্ম

২.৫ ঃ পতন।

৩ ঃ বৈদিক সভ্যতা (Unit-4)

৩.১ ঃ আর্য সমাজ

৩.২ ঃ বৈদিক সমাজ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা

৩.৩ ঃ বৈদিক ধর্ম

৩.৪ ঃ বৈদিক যুগে নারীর স্থান।

৪ ঃ উপসংহার

৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী।

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) হরপ্পা সভ্যতা ও তার সামাজিক অবস্থা

২) বৈদিক সমাজ ও পরিস্থিতি।

২ ঃ হরপ্পা সভ্যতা

২.১ ঃ হরপ্পা সভ্যতার উন্মেষ ও বিস্তার

সিন্ধু নদীর তীরে ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস ম্যাসনের দ্বারা কিছু প্রত্নবস্তু উদ্ধার এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মহেঞ্জোদারো উৎখননের ফলে একটি নতুন সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। মূলত, সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলে উৎখনন হয়ে বলে এই নতুন সভ্যতা 'সিন্ধু সভ্যতা' রূপে পরিগণিত হয়। পরে আরও অনেক অঞ্চলে এই সভ্যতার অবশেষ পাওয়া যায়। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশে এই সভ্যতার নিদর্শন দেখে জন মার্শাল মনে করেছিলেন এই সভ্যতা আরও বিস্তৃত ছিল। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে পিগট হরপ্পার বিস্তৃতিক্ষেত্র হিসাবে মাকরাণ, কাথিয়াবাড় ও হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ৯৫০ × ৭০০ × ৫০০ মাইল মাপের একটি ত্রিভুজ কল্পনা করেন, যার মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি গ্রাম ও নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একই ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। Gordon Childe মনে করেন, এই সভ্যতার বিস্তার প্রাচীন মিশরের দ্বিগুণ সুমেরু এর চারগুণ ছিল। সিন্ধুনদের পরিধির বাইরে এই সভ্যতার অবশেষ পাওয়ার ফলে সিন্ধু সভ্যতা নামটি পরিত্যক্ত হয়ে 'হরপ্পা সভ্যতা' নামে এর নামকরণ করা হয়।

হরপ্পা সভ্যতায় প্রায় ৩০০র বেশি কেন্দ্র এ পর্যন্ত উৎখনন করা হয়েছে। ১৬২২ টি আবিষ্কৃত কেন্দ্রের মধ্যে ৬১৬ টি ভারতে ও ৪০৬টি পাকিস্তানে। আধুনিক সীমারেখা অনুসারে এইসভ্যতা অবিভক্ত পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এর পশ্চিম অংশে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বেলুচিস্তানের কিছু অংশে বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতার পশ্চিমতম সীমা ছিল ইরাণ সীমান্তের ৪০ কিমি, আগে সুতকাজেনদর। পূর্বসীমা দিল্লির নিকট আলমগীরপুর। পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান ১৫৫০ কিমি। উত্তরে এই সভ্যতা হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু কখনই হিমালয়কে অতিক্রম করেনি। এর উত্তরতম সীমা কাশ্মীরের গুফরাকোট এবং দক্ষিণতম সীমা মহারাষ্ট্রের দৈমাবাদ। উত্তর দক্ষিণে এই সভ্যতার বিস্তার প্রায় ১৫০০ কিমি।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার অনুধাবন করতে হলে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। বালুচিস্থানের সীমান্তবর্তী হরপ্পীয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে মাকরান উপকূলের সুতকাজেনদর ও সুত কা-কোহ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি দাশত নদীর মোহনার নিকট ও পরেরটি শাদিকাউর নদীর মোহনার নিকট অবস্থিত। সিন্ধুপ্রদেশের দিকে আসতে লাসবেলায় সমতভূমির বালাকোটে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণ বালুচিস্থানের অন্যত্র এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া না গেলেও, সমসাময়িক গ্রামীণ বসতির সাথে সিন্ধু উপত্যকার আদান প্রদান ছিল। উত্তর বালুচিস্থানের দুটি কেন্দ্র ছিল ডাবরকোট ও পাঠানিদামব। বালুচিস্থান ও সিন্ধুর সীমান্তবর্তী অঞ্চল যা কাচ্চির সমতলভূমি নামে পরিচিত, সেখানে দুটি বড় কেন্দ্র হল নৌশারো ও জুদিরজোদারো।

সিন্ধুপ্রদেশে এ পর্যন্ত প্রচুর হরপ্পীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র পাওয়া গেছে। মূলত, এই সভ্যতার মূল কেন্দ্র সিন্ধু অঞ্চলেই ছিল। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, অম্রি, চানহুদারো, কোট-দিজি, আলি-মুরাদ প্রভৃতি। মহেঞ্জোদারো এর অবস্থান ছিল লারকানা অঞ্চলে। এটি সিন্ধুপ্রদেশের সবচেয়ে উর্বর অঞ্চল ছিল। এখানে নগরের অবশেষ পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোর আয়তন প্রায় ২৫০ একরের মত। রাভিনদীর তীরবর্তী হরপ্পার আয়তন ছিল প্রায় ১৫০

একর। এদুটি বাদে বাকি কেন্দ্রগুলি বেশ ছোট। যেমন-নারুওয়ারাধারো প্রায় ৮৬ একর, চানহুদারো ১৬ একর। এই অঞ্চলে বৃষ্টির প্রাচুর্য ও উর্বর জমির প্রাধান্য এই অঞ্চলে লোকবসতি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ।

চোলিস্থানে হাকরা প্রবাহ ধরে প্রায় ১৭৪ টি হরপ্পীয় কেন্দ্র পাওয়া গেছে। তাঁর মধ্যে ৭৪ টির আয়তনের হিসেব পাওয়া যায়। বেশিরভাগই আয়তনে ৫ থেকে ১০ হেক্টর এর মধ্যে। তবে একটি কেন্দ্র ৮০ হেক্টর বা ২০০ একর আয়তনের। পাক-পাঞ্জাবে হরপ্পা বাদে দুটি কেন্দ্র ও ভারতীয় পাঞ্জাবে পরিনত হরপ্পীয় কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৫টি। অমৃতসর, জলন্ধর, পাতিয়ালা, রোপার, লুধিয়ানাতে এই কেন্দ্র গুলি বিস্তৃত। হরিয়ানাতে অঞ্চলে পরিণত পর্বের কেন্দ্রর সংখ্যা ৪৪টি। আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, সোনপত, হিসার অঞ্চলে এই কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত। তবে এই সব অঞ্চলে হরপ্পার অন্তিম পর্বের সাক্ষ্য অনেক বেশি। ভারতীয় পাঞ্জাবে ১২৮টি ও হরিয়ানা তে২৭৭ টি অন্তিমপর্বের কেন্দ্র আছে।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুসারে রাজস্থানে ঘর্ঘর প্রবাহ ধরে পরিণত হরপ্পার কেন্দ্র হনুমানগড় এলাকাতে ২৮ টি। এদের মধ্য কালিবঙ্গান বিখ্যাত, এর আয়তন প্রায় ১১.৫ হেক্টর। উত্তরপ্রদেশে পরিণত কেন্দ্র ৩১টি, আবার শেষ পর্যায়ের কেন্দ্র ১৩০টি। পাঞ্জাবের ভাতিন্দা জেলায় মাত্র ৫০*২৫ কিমির মধ্যে ২১টি কেন্দ্র রয়েছে। জম্মুতে মান্ডা নামক একটি কেন্দ্র আছে। উত্তরপ্রদেশে আলমগিরপুর হরপ্পার পূর্বসীমা।

হরপ্পার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল গুজরাট। লোথাল ও রংপুরে হরপ্পা সভ্যতার প্রাক, পরিণত ও অন্তিম এই তিন পর্বের অবশেষ পাওয়া যায়। সম্ভবত লোথালে হরপ্পীয়দের বন্দর বা জাহাজঘাটার অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া আরও বেশ কিছু কেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এই আলোচনাতে দেখা যায় যে এই সভ্যতার সর্বাধিক বিস্তার সিন্ধুনদী অপেক্ষা সরস্বতী নদী অঞ্চলে হয়েছিল। তাই এই সভ্যতাকে অনেকে সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা বলে অভিহিত করেন। হরপ্পা সভ্যতা আনুঃ ৩০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে উদ্ভুত হলেও এর পরিণত রূপ পাওয়া যায় আনুঃ ২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। ইরফান হাবিব পরিণত হরপ্পার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।

১) কুম্ভকারের চাকে তৈরি লাল পোড়ামাটির মৃৎপাত্র। তাঁর গায়ে কিছু নক্শা, যেমন পিপুল পাতা, বৃত্ত, ময়ূর প্রভৃতি।

২) সীলমোহরে খোদিত বিশেষ ধরণের সিন্ধু লিপি।

৩) পোড়ানো ইট, সেই সঙ্গে পোড়া কাদামাটির ইট, আয়তনের ত্রিমাত্রিক অনুপাত ১; ২; ৪।

৪) ১৩.৬৩ গ্রাম এককের ভিত্তিতে আপাতভাবে আদর্শ ওজন।

৫) নগরে সোজা ও সমকোণে রাস্তা নির্মাণ। নিকাশী ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব।

৬) নগরে পৃথক নগরদূর্গের নির্মাণ।

৭) বাধানো কূপ ও জলাধার।

৮) মৃতদেহ উত্তর-দক্ষিণ মুখে চিত করে নগরের বাইরে সমাহিত করা।

২.২ ঃ হরপ্পা-সভ্যতায় নগর পরিকল্পনা

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মাধ্যমে যে নগরের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্ননিদর্শন খুঁজে পাওয়া গেছে তাতে জানা গেলো যে, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, লোথাল, কালিবঙ্গান ছিলো নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা। নগরসমূহের গঠনশৈলী দেখে ধারণা করা হয় এই সভ্যতার মানুষেরা একটি উন্নত ও পরিকল্পিত নগরব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো এবং হরপ্পা সভ্যতা ছিলো তার সমকালীন মানব-সভ্যতায় অন্যতম উন্নত সভ্যতা। কেননা এই নগরসমূহের পরিকল্পনা দেখলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে সেই সভ্যতার নগরবাসী সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরায়ণ করার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলো।

মহেঞ্জোদারোর নগরসমূহ গড়ে উঠেছিলো প্রায় এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে। আর হরপ্পা নগরের সমতল ভূমির সীমা ছিলো আড়াই মাইল। মহেঞ্জোদারো গড়ে উঠেছিলো সিন্ধুনদের তীর ঘেঁষে, অন্যদিকে সিন্ধুর উপনদী রাভী বা ইরাবতির তীরে গড়ে উঠেছিলো হরপ্পা নগরী। দুটো নগরই মোটামুটি একই পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছিলো। উভয় নগরই প্রধান দুই অংশে বিভক্ত ছিলো। একটি অংশ অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সেখানে ছিলো দুর্গ। বাকি অংশ ছিলো নিচু। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বাস করত দুর্গ এলাকায় এবং নিচু এলাকায় সাধারণ বা দরিদ্র মানুষের বসবাস ছিলো। প্রকৃত শহর ছিলো দুর্গের নিম্নাঞ্চলে। নগরগুলোর বৈশিষ্ট্য ছিলো নিম্নরূপ—

ক) রাস্তা ঃ হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো এবং কালিবঙ্গানের রাস্তাগুলো ছিলো সোজা এবং তা বিস্তৃত ছিলো উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে। একদিকের রাস্তা অন্যদিকের রাস্তার সঙ্গে সমকোণে সংযুক্ত। প্রধান রাস্তাগুলো ছিলো ৯ ফুট হতে ৩৪ ফুট চওড়া। ৫ ফুট চওড়া ছোট ছোট গলিপথও ছিলো। নগরবাসীর সুবিধার্থে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরের রাস্তার পাশে সমান দূরত্বে খুঁটি স্থাপন করা হয়েছিলো এবং রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে পথের পাশে ডাস্টবিন রাখার ব্যবস্থা ছিলো। রাস্তার প্রান্তসীমার বাড়িঘর বৃত্তাকারে নির্মিত হতো।

খ) গৃহ নির্মাণ ও দুর্গ-স্থাপত্য ঃ হরপ্পা সভ্যতায় বিভিন্ন আকৃতির বসতবাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। নগরীর বেশির ভাগ বাড়ি পোড়া ইট দিয়ে নির্মিত ছিলো। প্রত্যেকটি আবাস গৃহ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো। আকার ভেদে দুই কক্ষ থেকে পাঁচ কক্ষ বিশিষ্ট বাড়ির নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন কোন বাড়ি ছিলো বহুতল বিশিষ্ট। বাড়িগুলিতে নানা আকারের কক্ষ, কুয়ো ও স্নানাগার থাকতো। এছাড়াও শয়নকক্ষ, রান্নাঘর, প্রক্ষালন কক্ষ, গুদামঘর ইত্যাদি থাকতো। বাড়ির প্রবেশ দরজা সাধারণত সড়কমুখী হতো। বাড়ির কক্ষগুলোতে আলো বাতাস আসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলো। রান্নাঘর ও স্নানাগারের ধার ঘেঁষে পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা হতো। এতে ধারণা করা যায় যে নগরবাসীরা বিসালবহুল, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করতো।

বৃহৎ প্রাসাদ ঃ হরপ্পা সভ্যতায় বেশ কয়েকটি চমৎকার প্রাসাদের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত 'বৃহৎ হল' অন্যতম। এই হলঘরটির আয়তন ৮০ বর্গফুট। হলঘরের ভেতরে বসার জায়গা হিসেবে সারি সারি বেঞ্চ পাতা ছিলো এবং বেঞ্চগুলোর সামনে ছিলো প্লাটফরম। হলঘরের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা। ঐতিহাসিকদের ধারণা এটিকে হয়তো সভাগৃহ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তাছাড়া মহেঞ্জোদারোতে সবচেয়ে বড় ২৩০ ফুট বাই ৭৮ ফুট আয়তনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আবিষ্কৃত হগয়েছে। প্রাসাদটির চারপাশে ছিলো পুরু দেয়াল। বিশ্লেষকদের মতে এটি ছিলো শাসকদের বাসগৃহ।

দূর্গ ঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে একটি করে দূর্গ নির্মিত হয়েছিলো। দূর্গ দুটোর স্থাপত্যিক পরিকল্পনা ছিলো একই রকম। দূর্গের দৈর্ঘ্য ছিলো ১২০০ ফুট এবং প্রস্থ ৬০০ ফুট। দূর্গের চারদিকে কাদামাটি ও ও কাঁচা ইট দিয়ে পুরু করে ৪০ ফুট উঁচু প্রতিরক্ষা দেওয়াল ছিলো। দূর্গের বাইরের অংশে ৪ ফুট পুরু পোড়ানো ইটের আরেকটি অতিরিক্ত দেওয়াল ছিলো। চারপাশে নজরদারি করা জন্য তৈরি করা হয়েছিলো সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ ঘর।

শস্যাগার ঃ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার দূর্গ একটি করে দুটো বৃহৎ শ্যাগার পাওয়া গেছে। হরপ্পার শস্যাগারটি ছিলো বৃহত্তম। ১৬৯ ফুট দীর্ঘ ও ১৩৫ ফুট প্রশস্তের বৃহদায়তন শস্যাগারটি ৫০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট প্রশস্ত বিশিষ্ট বেশ কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছিলো। সম্ভবত খাদ্যশস্য নদীপথে পরিবহনের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি শস্যাগার নদীর কাছাকাছি অবস্থিত।

বৃহৎ স্নানাগার ঃ নগর দুর্গের ঠিক মাথায় অবস্থিত মহেঞ্জোদারো নগরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি বৃহৎ স্নানাগার। ১৮০ ফুট দীর্ঘ ও ১০৮ ফুট প্রশস্ত বিশিষ্ট আয়তনের এই বৃহৎ স্নানাগারের কেন্দ্রস্থলে সাঁতার কাটার উপযোগী ৩৯ ফুট লম্বা ২৩ ফুট চওড়া ও ৮ ফুট গভীর একটি জলাধার বা চৌবাচ্চা ছিলো। এটি সংযুক্ত ছিলো একটি কুয়োর সঙ্গে এবং ব্যবহৃত জল ড্রেনের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিলো। স্নানাগারের দেওয়াল ছিলো ইটের তৈরি এবং দেয়ালের গায়ে সুরকি ও বিটুমিনের প্রলেপ দিয়ে জল নিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। স্নানাগারের চারপাশ ছিলো বারান্দা এবং বারান্দার পেছনে তিন দিকে ছিলো কক্ষ ও গ্যালারী। ধারণা করা হয়, বর্তমানেও টিকে থাকা পাঁচ হাজার বছরেরও আগে নির্মিত এই স্নানাগারটি দ্বিতল ছিলো এবং সেখানে অনেকগুলো কক্ষ ছিলো। কেউ কেউ মনে করেন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই স্নানাগারটি নির্মিত হয়েছিলো।

গ) জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালি ঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীদের জন্য জল সরবরাহের চমৎকার ব্যবস্থা ছিলো। পথের ধারে অনেক কূপ খনন করা হতো। অনেক বাড়ির উঠোনেও কূপ ছিলো। বেশিরভাগ কূপ পাওয়া যায় গলিপথের ধারে। মহেঞ্জোদারোর চেয়ে হরপ্পাতেই বেশি কূপ খননের নিদর্শন রয়েছে।

বেশিরভাগ নগরের পয়ঃপ্রণালি ছিলো উন্নতমানের। পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য মাটির নিচে পয়ঃপ্রণালি বানানো হতো। নগরের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একটি করে স্নানাগার ও ময়লা জল বের হওয়ার জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা ছিলো। এই পয়ঃপ্রণালিগুলো প্রধান পয়ঃপ্রণালি বা প্রয়ঃপ্রণালির সঙ্গে যুক্ত ছিলো। পয়ঃপ্রণালিগুলো মাটির উপরে বা নিচে তৈরি হতো। পয়ঃপ্রণালি তৈরিতে ব্যবস্হার করা হতো পোড়ানো ইট। ড্রেনের মুখ সংযুক্ত ছিলো নদীর সাথে। রাস্তার ভূঃগর্ভস্থ ড্রেনে ছিলো আধুনিককালের মতো ম্যানহোল। নগরায়নের এমন আধুনিক ধারণা অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় দেখা যায়নি। এজন্যই এ. এল. বাসাম বলেছেন, রোমান সভ্যতার পূর্বে অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতার এতো পরিণত পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা ছিলো না।

২.৩ ঃ হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি

হরপ্পা সভ্যতায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের যে পরিচয় পায়য়ো যায় তাতে এখানে একটি জমজমাট অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করতো বলে ইতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন।

কৃষি ঃ হরপ্পা উপত্যকা, কালিবঙ্গান, হরপ্পায় শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ চাষাবাদের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত

হওয়ায় এ সভ্যতার আধিবাসীরা যে মূলত কৃষিজীবী ছিলেন এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। তাছাড়া সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থার বিবেচনায় নগর-পত্তনকারী একটা স্থায়ী জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা কৃষিনির্ভর হওয়াটাই অতি স্বাভাবিক। এখানে গম, যব, মুগ, মসুর, সর্ষে, তিল, বার্লি, তুলা, বাজরা প্রভৃতি শস্য চাষের কথা জানা যায়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতো ষাঁড়। সিন্ধু সভ্যতায় বৃহৎ শস্যাগারের উপস্থিতি থেকে সভ্যতার কৃষি সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। ধান উৎপাদনের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া না গেলেও খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে লোথাবাসী ধান উৎপাদন করেছে অনুমান করা হয়।

পশুপালন ঃ সিন্ধু সভ্যতায় গৃহপালিত জন্তু হিসেবে কুঁজ বিশিষ্ট ষাঁড়, মহিষ, মেষ, শূকর, বিড়াল, হাতি উল্লেখযোগ্য ছিলো বলে মনে করা হয়। কুকুরকে প্রিয় পোষ্য জীব হিসেবে দেখা হতো। উট ও গাধা ছিলো ভারবাহী পশু। তবে সিন্ধু সভ্যতায় অশ্বের ব্যবহার ছিলো না বলে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক একমত।

শিল্প ঃ সিন্ধু সভ্যতায় বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠার নিদর্শন পাওয়া যায়। তুলা ও পশমের সুতা কাটা ও বস্ত্র তৈরিতে মহেঞ্জোদারো ও হেরপ্পার বয়নশিল্পীরা পারদর্শী ছিলো। তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও ব্যবহার্য দ্রব্য ধাতব শিল্পের অগ্রগতির কথা প্রমাণ করে। অঙ্কার তৈরিতেও তারা পারদর্শী ছিলো। তবে সেখান থেকে লৌহজাত কেন প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কৃত না হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, সিন্ধুবাসীরা লোহার ব্যবহার জানতো না। মৃৎশিল্পীরা নানারকম পাত্র তৈরি ছাড়াও কাঁচের মতো চকচকে ও মসৃণ চীনা মাটির পাত্র নির্মাণে দক্ষ ছিলো। নির্মাণ কার্যে ব্যবহার হতো কাঁচা এবং আগুনে পোড়া ইট। এসব ছাড়াও হাতির দাঁতের চিরুনি, হাতির দাঁতের সূঁচ, কাঠের হাতলবিশিষ্ট তামা ও ব্রোঞ্জের আয়না, মৃৎপাতর, সীল প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পও গড়ে উঠেছিলো।

ব্যবসা ঃ বাণিজ্য-সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা পর্যাপ্ত দ্রব্য উৎপাদন করতো। ভারতের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের বাইরে বহু দেশে এসব পণ্যের চাহিদা ছিলো। সিন্ধু সভ্যতার বিভন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট ও কাথিওয়ারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। শি'রে কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করা হতো। পারস্য, আফগানিস্তান, মিশর, চীন, সুমেরীয় ও ক্রিট সভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। সিন্ধু সভ্যতার লোথালে একটি পোতশ্রয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে যার দৈর্ঘ্য ৭১০ ফুট ও প্রস্থ ১২০ ফুট। সিন্ধু সভ্যতা থেকে হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র, মণিমুক্তা, ময়ূর রপ্তানি হতো। অন্যদিকে আমদানি হতো তামা ও রূপা। সিন্ধু সভ্যতার কিছু সীল সুমেরী অঞ্চলে এবং সুমেরীয় অঞ্চলের কিছু নিদর্শন হরপ্পায় পাওয়ায় উভয় সভ্যতার মধ্যে যোগাযোগের প্রমাণ স্বীকৃত। সুমেরীয় লিপিতে উল্লিখিত মেলুহাদের ঐতিহাসিকরা হরপ্পার সাথে এক করে দেখেছেন।

ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি ঃ বিভিন্ন দ্রব্যাদি ওজনের জন্য নানান সামগ্রী আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা বিভিন্ন ওজন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো। ছোট বাটখারাগুলির আকৃতি ছিলো চারকোণাকার এবং বড়গুলি ছিলো গোলাকার ও কিছুটা কৌণিক। বাটখারা তৈরি করা হতো শক্ত পাথর দিয়ে। বাটখারাগুলি সমমাপের হওয়ায় ধারণা করা হয় সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা সঠিক ওজনের ব্যাপারে সতর্ক ছিলো। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হয়, বড় বড় জিনিসের ওজন করার জন্য ব্রোঞ্জের স্কেল ব্যবহার করা হতো। খুব ভারী বস্তু ওজন করার জন্য ব্যবহার করা হতো কাষ্ঠখণ্ড।

কাষ্ঠখণ্ডের একপ্রান্তে দ্রব্য বেঁধে ওজন করা হতো। তাদের ওজন ছিলো ১৬ ভিত্তিক, যেমন ১৬, ৬৪, ১৬০, ৩২০, ৬৪০। কিছুকাল আগে আমাদের দেশে ১ আনায় ১ টাকা, বা স্বল্প ওজনের ক্ষেত্রে ১ আনায় ১ ভরি কিংবা বড় ওজনে ১ ছটাকে ১ সের ব্যবহৃত হতো। কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা স্কেলের মতো লাঠি ব্যবহার করতো। তাদের স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিলো আধুনিক ২০ নির্দিষ্ট সদৃশ ইঞ্চি দণ্ডে পরিমাপ সমান। ইঞ্চির ৬২. থাকতো। কাটা ঘর এককের।

২.৪ ঃ হরপ্পার ধর্ম

হরপ্পার ধর্মীয় রীতি সম্পর্কিত ধারণা মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে পাওয়া যায়। লিখিত উপাদানের অভাবহেতু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যথা—ধাতু বা মাটির মূর্তি (প্রচুর পোড়ামাটির নারী মূর্তি, তামা বা মাটির সিলমোহর, পাথরের লিপিচিত্র, চিত্রিত মৃৎপাত্র ইত্যাদি থেকে হরপ্পীয় ধর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তবে লিপির পাঠোদ্ধার না হবার কারণে এই সিলগুলির প্রকৃত অর্থ আমদের কাছে অধরাই থেকে গেছে।

১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন মার্শাল এই সভ্যতার ধর্মের কিছু মূল তত্ত্বের উল্লেখ করেন। যেগুলি থেকে হরপ্পার ধর্মের অস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। মার্শাল এই ধর্মের মধ্যে পরবর্তী হিন্দু ধর্মের বীজ লক্ষ্য করেছেন। যা পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে।

হরপ্পায় প্রাপ্ত বিভিন্ন নারী মূর্তি দেখে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছে্ এখানে উর্বরতার উপাসনা করা হত। এই রকম নারীমূর্তি পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতায় পাওয়া যায়। এই থেকে মনে করা হয় হরপ্পীয়রা মাতৃকাদেবীর উপাসনা করতো। এই মূর্তিগুলি ছাড়াও একটি সীলে নগ্ননারীমূর্তি চিত্রায়িত হয়েছে, যার জননাঙ্গ থেকে একটি গাছর উৎপত্তি হয়েছে। এই সীলটি Proto type of Earth Mother নামে পরিচিত। আবার অনেক পোড়ামাটির মূর্তিতে গর্ভবতী নারী উপস্থাপিত হয়েছেন।

এই মূর্তিগুলি ছাড়াও এখানে অনেক পশু মূর্তি পাওয়া গেছে। পশুদের মধ্যে ষাঁড়, হাতি, সাপ, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি। আবার বেশ কিছু সীলে মিশ্র পশুর চিত্র পাওয়া যায়। এগুলি সম্ভবত তাদের ধর্মের সাথে যুক্ত ছিল।

একটি সীলে যোগাসনে বসা একটি পুরুষ মূর্তি পাওয়া যায়। এই পুরুষটিকে ঘিরে বন্য পশুদের পাওয়া যায়। এই চিত্রটিকে মার্শাল আদি শিব বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এই নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া এখানে বৃক্ষপূজার নিদর্শন পাওয়া যায়।

২.৫ ঃ পতন

আনু খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে উদ্ভুত হরপ্পা সভ্যতা, আনু ১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্ব অব্দে সমাপ্ত হয়। হরপ্পা সভ্যতা কেন ও কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। সম্ভবত সর্বত্র একই সঙ্গে বা একই কারণে পতন ঘটেনি।

(১) অনেকের মতে, নাগরিক জীবন যাত্রার মানের অবনতি ও বাণিজ্য হ্রাস এই সভ্যতার পতন ডেকে এনেছিল।

(২) অনেকের মতে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে

রয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও বন্যা। মহেঞ্জোদারোতে বন্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্শাল, ম্যাকে, রেইক্স, ডেল্‌স প্রভৃতিরা মনে করেন বন্যাই এই সভ্যতার পতনের কারণ।

(৩) অনেকে আবার মনে করেন বন্যা নয়, অনাবৃষ্টির জন্যই এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। বৃষ্টিপাতের তারতম্য ও জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তনের কারণ ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদন ও নগরায়ণ বলে অনেকে মনে করেন।

(৪) রেইক্স সহ কেউ কেউ নদীর গতিপথের পরিবর্তনের মধ্যে পতনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। এর ফলে মরুভূমির মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

(৫) কেউ কেউ মনে করেন ভূমিকম্প এই সভ্যতার পতন ডেকে এনেছিল।

(৬) অনেকের মতে, বিদেশি শত্রুর আগমন এই সভ্যতার অন্যতম প্রধান কারণ। বিদেশি শত্রু বলতে অনেকেই আর্যদের চিহ্নিত করেছেন। এই মতের প্রবক্তা গর্ডন চাইল্ড ও ডঃ হুইলার। বর্তমানে অবশ্য এই বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৩ ঃ বৈদিক সভ্যতা (Unit-4)

৩.১ ঃ আর্য সমস্যা

আর্য এই নাম বা অভিধাটিকে কেন্দ্র করে যে সম্যাস সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল ঐতিহাসিক সমস্যা নয় বরং প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সমস্যা নয়। সুতরাং এক বৃহত্তর আঙ্গিকে এই সমস্যাকে আলোচনা করা উচিত। এই সমস্যার দুটি দিক আছে, একটি ভাষাতাত্ত্বিক ও একটি প্রত্নতাত্ত্বিক। এই দুটি ধারার মাধ্যমে ঐতিহাসিকরা আর্যদের আদি বাসভূমি এবং তাদের উৎস নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিও বণিক ফিলিপ্পো সসেত্তি ভারতে এসে ইতালিও ভাষার সাথে ভারতীয় ভষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। একটি অঞ্চলের ভাষার সাথে অন্য অঞ্চলের বাষার মিল থাকে কেন, সেই প্রশ্ন থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের চর্চার সূত্রপাত। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাতে উেইলিয়াম জোন্স গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত ভাষার উদ্ভুত মিল লক্ষ্য করেন। তার রচনাটি ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'Asiatic Researches, Vol-I' পত্রিকায় 'The Aniversary Discourse' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মাক্সমুল্লার আর্য কথাটি প্রথমে ব্যবহার করেন। "The Home of the Aryans" নামক নিবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করতে চাইলেন, আর্য একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম, কোনো জাতিগোষ্ঠীর নাম নয়। সুতরাং আর্য তাকেই বলে যে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কথা বলে। অনেকেই তাঁর মতের বিরোধিতা করেছিলেন। লিখিত বা সাহিত্যগত উপাদানে এবং লিপিতে আর্য শব্দটির বিবর্তনের দিকে তাকালে কিন্তু দেখা যায়, 'ঋগ্বেদ'-এ আর্যদের দস্যুদের থেকে পৃথক বলা হয়েছে এবং দস্যু বা দাসদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরোধী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অনুমান করা যায় যে, বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরই প্রথমে আর্য নামে ডাকা হত। নৃপতি দারয়বয়ূস

তাঁর 'নকশ-এ-রুস্তম' লেখতে নিজেকে আর্য বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর বেহিস্তান লেখতে বলা হয়েছে, সেটি আর্য ভাষায় লেখা। সুতরাং সেখানে আর্যবংশ, আর্যজাতি ও আর্যভাষার ধারণা গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এখানে আর্য শব্দটি প্রাথমিকভাবে একটি ভাষা এবং পরে ঐ ভাষাভাষীদের এবং তাদের শাসিত অঞ্চলকে বোঝাত। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, আদি সাক্ষ্যসমূহে আর্য বলতে প্রাথমিকভাবে একটি ভাষাগোষ্ঠীকেই বোঝানো হত। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিল গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মানী বা গথিক, তোখারীয়, সংস্কৃত ও প্রাচীন ইরানীয়।

১) **লিঙ্গুইস্টিক 'আর্য' ঃ** প্রাথমিকভাবে এই শব্দটি একটা ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষণ। এইটুকু বলা যায় যে গোটা ইউরেশিয়ায় যে অসংখ্য ভাষা আজকের দিনে প্রচলিত, এবং আরও যে সমস্ত হারিয়ে যাওয়া ভাষার কথা ঐতিহাসিক তথ্যে বা প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যে পাওয়া গেছে তাদের অনেকগুলোর মধ্যেই একটা নিবিড়, নিকট সম্পর্ক আছে। সেই নিবিড় সম্পর্কের ভিত্তিতে এই ভাষাগুলোকে বেশ কয়েকটা ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়.... একই গোষ্ঠীর মধ্যের ভাষাগুলোর নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক খুবই কাছের, তুলনায় দুটো আলদা ভাষাগোষ্ঠীর দুটো ভাষার মধ্যে সম্পর্ক সাধারণভাবে তুলনায় দূরের এই ভাষাটি যখন বেঁচে ছিল, তখন সেই ভাষায় যারা কথা বলত তাদেরকে বলা হয় প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষাভাষী মানুষ (সংক্ষেপে PIE speakers)। এবার একটা ভাষা খুব পুরনো সময়ে খুব বড় ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে থাকতে পারে না, কারণ আঞ্চলিক ব্যারিয়েশনই বাড়তে বাড়তে এক সময় দুটো আলাদা ডায়ালেক্ট পরস্পর দুর্বোধ্য হয়ে যাবে... অর্থাৎ আলাদা ভাষা হয়ে যাবে PIE speaker দের culture একরকম কাছাকাছি ছিল, যাকে আমরা একটাই culture বলে ধরতে পরি। আর সেই culture কে আমরা বলব PIE culture। আবার জেনেটিকালিও এই মানুষগুলোর নিকট সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা যথেষ্ট.... তাই একই সংস্কৃতি ও জেনেটিকালিও নিকট সম্পর্কিত, এটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে .... সেটাকে আমরা PIE ethnic group বলতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে PIE ethnic group ও PIE speakers একই, তাই সেটা আর বলব না।

ভারতীয় উপমহাদেশে IE ভাষাগোষ্ঠীর অনেকগুলোই অনেকগুলো ভাষা আজ বিদ্যমান (বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি, আবার তামিল IE নয়), বেশ কয়েকটা আজ নেই কিন্তু জানা আছে (Vedic Sanskrit, Classical Sanskrit ইত্যাদি)। এই সবকটার একটা latest common ancestor আছে... এবং সেই ভাষাটাও নিশ্চয়ই PIEর সন্তান ভাষাগুলোর একটা.... সেই ভাষাটাকে আমরা বলব ইন্দো-আর্য (Indo-Aryan, সংক্ষেপে IA, অনেক সময় Old Indic বলেও এই ভাষাটাকে বোঝানো হয়).... সেই ভাষাভাষী মানুষদের আমরা বলব আর্য।

অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক ত্রিবেদ, কল্ল, গঙ্গানাথ ঝা, প্রমুখ মনে করেন ভারতীয় উপমহাদেশ আর্যদের আদি বাসভূমি। এই প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি হল এই যে, বৈদিক সাহিত্যে কোথাও অভিপ্রয়ান বা আদি কোনও বাসভূমির কথা বলা নেই। সপ্তসিন্ধু বা পাঞ্জাবকেই তারা তাদের বাসভূমি রূপে উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদের সাথে জাতীয়তাবাদের যতটা সম্পর্ক রয়েছে, ইতিহাসের যুক্তির ততটা সম্পর্ক নেই। ঋকবেদে দ্রাবিড় ও মুণ্ডারি শব্দ রয়েছে প্রায় ৩০০টি, যা অন্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। এছাড়া মূর্ধন্য ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, এই ভাষার ক্ষেত্রে। তাই অনেক ঐতিহাসিক আর্যদের আদি বাসস্থান হিসেবে ভারতের বাইরের অঞ্চলকে নির্দেশ করেন। বেদ ও আবেস্তার ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য, গ্রীক সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের সংস্কৃতির অভূতপূর্ব সাদৃশ্য তাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসভূমির সন্ধানে জাইলস বার্চ গাছ ও সেইরকম শব্দের তুলনামূলক আলোচনা করে মনে করেন এদের আদিবাস ইউরোপের কার্পেথীয় পর্বত, বলকান অঞ্চলে ছিল। ব্র্যাণ্ডেস্তাইন এই মত মানেন না। তিনি অশ্ব এবং পশুচারণের মত শব্দের প্রাচুর্য লক্ষ্য করে মনে করেছেন, রাশিয়া বা ইউক্রেনের তৃণভূমি অঞ্চলে ইন্দো ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন মারিয়া গিয়ামবুটাস। তিনি দক্ষিণ রাশিয়া ও ইউক্রেনের দক্ষিণাংশে দ্রুত সঞ্চরণশীল পশুপালক, সংস্কৃতির অবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। একে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয়দের সাথে আদি বাসভূমি মনে করেছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল এশিয়া মাইনরে প্রাপ্ত বোঘাসকোই লিপি। যেখানে হিত্তি ও মিত্তানী শাসকদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও নাসত্ত্য এই বৈদিক দেবতাদের উল্লেখ ছিল। আবার পারসিকদের আবেস্তা ও বেদের প্রচুর মিল থাকা সত্ত্বেও, আবেস্তায় দেব শব্দটি নিন্দনীয়, যার বিপরীতে অসুর শব্দটি ভারতে নিন্দনীয়। কিন্তু ঋকবেদে অনেক সুক্তে দেবতাদের অসুর অভিধা প্রদান করা হয়েছে। এই শব্দটি তেজশালী, শক্তিশালী অর্থে ব্যবহার করা হত। মনে করা হয়, বৈদিক ও আবেস্তীয়রা একটি সময়ে একগোষ্ঠী ছিল, পরে তাদের মধ্যে বিভাজনের ফলে একটি গোষ্ঠী ভারতে প্রবেশ করেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ইন্দো-ইউরোপীয়দের বাসভূমির প্রশ্নটি আজও সমাধান করা যায়নি। এদেরকে জাতিগোষ্ঠী রূপে না দেখে ভাষা হিসেবে আলোচনা করার কথা আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তবে সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, ইউরোপীয় বাসভূমি থেকে পারস্যের মধ্য দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

৩.২ ঃ বৈদিক সমাজ ও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা

বৈদিক সমাজে উপজাতীয় ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋকবৈদিক সাহিত্যের যথাযথ বিশ্লেষণ করলে যে সমাজ ব্যবস্থার চিত্র উঠে আসবে, তা একটি গোষ্ঠী বিভক্ত সমাজ ছিল। রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ, একই পরিবার থেকে এই জাতি গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব। বেদে জাতি গোষ্ঠী বলতে পঞ্চ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঁচটি জাতি ছিলেন অনু, যদু, পুরু, তুর্বশ, দ্রুহু। ঋকবেদে সপ্তম মণ্ডলে অষ্টাদশ সুক্তে এই পাঁচ জাতির সাথে তৃৎযু গোষ্ঠীর নেতা পিজবন পুত্র সুদাসের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। যা দশ রাজার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

সমাজ জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল পরিবার। এই পরিবার নিঃসন্দেহে পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রবীণতম পুরুষ পরিবার পরিচালনা করতেন। পিতা ছিলেন পরিবারের প্রধান। এছাড়া তাঁর সন্তান-সন্ততি, পৌত্র-পৌত্রীরা একই পরিবারের বসবাস করতেন। বৈদিক সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চতুর্বর্ণ প্রথা। দশম মণ্ডলের পুরুষ সুক্তে চারবর্ণের উৎপত্তি আদি পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হয়েছ। মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়েছে। তবে এই বিভাজন জন্মভিত্তিক না হয়ে কর্ম ভিত্তিক ছিল। একটি কথা এই প্রসঙ্গে প্রনিধানযোগ্য যে দশম মণ্ডল ব্যাতীত ঋকবেদের অন্যত্র চতুর্বর্ণ প্রথার উল্লেখ নেই। ঋকবেদে বর্ণ দুটি, আর্যবর্ণ ও দাসবর্ণ। দাস বর্ণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের বলা হয়েছে 'কৃষ্ণত্বাচ' বা কালো গাত্রবর্ণের। ফলে অনুমেয় যে ঋকবেদে বর্ণভিত্তিক ব্যবস্থা চতুবর্ণকে নির্দেশ করেনি। ঋকবেদে একটি সূক্তে এক ব্যক্তির পরিচয় হল, তিনি কবি, তার পিতা চিকিৎসক (ভিষক), মাতা শস্যপেষণ করেন (উপল প্রেক্ষিণী)। অর্থাৎ বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরনের বিষয়টি এই সময়ে প্রচলিত ছিল না।

অন্যদিকে সামাজিক সংগঠন হিসেবে বর্ণ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল জন, বিশ, গণ, প্রভৃতি। এই শব্দগুলি কৌম সংগঠনের আভাস দেয়। এর জীবনযাত্রা ছিল অনেক সহজ করল। সম্ভবত পশুচারণ ভিত্তিক সমাজে খাদ্যসম্ভার সকলের মধ্যে বন্টিত হত। R.S Sharma মনে করেন সামাজিক বৈষম্য এই সময় অনেক কম ছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক ব্যবস্থার জটিল রূপ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের মর্যাদা বৃদ্ধি হতে থাকে, শূদ্রের অবস্থান খারাপ হতে থাকে। তিন বর্ণ দ্বিজ নামে পরিচিত হয়। বর্ণব্যবস্থা কর্ম অনুসারে না হয়ে, জন্ম অনুসারে হতে শুরু করে। বংশগত পেশা ভিন্ন অন্য পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আধিপত্য সর্বাধিক হয়, তারপর ক্ষত্রিয় রাজাদের স্থান, বৈশ্যরা দ্বিজ মর্যাদা প্রাপ্ত হলেও, সমাজে এরা ওপরের দুই শ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত ছিলেন। তবে শূদ্রের অবস্থা ছিল শোচনীয়, তাকে যখন খুশি হত্যা পর্যন্ত করা যেত।

অর্থনৈতিক জীবনে ঋকবৈদিক যুগে পশুচারণভিত্তিক অর্থনীতি লক্ষ্য করা যায়। ঋকবেদে কৃষির উল্লেখ বিরল। রাজার এই যুগে অভিধা ছিল 'গোপতি', যা সমাজে গবাদিপশুর গুরুত্ব বর্ণনা করে, পাশাপাশি এই সময়ের যুদ্ধবিগ্রহ মূলত লুণ্ঠনকেন্দ্রিক, যেখানে গোষ্ঠীপতি রাজা লুণ্ঠনে নেতৃত্ব দিতেন, পরে সেই সম্পদ 'বিশ' বা কৌমের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হত। এই সময়ে অভিজ্ঞ কৌম সদস্যদের নিয়ে 'সভা' এবং সকল কৌমের মানুষদের নিয়ে 'সমিতি' নামক সামাজিক সংস্থা ছিল। এছাড়া ছিল 'বিদথ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কৃষিকাজের ব্যাপক বৃদ্ধি সমাজ জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। এই সময় জমির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজার অভিধা এই সময় 'ভূপতি', 'মহীপতি' অর্থাৎ পৃথিবীর অধিপতি। এইভাবে দেখা যায়, বৈদিক যুগে সমাজব্যবস্থার মধ্যে একটি পরিবর্তনশীল সমাজের চিত্র পাওয়া যায়।

৩.৩ ঃ বৈদিক ধর্ম

বৈদিক যুগের ধর্ম (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে ৫০০ অব্দ) অথবা বৈদিক ধর্ম, বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা প্রাচীন হিন্দুধর্ম বা, প্রাচীন ভারতের প্রেক্ষাপটে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম হল আধুনিক হিন্দুধর্মের আদি রূপ। ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্মের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়।

চার বেদের মন্ত্র অংশে বেদের অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি রক্ষিত আছে। এই অংশটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষার রচিত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন পুরোহিতেরা। পূজার পদ্ধতি আধুনিক হিন্দুধর্মে অনেকাংশে অপরিবর্তিত থাকলেও, রক্ষণশীল শ্রৌতদের একটি অংশ এখনও মৌখিকভাবে স্তোত্র শিক্ষার পরম্পরা বজায় রেখেছে।

বৈদিক যুগে রচিত ধর্মগ্রন্থগুলি বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এগুলি প্রধানত চারটি বৈদিক সংহিতা। তবে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও কয়েকটি প্রাচীন উপনিষদ্ (বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য) এই যুগে রচিত বলে মনে করা হয়। বেদের অনুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা আছে। ১৬ বা ১৭ জন শ্রৌত ও বৈদিক পুরোহিত মিলে এই অনুষ্ঠান সম্পাদনা করতেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি এবং অন্যান্য বৈদিক স্তোত্রগুলি ঋষিদের কাছে দিব্য উপায়ে

প্রকাশিত হয়েছিল। তাই এই ঋষিদের ওইসব স্তোত্রের 'মন্ত্রদ্রষ্টা' (যিনি মন্ত্র দেখেন বা শোনেন) মনে করা হয়; রচয়িতা মনে করা হয় না। বেদকে অপৌরুষেয় মনে করা হয়। কারণ, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, কোনো মানুষ বেদ রচনা করেননি। তাছাড়া বেদকে অপরিবর্তনশীল ও মনে করা হয়।

হিন্দুদের অন্ত্যেষ্টী ক্রিয়া ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে একই ভাবে প্রচলিত। তবে এই সব অনুষ্ঠান সেমেট্রি এইচ কালচারেও (Cemetery H Culture) দেখা যেত। ঋগ্বৈদিক যুগের শেষ দিকে মৃত (''অগ্নিদগ্ধ'') ও জীবিত (''অনগ্নিদগ্ধ'') পুর্বপুরুষদের আবাহনের একটি ক্রিয়া যুক্ত হয়।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বরুণ। তাকে ঋত বা পবিত্র নিয়মাবলির প্রধান বলা হয়েছ। তাঁর চক্ষু স্বরূপ ছিলেন সৌরদেবতা মিত্র। তাদের একত্রে দেব ও অসুরদের সম্রাট বলা হয়েছে। কিন্তু ক্রমশ তার মর্যদা হ্রাস পেয়ে, যুদ্ধদেবতা ইন্দ্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই গুরুত্ব বৃদ্ধি হয়েছিল ঋকবেদের রচনার সময় কালেই। সম্ভবত উপজাতীয় যুদ্ধকেন্দ্রিক সমাজে, যুদ্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি, ইন্দ্রের মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম সূচক ছিল। ঋকবেদে ইন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত সূক্তের সংখ্যা সর্বাধিক।

আগুনের দেবতা অগ্নিকে আরাধনা করা হত দেবতাদের সাথে মানুষদের মাধ্যম হিসেবে, পাশাপাশি জীবনে আগুনের গুরুত্ব এর থেকে পরিস্ফুট হয়। ঋকবেদে অগ্নিকে উৎসর্গীকৃত সূক্তের সংখ্যা ইন্দ্রের পরেই দ্বিতীয়। এছাড়া আকাশের দেবতা দ্যু এবং ভূমির দেবী পৃথিবী একত্রে পিতা-মাতা রূপে উপাসিত হতেন। দেবমাতা রূপে উপাসিত হতেন অদিতি। তিনি ও তাঁর সাত পুত্র একত্রে আদিত্য নামে পরিচিত।

পরবর্তী বৈদিক ধর্মে যেসব প্রধান যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানগুলি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল, সেগুলি হল ঃ সোম-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি, অগ্নিষ্টোম, হবির্যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ঋতুকালীন চতুর্মাস্য যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ পুরুষমেধ, অথর্ববেদে লিখিত চিকিৎসামূলক ক্রিয়াকাণ্ড ও মন্ত্রপাঠ। আগুন বা নদনদীর পূজা, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতার পূজা, মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞ ছিল বৈদিক সমাজে প্রধান উপাসনার পদ্ধতি। পুরোহিতেরা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠান করতেন। মানুষ দেবতার কাছ থেকে অধিক সন্তান, বৃষ্টিপাত, গবাদি পশু, দীর্ঘায়ু ও মৃত্যুর পর স্বর্গ কামনা করত। পুরোহিতদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল। হোতা (যিনি মন্ত্রপাঠ করতেন), উদগাতা (যিনি সামগান করতেন), অধবযু (যিনি যজ্ঞে আহুতি দিতেন), ও ব্রাহ্মণ (যিনি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন)। আধুনিক হিন্দুধর্মেও পুরোহিতরা বৈদিক স্তোত্র পাঠ করে উন্নতি, ধনসম্পত্তি ও সর্বসাধারণের কল্যাণ প্রার্থনা করেন। এই ভাবে দেখা যায় বৈদিক ধর্ম যা প্রথম দিকে একটি সরল প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হলেও, পরবর্তী কালে জটিল যজ্ঞানুষ্ঠান এই ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।

৩.৪ ঃ বৈদিক যুগে নারীর স্থান

সাধারণভাবে বলা হয় বৈদিক যুগে নারীর স্থান ছিল খুব উচ্চস্থানে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুত্রসন্তানের জন্ম অভিপ্রেত হলেও কন্যার যত্ন ও লালনপালনে কোনো ত্রুটি থাকত না। তার শিক্ষার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হত। যে নারীরা বিবাহ না করে বেদ পাঠ করে জীবন কাটাতেন তাদের বলা হত ব্রহ্মবাদিনী, আর যারা বিবাহ অবধি বেদ শিক্ষাগ্রহণ করতেন তারা ছিলেন সদ্যবধু। সুকুমারী ভট্টাচার্য মনে করেন, ব্রহ্মবাদিনী নারীদের কথা

বলা হলেও, সংখ্যায় তারা খুব নগণ্য। ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারার মতো নারীরা বৈদিক শ্লোক রচনা করেছিলেন। উপনিষদের যুগে গার্গীর মতো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নারীরা উপনয়নের অধিকারিণীও ছিলেন। উচ্চবর্ণের মহিলারা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে যাগযজ্ঞে অংশ নিতেন। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারিণীও ছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করলে পুনর্বিবাহ করতে পারতেন।

কিন্তু বৈদিকযুগে, বিশেষত পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থা যে সবটাই ভাল ছিল তা নয়। সমাজে শূদ্র ও নারীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। নারীকে বলা হত 'ভার্যা'; অর্থাৎ, ভরণীয়া বা যাকে ভরণ করতে হয়। তার স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। মনু বলেছেন, শিশুকালে নারী পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বয়সকালে বা বৈধব্য জীবনে পুত্রের অধীন। বিবাহকেই নারীর উপনয়নের সমতুল বলেছেন মনু। পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও নারীদের মধ্যে তা ছিল না। স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হত। অথর্ব বেদে অবশ্য নারীদের বহুবিবাহের কথা উল্লেখ আছে। ঋকবৈদিক যুগে বিবাহ নারীর পক্ষে বাধ্যতা মূলক না হলেও পরে তা হয়েছিল। এই সময়ে সতীদাহ প্রথা চালু ছিল না। বিধবা অপুত্রক হলে দেওর বা অন্য কোন আত্মীয়ের সাথে বিবাহের নিয়ম ছিল। অথর্ব বেদের যুগে সহমরণ বা সতীদাহের কথা জানা যায়। বিবাহে কন্যাপণের কথাও জানা যায়। ঋক্‌বৈদিক যুগের গোড়ায় নারী গৃহে আবদ্ধ থাকত না; এমনকি মুদগলিনী, বিশপলা, শশিয়সী প্রভৃতি নারীর নাম পাই, তাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে ক্রমশ নারীর স্থান হয়েছিল অন্তঃপুরে। পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়াই ছিল তার প্রধান কাজ। নিঃসন্তান বা শুধু কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়া নারীকে পরিত্যাগ করার অধিকার তার স্বামীর ছিল। সেক্ষেত্রে স্বামী আবার বিবাহ করতে পারত। নারীর মন বলে কিছু আছে, তা মনে করা হত না, এমনকি তাকে প্রহার করবার অধিকার তার স্বামীর ছিল। এক কথায় বলা যায়, প্রাচীন যুগে 'নারীস্বাধীনতা' ছিল বলে অনেকের যে ধারণা আছে, তা অনেকাংশে ভ্রান্ত বলে মনে করা হয়। নারী ছিল পুরোপুরি পুরুষের অধীন এবং তারই ''সম্পত্তি''।

বেদ পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থান ক্রমশ অবনতি হয়। বৌধায়নের ''ধর্মশাস্ত্রে'', মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারদের রচনা, কৌটিল্যের 'অর্থাশাস্ত্র', বাৎসায়নের 'কামসূত্র', কালিদাসের বিভিন্ন নাটক, বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত', হর্ষবর্ধনের নাটক 'রত্নাবলী', মাঘের 'শিশুপালবধ', দন্ডির 'দশকুমারচরিত,' শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে নারীর দুরাবস্থার কথা জানতে পারা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা ছিল শুধুমাত্র পুত্রের মাতা। তার কোনা স্বাধীনতা ছিল না। স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব বিবাহ পদ্ধতি ক্রমশ অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং আর্য ও আসুর বিবাহ প্রথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিধবা বিবাহ ক্রমশ উঠে যেতে থাকে এবং জীবনের বাকি অংশে তারা শোক এবং কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে থাকে। তবে পর্দাপ্রথা ছিল না। নারীরা উৎসব এবং খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করতে পারত। হর্ষবর্ধনের সময় (সপ্তক শতকে) সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। শিক্ষাদীক্ষা উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। তাদের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয়। সমাজে একমাত্র পতিতারাই শিক্ষিতা এবং স্বাধীন ছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈন পরিবারের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল। সাহিত্যে অবশ্য নারীকে প্রেমিকা রূপে দেখানো হয়েছিল। কলহন রক্ষণশীল ও নারী স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন। আবার এইযুগে লীলাবতী ও খনার মতো বিদূষী মহিলারও সাক্ষাৎ মেলে। নারী স্বাধীনতা না থাকলেও তাদের যথেষ্ঠ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। স্বামীকে তার সাধ্যমতো স্ত্রীর ভরণপোষণ, বিলাসসামগ্রী, এবং অলংকারের দায়িত্ব গ্রহণ

করতে হত। নারীদের তিরস্কার এবং প্রহার করা নিন্দনীয় ছিল। যে সব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের প্রহার করেন, ঈশ্বর তাদের পূজা গ্রহণ করেন না বলে শাস্ত্রের বিধান ছিল। এইভাবে দেখা যায় নারীদের অবস্থান বৈদিক যুগ থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছিল।

৪ ঃ উপসংহার

বর্তমান পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম, হরপ্পা সভ্যতার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে নগরায়নের সূচনা হয়, এই সভ্যতার পতনের পরে বৈদিক সভ্যতার উত্থানের কথা আমরা জানতে পারলাম। পাশাপাশি এই দুই সভ্যতার সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই স্থানে করা হল।

৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Ranabir Chakraborty : Exploring Early India.

২। Romila Thapar : The Penguin History of Early India.

৩। Romila Thapar : Cultural past.

৪। রণবীর চক্রবর্তী ঃ ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব।

৫। ইরফান হাবিব ঃ সিন্ধু সভ্যতা

৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। হরপ্পার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। ইন্দোইউরোপীয়দের আদি বাসভূমি সংক্রান্ত মতবাদগুলি কি কি?

৪। বৈদিক ধর্মের প্রকৃতি কেমন ছিল? নারীদের বৈদিক ও তার পরবর্তী যুগে কিরূপ মর্যাদা প্রদান করা হত?

Block / পর্যায়–৩

Ancient Egypt

প্রাচীন মিশর

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ মিশরীয় সভ্যতার তথ্যসূত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও নারীরস্থান (Unit-5)

২.১ ঃ তথ্যসূত্র

২.২ ঃ সমাজ ব্যবস্থা

২.২.১ ঃ মিশরীয় সমাজ

২.২.২ ঃ পরিবারিক জীবন

২.২.৩ ঃ অর্থনৈতিক জীবন

২.৩ ঃ প্রাচীন মিশরে নারীদের অবস্থান

৩ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র পুরোহিততন্ত্র ও ওসিরিয়ান উপাসনা (Unit-6)

৩.১ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র

৩.২ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্রের প্রকৃতি

৩.৩ ঃ পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় চেতনা

৩.৪ ঃ ওসাইরিস আরাধনা

৩.৫ ঃ আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ

৪ ঃ হিট্টাইট আক্রমণ, মিশরীয় আইন ব্যবস্থা, মমিকরণ প্রথাসমূহ (Unit-7)

৪.১ ঃ মিশরীয় ইতিহাসে হিট্টাইট আক্রমণ, সন্ধি ও গুরুত্ব

৪.২ ঃ মিশরীয় আইন ব্যবস্থা

৪.৩ ঃ মৃত্যু ও মমিকরণ

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়টি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) মিশরীয় সভ্যতার সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল।

২) মিশরীয় রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের স্বরূপ কি ছিল?

৩) পিরামিড ও মমি কিভাবে নির্মিত হয়েছিল।

২ ঃ মিশরীয় সভ্যতার তথ্যসূত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও নারীর স্থান (Unit-5)

২.১ ঃ তথ্যসূত্র

ইতিহাস পুনঃনির্মাণের জন্য তথ্যসূত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি। মিশরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন তথ্যসূত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। মিশরীয় সভ্যতার তথ্যসূত্রে মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল (i) প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ, (ii) নৃতাত্ত্বিক অবশেষ (iii) লেখমালা (iv) লিখিত পুঁথি।

i) **প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ ঃ** মিশরীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষের মধ্যে নির্দ্বিধায় যে স্থাপত্যের কথা বলা যায়, তা হল পিরামিড, মিশরীয় ফ্যারাওদের সমাধি এই পিরামিড। এই স্থাপত্যকীর্তি মিশরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য বহন করে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেবতা ও পশুপাখির মূর্তি উদ্ধার করা হয় যা মিশরের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায়। পিরামিড, আসলে সমাধি হলেও এর মধ্যে বিভিন্ন মূর্তি, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি পাওয়া যায়। পাশাপাশি সমাধি গাত্রে বিভিন্ন অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে মিশরীয় সমাজের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুট হয়। দেওয়াল চিত্রের ব্যবহার মিশরীয় ইতিহাসের প্রধানতম একটি তথ্যসূত্র। যেমন—অষ্টাদশ রাজবংশ রাজকর্মচারী গেবামুনের সমাধিতে দেখা যাচ্ছে, তার সম্মুখে অনেকগুলি গরু উপস্থিত করা হয়েছে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মিশরীয় সমাজজীবনে পশুর মালিকানা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া বিভিন্ন মন্দির থেকে মিশরীয় ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মন্দিরে বা Cult tenple গুলি বিরাট নগরসভ্যতার ইঙ্গিতবাহী ছিল। এদের মধ্যে কার্নাকের আমুন (Amin) মন্দির, লুক্সরের আমুন মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ii) **নৃতাত্ত্বিক অবশেষে ঃ** ইতিহাসের উপজীব্য মানুষ, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীতের মানুষ কেমন ছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের নিকট সেই ভাবে থাকে না। কিন্তু মিশরীয় সভ্যতা সেই দিক দিয়ে ছিল উজ্জ্বল রকমের ব্যতিক্রমী। মৃতদেহ মমিকরণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হবার কারণে প্রাচীন মিশরীয় মানুষদের দেহ সুরক্ষিত অবস্থায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা লাভ করতে পারেন। মমির যথার্থ পরীক্ষণের ফলে যেমন মিশরীয়দের উৎস বা নৃতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার সঙ্গে নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন—তুতেনখামেনের অল্পবয়সের মৃত্যুর প্রমাণ বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানে যেমন বর্ণিত আছে, তেমনভাবে আমরা তাঁর মমির পরীক্ষা করলে তাঁর বয়স সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

iii) **লেখমালা ঃ** হায়রোগ্লিফিক লিপিতে রচিত মিশরের লেখমালাগুলি মিশরের সমসাময়িক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে। Hieroglyphics এর অর্থ হল পবিত্র লেখনী। এই চিত্রলেখগুলির পাঠোদ্ধার হবার পর থেকে মিশরীয় সভ্যতার নানান তথ্য ঐতিহাসিকদের সামনে ফুটে উঠেছে। এই লিপি ছাড়াও মিশরে Hieratic, Demotic, Coptic লেখনী ব্যবহৃত হত। মূলত সমাধিগাত্রে এই ধরনের লিপি খোদিত থাকতো। 1799 খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত দ্বিভাষিক লিপি Rosetta Stone মিশরীয় ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই লিপিটিতে গ্রীক ও হায়রোগ্লিফিকস দুটি লিপি অবস্থান করায় ঐতিহাসিকরা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হায়রোগ্লিফিকস্ লিপির পাঠোদ্ধার করেন। 1819 খ্রিষ্টাব্দে Thamas Young এই গবেষণার সূচনা করেন, এবং পরবর্তীকালে 1822 খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী গবেষক Jeam-Francois Champollion এই পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ করেন। এই লেখমালাগুলিতে রাজবংশ ফ্যারাওদের কার্যকলাপ ও কীর্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

iv) **লিখিত পুঁথি ঃ** মিশরীয় সভ্যতায় লিখিত পুঁথির ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল। প্যাপিরাস পাতায় এই পুঁথি লিখিত হত। এটি নীলনদ অববাহিকায় জাত একধরনের গাছের পাতা থেকে তৈরী করা হত। সবচেয়ে দীর্ঘ papyrus হল Harris Papyrus যেটি 41 মিটার দীর্ঘ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে অনেক প্রত্নবস্তুর ন্যায়, প্যাপিরাসের ব্যবহার আদিরাজবংশীয় সময়কালের থেকে শুরু হয়ে ফ্যারাওদের সময় অতিক্রম করে অনেকদিন অবধি অব্যাহত ছিল।

Papyrus-গুলি মূলত ছিল ধর্মীয় গ্রন্থ পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে এর গভীর সংযোগ ছিল। প্যাপিরাস গাছ রাজকীয় বৃক্ষের মর্যাদা লাভ করেছিল। প্যাপিরাসে রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল The Book of Dead। এই প্যাপিরাসগুলি অনেকসময় মমির সাথে সমাধিতে রাখা হত।

এইভাবে দেখা যায় মিশরীয় ইতিহাস চর্চার জন্য বিভিন্ন তথ্যসূত্রের বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিকরা নির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হয়েছেন। এই তথ্যসূত্রগুলির সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ইতিহাসচর্চাকে দৃঢ়তাপ্রদান করেছে।

২.২ ঃ সমাজ ব্যবস্থা

২.২.১ ঃ মিশরীয় সমাজ

খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে নীলনদের তীরে বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠী একটি সমাজ সংগঠন গড়ে তোলে। এই সভ্যতা মিশরের প্রধান নদী নীলনদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। নীলবিধৌত পালনভূমিতে মরুভূমি বেষ্টিত মিশরীয় সমাজের সূত্রপাত ঘটে। মূলত নদীঅঞ্চলে কৃষিসমাজের প্রাথমিক নির্দশন পাওয়া যায়, বদ্বীপ অঞ্চলের মেরিমদে অঞ্চলে। এই সময়ের কিছুপরে ফায়ুম নামক অঞ্চলে কৃষিজীবিদের সন্ধান মেলে। পাশাপাশি মরুঅঞ্চলে পশুপালন সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্যনীয় ছিল। সামাজিক সংগঠন লক্ষ্যকরলে দেখা যাবে মিশরীয় সমাজে বর্ণপ্রথা প্রমাণ নেই, আইনের দৃষ্টিতে সকলে ছিল সমান, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থানগত দিক থেকে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। রাজপরিবার ও ভূমিদাসদের মধ্যে বিশাল পার্থক্য ছিল।

মিশরীয় সমাজে কয়েকটি শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন—(১) রাজপরিবার (২) পুরোহিত (৩) অভিজাত (৪) লিপিকর (৫) ব্যবসায়ী (৬) শিল্পী এবং (৭) কৃষক ও ভূমিদাস। সাম্রাজ্যের যুগে আরেকটি

শ্রেণী হিসাবে সৈন্যদের অর্ন্তভূক্তি ঘটে। এইসময়ে প্রচুর যুদ্ধবন্দী দাস হিসাবে মিশরে আনীত হয়, পরে তারাও একটি শ্রেণীরূপে পরিগণিত হয়। প্রাচীন সমাজে ফারাও তার আত্মীয়গণ রাজপরিবারের অর্ন্তভূক্ত হতেন। পুরোহিতরা মন্দিরে পূজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। এদের সামাজিক প্রতিপত্তি শক্তিশালী ছিল। অভিজাতরাও সম্মানীয় অবস্থান প্রাপ্ত ছিল। লিপিকররা মিশরের সমাজের উচচস্তরে অবস্থান করতেন। তারা কেবলমাত্র পুঁথিচর্চার কাজে নিযুক্ত থাকতেন না, বরং সরকারী উচ্চদায়িত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। শিল্প ভাস্কর্যতে এই লিপিকরদের উপস্থাপনা করা হয়েছে। মধ্যরাজবংশ চলাকালে অভিজাতদের বিরুদ্ধে লেখক, ব্যবসায়ী, শিল্পী ও ভূমিদাসদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ফলে সকল শ্রেণীর মর্যাদা বৃদ্ধিপায়। এই সময় ব্যবসায়ীও শিল্পীরা উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে শুরু করে। সাম্রাজ্যের যুগে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতশ্রেণী একটি আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। জাদুবিদ্যা এবং কুসংস্কারের বিস্তার হলে পুরোহিতদের অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়।

কৃষক ও দাসরা সমাজের সর্বনিম্নস্তরের অবস্থিত ছিল। যুদ্ধবন্দীদের ভাগ্যে দাসত্ব অপেক্ষাকরত। দাসদের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রাচীন মিশরে না থাকলেও দাসরা অভিজাতও ফ্যারাওদের গৃহভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত থাকতেন। এছাড়া মিশরীয় বৃহৎ নির্মাণকার্যে শ্রমিকহিসাবে তাদের নিযুক্ত করা হত। অন্যদিকে কৃষকরা জমিতে চাষ করতেন, পশুপালন করতেন, সেচও জলাধার গুলি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। পাশাপাশি পাথর খাদান ও রাজকীয় নির্মাণে ও তাদের ব্যবহার করা হত। উৎপন্ন ফসলের প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষকদের কর হিসাবে প্রদান করতে হত।

সেনাদেরও একটি পৃথক শ্রেণী রূপে গণ্য করা হত। তারা বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিযুক্ত থাকতেন। শান্তির সময়ে সেনারা পিরামিড ও অন্য রাজকীয় স্থাপত্যের নির্মাণের কাজে নিযুক্ত কৃষক ও দাসদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করতেন। চিকিৎসক ও দক্ষশিল্পীরা মধ্যমবর্গীয় শ্রেণীরূপে পরিচিত ছিলেন। শিল্পীরা গহনা, মৃৎপাত্র প্যাপিরাস দ্রব্য এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতেন।

তবে সামাজিকভাবে বৃত্তিপরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। কৃষকদের কিছু অংশ অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। পরিবার থেকে অর্থ সাশ্রয় করে শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হত। এই বিদ্যালয়গুলি পুরোহিত ও লিপিকররা নিয়ন্ত্রণ করতেন। অক্ষর জ্ঞানলাভ করলে, ছাত্ররা লিপিকরের বৃত্তি গ্রহণ করে সরকারী পদে কাজ গ্রহণ করতে পারতেন। অর্থাৎ সামাজিকভাবে কারোবৃত্তি তার জন্মদ্বারা নির্ধারিত ছিল না।

২.২.২ ঃ পারিবারিক জীবন

প্রাচীন মিশরীয়রা পারিবারিক জীবনের ওপর প্রভূত গুরুত্ব প্রদান করতেন। পাশাপাশি শিশুদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত, এবং উচ্চশিশু মৃত্যুর হার থাকা সত্ত্বেও গড় আয়ু ছিল 35 থেকে 40 বৎসর। পরিবারে অন্ততপক্ষে গড়ে পাঁচটি শিশু থাকতো। সাধারণভাবে বিবাহিত দম্পতিরা স্বামীর পিতা-মাতার সাথেই বসবাস করতেন, যতদিন পর্যন্ত না স্বামীর নিজস্ব গৃহ ক্রয় বা নির্মাণের মতো আর্থিক সামর্থ্য হয়ে যেত।

বিবাহের সময়কাল বর্তমান যুগের তুলনায় অনেক পূর্বেই ছিল। বিবাহের আদর্শ বয়স নারীদের জন্য ছিল বারো বৎসর। পুরুষদের জন্য তা ছিল পনের বছর। কোন অনুষ্ঠানিক বিবাহ অনুষ্ঠান হত না। বরং একটি চুক্তি স্বাক্ষর হত, যেখানে উভয় কি পরিমাণ সম্পত্তি আনয়ন করবে তার বিবরণ রচিত হত। অনেক সময় স্বামী অনেক সময় স্ত্রীর

পরিবারকে উপহার প্রদান করতেন। স্ত্রীকেও উপহার প্রদান করতে হত। সম্পত্তি যাতে পরিবারের মধ্যেই থেকে যায়, তার জন্য জ্ঞাতি ভাইবোনের বিবাহ মিশরীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। নারী তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে পারতো, কিন্তু অনেক সময় তাদের পিতা-মাতা তাদের সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন।

পারিবারিক জীবনে পুরুষ বহুবিবাহের অধিকারী ছিলেন, তবে এই প্রথা বাস্তবে পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও নারীদের বিশ্বাসঘাতকতা বা পরকীয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে নারী চাইলে তার সম্পত্তি এবং যৌথ সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিয়ে বিদায় নিতেন। কিন্তু যদি এক্ষেত্রে স্ত্রী তার অসুস্থ স্বামীকে ছেড়ে চলে যেতেন সেক্ষেত্রে তার যৌথ সম্পত্তির ওপর অধিকার থাকতো না। অন্যদিকে, স্বামীকে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য স্ত্রীর ভরণপোষণ ও যৌথসম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করতে হত।

২.২.৩ ঃ অর্থনৈতিক জীবন

সমাজ জীবনের সাথে অর্থনৈতিক জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও মিশরীয় অঞ্চল প্রাকৃতিকভাবে শুষ্ক অঞ্চল ছিল, তবুও মিশরীয় অধিবাসীরা কৃষিকাজ পত্তন করে নীলনদ উপত্যাকায় গম, যব, ফল ও সবজি উৎপাদন করতেন। তাছাড়া মাংস, দুগ্ধ, চামড়া ও পশম এবং ভূমিতে ব্যবহারের জন্য তারা বিভিন্ন পশুপালন করতেন।

অত্যন্ত অল্প বৃষ্টিপাতের মধ্যে মিশরীয় কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে নীলনদের সেচের উপর নির্ভর করতে হত। কৃষির সময়কে তিনভাগে ভাগ করা হত। এটি নীলনদের জলের প্রবাহ অনুসারে নির্ণীত হত। এগুলি ছিল— i) আখেত (Akhet) বা প্লাবনের সময় ii) পেরেত (Peret) বা কর্ষণ ও বপনের সময় iii) শিমু (Shemu) বা ফসল কাটার সময়, যেটি শুখা মরসুম ছিল জুন বা জুলাই মাসে মিশরের বার্ষিক বন্যা হত। এই সময় জমি প্লাবিত হত। বন্যার জল নেমে যাবার পর অক্টোবর নাগাদ ভূমিকর্ষণ ও চারারোপণের কাজ করা হত। মার্চ -এপ্রিল নাগাদ ফসল কাটার কাজ করা হত। গম এবং বার্লির পাশাপাশি কার্পাস, সবজি, ফল, পেঁয়াজ প্রভৃতি উৎপাদিত হত। ফসল কাটার পর ফসলের একটি বৃহৎ অংশ করহিসাবে রাজকোষে জমা দিতে হত।

মিশরীয় অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বাণিজ্য। ইজিয়ান দ্বীপ ক্রীট, ফিনিশিয়া, প্যালেস্টাইন, সিরিয়ার সঙ্গে মিশরের বাণিজ্য প্রসারিত ছিল। মুখ্য রপ্তানি দ্রব্য ছিল গম, লিনেন কাপড়, মৃৎপাত্র। সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত এবং কাঠ আমদানি করা হত। মেসোপটেমিয়ার সাথেও মিশরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্ব সময় কাল থেকে শিল্পের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। মিশরের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের মধ্যে ছিল পাথরশিল্প, নির্মাণশিল্প, মৃৎপাত্র, কাঁচ ও বয়নশিল্প। অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তার করে মিশর আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন সময় থেকে ব্যবসার ক্ষেত্রে মিশরীয়রা কিছু ব্যবহারিক পদ্ধতি আয়ত্ত্ব করেছিল। হিসাবপত্র সংরক্ষণে তাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল। বণিকরা তাদের পণ্যের প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করত এবং রশিদ গ্রহণ করত। সম্পত্তির দলিল, চুক্তি, দানপত্রের ব্যবস্থা ও করা হয়েছিল। তবে মুদ্রা অর্থনীতি মিশরে গড়ে ওঠেনি। বিনিময় মাধ্যম ছিল তামার টুকরো, বিভিন্ন ওজনের স্বর্ণখণ্ড প্রভৃতি। এগুলিকে প্রাচীনতম প্রতীকী মুদ্রা বলা যায়। তবে বৃহত্তর বাণিজ্যে এই মাধ্যম ব্যবহৃত হত। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিনিময় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। মিশরীয় অর্থনীতিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের যুগে অর্থনৈতিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েগিয়েছিল। এযুগে সামরিকশক্তির বিকাশ ঘটেছিল। ফলে রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিও নজর রাখার প্রয়োজন দেখা যায়। এসব কারণে অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিপদক্ষেপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। কৃষিভূমিগুলি ফারাওদের অধীনস্থ হয়।

ফারাও আখেনাতেনের সময়ে ফারাও পুরোহিতরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠেন। ক্ষমতা ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের জন্য তারা উদগ্রীব থাকতেন। ফারাও যুদ্ধ লুণ্ঠনে অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করতেন। পুরস্কার হিসাবে তারা যুদ্ধবন্দী দাস এবং প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হত। এছাড়া চাষযোগ্য জমি, গরু, ভেড়া, প্রভৃতি পশু লাভ করত। এর ফলে মিশরীয় অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছিল। এইভাবেই মূলত প্রাচীন মিশরের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল।

২.৩ ঃ প্রাচীন মিশরে নারীদের অবস্থান

সাধারণভাবে, প্রাচীন মিশরের সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ভূমিকা ছিল। তবে, অনেক প্রাচীন সভ্যতার বিপরীতে, নারীদের আইনের দৃষ্টিতে পুরুষদের সমান বলে মনে করা হয়। পুরুষদের মতোই, মহিলারা ব্যবসা চালাতে, ধার করতে এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারতেন।

শিক্ষা ঃ যেহেতু নারীরা শাসনকার্য বা সরকারে কাজ করতেন না, তাই সাধারণ ভাবে পড়তে বা লিখতে শিখতেন না। তাদেরকে গৃহের কাজের দক্ষতা শেখানো হয়েছিল এবং কীভাবে পরিবারকে পরিচালনা করতে হয় তাঁর শিক্ষা দেওয়া হত।

বিবাহ ঃ প্রাচীন মিশরে খুব অল্পবয়সে বিবাহ দেওয়া হত, যার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। সাধারণত বারো বা তের বছর বয়সী কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হত। মিশরীয়দের জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান হত না এবং বেশিরভাগ বিয়ের ব্যবস্থা দুটি পরিবারের দ্বারা পরিচালিত হত।

বৈশিষ্ট্যসূচক ভূমিকা ঃ নারী সাধারণত বাড়ির কাজ করতেন। তারা রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করা, পোশাক তৈরি করা এবং শিশুদের যত্ন নেওয়ার কাজ করতেন। দরিদ্র নারীরা তাদের স্বামীদের জমিতে কাজ করতে সাহায্য করতেন। পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা বেশিরভাগ কৃষক মহিলাদের অন্যতম কাজ ছিল। ধনী নারীদের গৃহের কাজে দাসদের ব্যবহার করতে পারতেন অথবা তাদের নিজস্ব ব্যবসা চালানোর অধিকার ছিল। ধনী মহিলারা ঘরের কাজ এবং রান্না করার বেশিরভাগ কাজ করতেন। কখনও কখনও ধনী উচ্চপদস্থ নারীরা মিশরীয় দেবীদের জন্য মন্দিরের কাজ করে যাজক হয়ে ওঠেন।

পুরোহিত ও দেবী ঃ শুধুমাত্র গুরত্বপূর্ণ এবং উচ্চমানের পরিবারের মহিলারা পুরোহিত হয়ে উঠতে পারতেন। একটি মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে কাজ একটি বিশেষ সম্মান হিসাবে গণ্য করা হত। আইসিস (মাতৃকা দেবী), হাথর (প্রেমের এবং মাতৃত্বের দেবী) এবং নুত (আকাশের দেবী) সহ মিশরীয় ধর্মের মধ্যে অনেক শক্তিশালী দেবী ছিলেন। যা মাতৃ পূজার ধারার উপস্থিত জানান দেয়।

অন্যান্য কাজ ঃ সমস্ত নারী মহিলাদের সাধারণ ভূমিকা অনুযায়ী পরিবারের বাড়িতে কাজ করতেন না। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে মহিলাদের মালিকানাধীন ব্যবসায় যেমন প্রসাধনী, সুগন্ধী, বা পোশাক হিসাবে বিনোদনকারী হিসাবে কাজ করতেন। আবার প্রশাসনে নারীদের উজ্জ্বল ভূমিকা দেখা দেয় যায়, রানি নেফারতিতি মিশরের

প্রশাসন পরিচালনা করে ছিলেন। শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে মিশরীয় সমাজে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, সন্তানের জন্মদান মা ও শিশু উভয়ের জন্য ছিল বিপজ্জনক। তবে মিশরীয়রা গর্ভাবস্থা নির্ণয়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পেরেছিল। খুনুম, আইসিস, হাথর, বেস, প্রমুখ দেবীরা শিশুদের রক্ষার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। প্রসবের সময় মন্ত্রপাঠ করা হত, পাশাপাশি ব্যাথানাশক ঔষধের প্রয়োগ করা হত। সাধারণ পরিবারের নারীরা পরিবারের সাহচর্য্যে শিশুর জন্ম দিতেন। অন্যদিকে ধনী ও অভিজাত নারীদের শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য ধাত্রীমাতার ব্যবস্থা থাকত। পুত্র সন্তানের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত, কারণ তাদের বংশধর বলে মনে করা হত।

এই আলোচনাতে দেখা গেল যে মিশরীয় সমাজ পিতৃতান্ত্রিক হলেও নারীদের ভূমিকা সেখানে অস্বীকার করা যায় না।

৩ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র পুরোহিততন্ত্র ও ওসিরিয়ান উপাসনা (Unit-6)

৩.১ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্র

প্রাচীন মিশরীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে মিশরীয় রাজতন্ত্রের স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক চেতনা থাকা প্রয়োজন। তবে মিশরীয় রাজতন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে। প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫৫০০ অব্দে নীলনদ উপত্যাকায় শিকারী পশুপালক গোষ্ঠী তাদের বসতি স্থাপন করে, এই সময় যাযাবর জীবনবৃত্তি ছেড়ে উর্বর নীল উপত্যকায় কৃষিকাজের গোড়াপত্তনের মাধ্যমে স্থায়ী বসতির সূত্রপাত দেখা যায়। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন পশুকে পোষ মানিয়ে নেয়, সাথে সাথে খড় ও মাটি দিয়ে বাসস্থান তৈরী করে। এগুলি বর্তমানে Nevada সংস্কৃতি নামে পরিচিত। দুটি প্রধান এলাকায় বসতি গড়ে উঠেছিল। একটি নিম্নমিশরীয় এলাকায় বা নীল অববাহিকা এবং একটি উচ্চ মিশরীয় অববাহিকা। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 3400 অব্দ সময়কাল থেকে এই দুটি পৃথক অঞ্চলে আদি রাজাদের উপস্থিতি দেখা যায়। এই সময়কাল (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 5500-খ্রিস্টপূর্ব 3100) রাজতন্ত্র পূর্ব সময়কাল বা Pre dynastic period নামে পরিচিত। 3100 খ্রিষ্টপূর্ব নাগাদ Mense এবং Narmer এর নেতৃত্বে দক্ষিণ বা উচ্চমিশর উত্তর মিশর অধিকৃত করে। এর ফলে মিশরীয় ঐক্য সুসম্পন্ন হয়।

ঐতিহাসিকরা Menes ও Narmer-কে এরও অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। তিনি মিশরের প্রথম রাজবংশের সূচনা করেন। এই সময় শাসনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মেমফিস (Memphis)। এই সময়ে শাসন কাঠামোর ভিত্তি স্থাপিত হয়। রাজাকে দেবতা Horus এর জীবিত সত্ত্বা বলে মনে করা হত। এই সময় Hieratic লেখমালার সূচনা হয়। পাশাপাশি মিশরীয় বর্ষপঞ্জীর ও উদ্ভব হয়। আনুমানিক 3100-2686 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মিশরীয় প্রথম ও দ্বিতীয় রাজবংশের শাসনকাল ছিল।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ রাজবংশ (C.2686 BC-C 2181 BC) সময়কালে মিশরীয় ইতিহাসে 'পিরামিডের যুগ' নামে পরিচিত। এই সময় প্রাচীন রাজবংশের শাসনকাল ছিল। এই পাঁচশত বছরের সময়কালে মিশরীয় রাজনৈতিক, শৈল্পিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকাশ প্রথম উল্লেখযোগ্য রূপে দেখতে পাওয়া গেল। এই সময়ে পিরামিড নির্মাণ অন্যতম রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ রূপে পরিগণিত হয়। পাশাপাশি ফ্যারাও বা শাসকদের পিরামিড পরলোকের পথ রূপে মানুষের বিশ্বাসে স্থান পায়। তৃতীয় রাজবংশের শাসক Dioser (জয়ের) এর রাজস্থাপিত ইমহোটেপ

(Imphotep) সাকোয়ারা (Saqqara) তে প্রথম ধাপযুক্ত পিরামিড নির্মাণ করেন। চতুর্থ রাজবংশের অন্যতম শাসক ছিলেন স্নেফু (Sneferu) এবং Khufu গিজা (Giza) তে বিখ্যাত পিরামিড খুফুর আমলে নির্মিত হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠরাজবংশের সময়কালে স্থানীয় প্রশাসন ও যাযাবর গোষ্ঠীগুলি শক্তিসঞ্চয় করে ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল। ষষ্ঠরাজবংশের পতনের সময় মিশরীয় রাজকীয় কর্তৃত্ব অনেকটাই কমে যায়।

আনুমানিক 2181 BC-2055 BC সময়কাল প্রথম অন্তর্বর্তী সময়কাল নামে পরিচিত। এই সময়ে রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্বের উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছিল। আনুমানিক 2055 খ্রিঃপূর্বাব্দে একাদশ রাজবংশের নেতৃত্বে মিশরে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপিত হলে মধ্যরাজবংশের সূত্রপাত হয়। এই রাজবংশের মধ্যে একাদশ থেকে চতুর্দশ রাজবংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। Mentuhotep-1 থেকে Mentuhotep-1 পর্যন্ত শাসকরা একাদশ রাজবংশ পরিচালনা করেন। দ্বাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আমেনেমহাট (Amenemhat-1), Itjtaway তে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি যৌথ শাসক নিযুক্তিকরণের প্রথা প্রচলন করেন। তার হত্যার পর তার পুত্র Senusret-1 সিংহাসনে বসেন। পরবর্তী শাসক Senusret-III নুরিয়া অঞ্চল জয় করেন। মিশরের সীমার সুরক্ষার কথা চিন্তা করে, মিশরীয় সীমাকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। পাশাপাশি কার্ণাক, আবিডোসের নির্মাণগুলি হতে থাকে। দাহশূরের পিরামিডগুলি নির্মিত হলেও সেগুলি গুণগতমানে প্রাচীন রাজবংশের মতো উন্নত ছিল না। অতপরঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ রাজবংশ আনুঃ 1650 BC পর্যন্ত মিশর শাসন করেন।

চতুর্দশ রাজবংশের অন্তিমপর্বে Hyksos নামে বিদেশী শাসকরা শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। তারা 'Desert Prince' নামে পরিচিত ছিল। তারা উন্নত অস্ত্রশাস্ত্র, অশ্ব ও রথের ব্যবহার করে যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে মিশরের শাসনভারের দখল নিতে সক্ষম হয়। এইভাবে দ্বিতীয় অন্তর্বর্তী পর্যায়ের সূত্রপাত হয়। তারা Avaris এ নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে পঞ্চদশ বংশের সূত্রপাত করে। ষোড়শ ও সপ্তদশ রাজবংশ তাদের সঙ্গে প্রায় সমসাময়িকভাবে মিশরে উপস্থিত ছিল। ষোড়শ রাজবংশ পঞ্চদশ বংশের অধীনস্থ ছিল। অন্যদিকে সপ্তদশবংশ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

প্রাচীন মিশরের শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিচিত নবরাজবংশ (আনুঃ 1550 BC- আনুঃ 1069 BC) অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশতম রাজবংশ দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এই প্রায় পাঁচশত বর্ষের সময় কালে মিশরে পুনরায় বাণিজ্য, শিল্প, স্থাপত্যের নবদিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। এই সময় থিবসে Valley of the kings অঞ্চলে সমাধিপ্রথা প্রচলিত করেছিল। এই সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ শাসকরা ছিলেন অষ্টাদশ বংশের Ahmose-I, ঊনবিংশতি বংশের Tuthmosis-I, Ththmosis-II, বিংশতি বংশের Ramesses III তৃতীয় Tuthmosis তাঁর নির্মাণ কার্য্যের জন্য সমধিক পরিচিত। তাঁর সময়ে আমুনের মন্দির নির্মীত হয়। আমুন প্রধান দেবতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে অষ্টাদশ রাজবংশের শেষদিকে আখেনাতেন এর সময়কালে সূর্যদেবতা আতেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। তবে তুতেনখামেন পূর্ববর্তী ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করেন। ঊনবিংশ বংশের প্রথম সেটি (Seti-I) এবং দ্বিতীয় রামসেস (Ramesses-II) কার্নাকে আমুন মন্দির নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় রামসেস, যিনি মহান রামসেস নামেও পরিচিত, তিনি হিট্টাইটদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তবে বিংশতম বংশের শেষদিকে পুনরায় মিশরীয় রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অন্তর্বর্তী পর্বে (আনুঃ 1069 BC - আনুঃ 747 BC) একবিংশ থেকে চতুর্বিংশ রাজবংশের শাসনকালে মিশর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একবিংশ বংশের সময়ে ফ্যারাও এবং তাঁর উত্তরস্থিত সামন্তের মধ্যে বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। তবে এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে দ্বাবিংশ বংশের শাসক Sheshong-I মিশরে ঐক্যধরে রাখার প্রয়াস করলেও একই সময়ে সমান্তরাল 23তম বংশের বিস্তার ঘটে। পাশাপাশি 24তম বংশ (চতুর্বিংশ বংশের) একই সময়ে বিস্তার ঘটেছিল।

পঞ্চবিংশ থেকে ত্রিশতম বংশের সময়কাল পরবর্তী পর্যায় নামে পরিচিত। নুবিয়ানরা বিংশতম বংশের শাসনকালে স্বাধীনতা অর্জন করে। 730 BC নাগাদ নুবিয়ান রাজ Piankhi অববাহিকা অঞ্চলের শাসকদের পরাভূত করে শতবর্ষব্যাপী পঞ্চবিংশ বংশের শাসন স্থাপন করে। অতপরঃ আসীরিয়রা 671BC তে মেমফিস ও 664BC তে থিবস অধিকার করলেন এবং মিশরীয়দের আঞ্চলিক শাসক নিযুক্তকরণের মধ্যদিয়ে ষড়বিংশ বংশের সূত্রপাত ঘটায়। এই বংশ Saite বংশ নামে পরিচিত হয়। আনুঃ 525 BC সময় কালে ক্যামবাইসিস (Cambyses) এর নেতৃত্বাধীন পারসিকরা সপ্তবিংশ বংশের সূচনা করেন। এই রাজত্ব 120 বছর স্থায়ী হয়। মিশরীয়রা বিদেশী শাসনকে ভালোভাবে মানতে পারেন নি। তারা বিভিন্ন বিদ্রোহ করেন এবং 404 খ্রিঃপূর্ব Amyrtaeus অষ্টাবিংশ বংশ স্থাপন করেন। অষ্টাবিংশ থেকে ত্রিশতম বংশ মিশরে একশত বছরেও কম সময়ে শাসন করেন, অতপরঃ শেষ মিশরীয় বংশজাত ফ্যারাও Nectanebo-II পারস্যের Artaxerxes III এর বিশাল বাহিনীর হাতে 343 BC তে পরাস্ত হলে পুনরায় মিশর পারস্যের হস্তগত হয়।

অতপর 332 BC আলেকজান্ডার কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হলে, পারস্য সাম্রাজ্যভূক্ত মিশর আলেকজান্ডারের হস্তগত হয়। তিনি মিশরীয়দের কাছে আমুনের পুত্র এবং ত্রাতা হিসাবে অভিহিত হন। তাকে ফ্যারাওয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। তিনি ভূমধ্যসাগরের তীরে আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠিত বংশ ম্যাসিডোনিয় বংশ নামে পরিচিত হয়। c.323BC নাগাদ আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের অল্পশাসনের পর, বিখ্যাত সেনাপতি টলেমি মিশরের শাসনকার্য গ্রহণ করেন। c.323BC- c.30BC সময়কাল টলেমির সময়কাল নামে পরিচিত। এই বংশের শেষ শাসিকা বিখ্যাত মহারাণী ক্লিওপেট্রা, রোমান শাসকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হন। রোমান সেনাপতি মার্ক এন্টনিকে বিবাহ করে, রোমান শাসক অক্টাভিয়ানের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আত্মহনন করলে, মিশরের স্বতন্ত্রতার অবসান হয়। মিশর রোম সাম্রাজ্যভূক্ত হয় (303 CE)।

৩.২ ঃ মিশরীয় রাজতন্ত্রের প্রকৃতি

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা মিশরীয় রাজতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারি। 3100BC থেকে 343BC পর্যন্ত মিশর প্রায় 170 জন স্বদেশী ফ্যারাওর দ্বারা শাসিত হয়েছিল। তবে মিশরীয় শাসকদের আমরা বর্তমানে ফ্যারাও (Pharaoh) রূপে চিহ্নিত করি। মিশরীয়রা তাদের শাসকদের কিরূপে জ্ঞান করতেন সেই বিষয়ে সম্যক অবহিত থাকা প্রয়োজন।

Pharaoh শব্দটি গ্রীকশব্দ। যার উদ্ভব হয়েছে মিশরীয় শব্দ 'Pre-aa' থেকে। যার অর্থ 'বড়গৃহ' কে ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে রাজবাড়ি অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হত। পরবর্তীতে নতুন রাজবংশের সময়ে এই শব্দটি কেবল রাজার সমার্থক হয়ে ওঠে।

3000 বছরের ইতিহাসে মিশরীয় শাসন ব্যবস্থা ধর্মীয় রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছিল, যেখানে ফ্যারাও কেবল দেবতার প্রতিনিধি ছিলেন তাই নয়, অভিষেকের সময় থেকে দুইরাজ্যের শাসক পৃথিবীতে চলন্ত ঈশ্বররূপে পরিগণিত হতেন। রাষ্ট্রের ধর্মীয় প্রধান হবার পাশাপাশি ফ্যারাও সরকারের প্রধান, প্রধান বিচারক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপে পরিগণত হতেন। তিনি মিশরের সমগ্র ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। এমনকি ইজিপ্টের মানুষদেরও তার মালিকানাধীন তারা হত। এই ভাবে মিশরীয় রাজতন্ত্রের শাসককে একটি অপ্রতিদ্বন্দী ক্ষমতার অধিকারী মনে করা হত।

যদিও ফ্যারাওগণ দৈবক্ষমতা সম্পন্ন ও পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দীরূপে পরিগণিত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন নাগরিক দায়িত্বপালনে সচেষ্ট থাকতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, যেমন মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতেন। ফ্যারাওদের 'মতে' বা সুবিচারের আদর্শগুলিকে রক্ষা করে চলতে হত। পাশাপাশি মিশরীয় মানুষদের প্রতি দায়িত্বপালন করতে হত। তার শাসনকার্য মিশরীয়দের ভাগ্য নির্ধারণ করত। মৃত্যুর পর মনে করা হত যে তিনি দেবতাদের সাথে পুনর্মিলিত হবেন এবং মিশরীয়দের বিকাশ অব্যাহত থাকবে।

এইভাবে দেখা যায় প্রাচীনমিশরে পবিত্র রাজতন্ত্রের ধারণা অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়েছিল। শাসকরা প্রভূতক্ষমতার অধিকারী হন। যদিও এই ধারণার বিপরীতে বেশ কিছু সময়ে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা শাসককে হত্যার ইতিহাস মিশরে রয়েছে। তা সত্ত্বেও বৃহত্তর মিশরীয় জনতাকে শাসকের প্রভুত্বের ছত্রছায়া আনার জন্য মিশরীয় শাসন এই দৈবঅধিকারের অবতারণা করেছিল।

৩.৩ ঃ পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় চেতনা

মিশরীয় সমাজের ধর্মীয় বিস্তার প্রবল আধিপত্য ছিল। যদিও রাজতান্ত্রিক সময়কাল থেকে মিশরীয় ধর্মীয় ব্যবস্থার বিকাশ কিরূপে হইয়েছিল, তার কোন পর্যাপ্ত তথ্যসূত্র পাওয়া যায় না। প্রাচীন রাজবংশের সূচনাকালে বিভিন্ন ধর্মীয় কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে। এই কেন্দ্রগুলিতে উপাস্য দেবতাদের পুরোহিতরা তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য নিজেদের দেবতাকে কেন্দ্র করে স্বতঃপ্রণোদিত ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করতে শুরু করেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের এক পরিবারভুক্ত বা গোষ্ঠীভুক্ত করা হতে থাকে। মিশরীয় ধর্মে ধর্মীয় কেন্দ্রভিত্তিক দেবতা নিচয় দেখা যায়, যা অন্য সভ্যতাসমূহ অপেক্ষা ভিন্নতর। এই গোষ্ঠীগুলির কয়েকটি 'Ennesds' এবং 'Ogdoad' নামে পরিচিত। 'Ennead অর্থে যে দেবতা গোষ্ঠীতে নয়জন দেবতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং Ogdoad অর্থে যেই গোষ্ঠীতে আটজন দেবতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই রূপ কেন্দ্রগুলির মধ্যে অন্যতমছিল হেলিওপোলিস (Heliopolis) যেখানে Atum কে প্রধান দেবতা জ্ঞান করে, নয়জন দেবতা ছিলেন। হারমোপোলিসেরা অষ্টদেবতার প্রধান ছিলেন Re, Memphis এ ছিল একটি অন্যতম কেন্দ্র, এখানে উপাসিত হতেন ত্রিদেবতা Path-Sekhmet-Nefertem। এদের প্রধান ছিলেন Path। অপর কেন্দ্র থিবস (Thebs) এ Amun-Mut-Kheonesu এ Khnum-Satet-Aniket এর মধ্যে প্রধান ছিলেন Khnum।

মিশরীয় ধর্মের রাজতন্ত্রের প্রাধান্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, যেখানে রাজাকে দেবতা ও মানুষদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি পশুদের মূর্তি দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত করার প্রবণতা (Theimorphic উপাসনা) দেখা গিয়েছিল। প্রাচীন মিশরীয়দের সামাজিক জীবনে ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বদাই লক্ষ্য করা যায় এবং সেই ধর্মীয় জীবনে ফ্যারাওদের যেমন মুখ্যভূমিকা ছিল, তেমনি বিভিন্ন পুরোহিতদের উদ্ভব ঘটেছিল।

তত্ত্বগতভাবে ফ্যারাওকেই মন্দির সমূহের গর্ভগৃহে প্রবেশের সমতুল পবিত্র মনে করা হত। কিন্তু বাস্তবে অভিজ্ঞ পুরোহিতরা মন্দিরের দৈনন্দিন কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিলেন। তারা প্রত্যহ দেবতাকে মন্ত্রপাঠ করে দেবতাকে জাগরিত করা, ধূপ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, দেবমূর্তিকে স্নান ও বস্ত্রবদল করানো, ভোগ নিবেদন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকতেন। পুরোহিতদের প্রত্যহ চারবার স্নান করতে হত। প্রধান পুরোহিতরা সারা সময় মন্দিরের মধ্যেই বসবাস ও কাজকর্ম করতেন, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কমগুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান পুরোহিতরা মন্দিরের বাইরের অন্যান্য কাজকর্মে যথা কর আদায় ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজে লিপ্ত হতে পারতেন। পুরোহিতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় লিপ্ত হবার ফলে নিঃসন্দেহে মিশরীয় সমাজে তাদের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। প্রাথমিকভাবে নারীদের পুরোহিত হতে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু নব রাজতান্ত্রিক সময় থেকে কেবল পুরুষরাই পুরোহিত হতে শুরু করেন। সাধারণভাবে মানুষদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না। তারা সাধারণত প্রথম প্রাঙ্গণের অধিক অভ্যন্তরে যেতে পারতেন না। গৃহে তারা তাদের দেবতাদের উপাসনা করতেন তবে মন্দিরে তারা পূজা সামগ্রী দান করতে ও প্রার্থনা করতে আসতেন। এবং বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মূর্তিগুলিকে বের করে শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হত। সেই সময় কাঠের মন্দির করে (চতুর্দোলা) তাদের বহন করা হত।

মন্দিরের মধ্যে দুই ধরনের মন্দিরের কথা বলা যেতে পারে। ১) উপাস্য দেবতার মন্দির (Cult temple) ২) স্মৃতি মন্দির (Mortuary temple)। উপাস্যদেবতাদের মন্দিরে (Cult temple) দেবতাদের মূর্তি স্থাপিত থাকতো এবং তাদের উপাসনা করা হত। Karnak এবং Luxor তে Amun এর মন্দিরের কথা জানা যায়। তৃতীয় আমেন হোটেপ বার্ষিক উৎসবে Karnak থেকে Luxor তে Amun মূর্তি নিয়ে যাবার প্রথা চালু করেন। অন্যদিকে স্মৃতি মন্দির বা Mortuary temple গুলি মৃত ফ্যারাওদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এগুলি নির্মাণ পরলোকে তার প্রবেশের জন্য আবশ্যিক ছিল। নতুন ফ্যারাও সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই এই নির্মাণ কার্য শুরু হত। মৃত্যুর পর দেবতা হয়ে যাওয়া ফ্যারাওর পৃথিবীতে মন্দিরের মত একটি ঘরের প্রয়োজনীয়তা এই ধরনের বিশ্বাসে প্রতিফলিত হয়।

মিশরের মূল দেবতাদের কথা চিন্তা করলে পূর্বোক্ত ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যিক। Ehliopolis এর মূল দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা ছিলেন সূর্যদেবতা Atum, তিনি Geb (পৃথিবী) ও Nut (আকাশ) সৃষ্টি করেন। তাঁকে Bennu নামক কিংবদন্তী পাখির রূপে কল্পনা করা হত। মনে করা হত Osiris, Isis, Seth এবং Nepthys তারই সন্তান। প্রাচীন রাজবংশের সময়ে এই উপাসনা জনপ্রিয় ছিল এবং এই সময়েই Heliopolis কে কেন্দ্র করে 'Re' সূর্যদেবতা রূপে আবির্ভূত হয়। Atum, Re এর সাথে ধর্মীয় আত্তীকরণের মাধ্যমে অস্তমিত সূর্য Re-Atum তে পরিণত হন। আবার তিনি Horus এর সাথে মিলিত হয়ে Re-Harakhte বা উদীয়মান সূর্যরূপে পরিগণিত হন। আবার Memphis এর পুরোহিত গণ Psth কে Atum এর পূর্ববর্তী দেবতারূপে অভিহিত করেন। Sekhmet তার স্ত্রী রূপে পরিচিত হত এবং তারা Re-Atum এর মাতা-পিতা রূপে পরিচিত হন।

৩.৪ ওসাইরিস উপাসনা (Cult of Osiris)

প্রাচীন রাজবংশের শেষভাগ থেকে ক্রমশ রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা দুর্বল হতে শুরু করে। পুরোহিততন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। মধ্যবর্তী রাজবংশের সময়ে দেশে ঐক্য পুনস্থাপিত হলেও সম্রাটের ওপর দেশের

ঐক্য বজায় রাখার জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা আর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হত না। মধ্যবর্তী শাসনে Re-Atum, Path, Amun এর মন্দির ও উপাসনা পুনরায় খ্যাতি লাভ করার পাশাপাশি, মিশরে অধিবাসীদের সুরক্ষা ও সুরক্ষিতভাবে পরলোকের পথে নিয়ে যাবার জন্য ওয়াইসিসের (Osiris) উত্থান হয়। প্রচলিত বিশ্বাসে ফ্যারাও মৃত্যুর পর তার সাথে মিলিত হন।

প্রাথমিকভাবে Osiris ছিলেন উর্বরতার দেবতা। শস্যের পুনরুৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তার নিজের মৃত্যু ও পুনর্জন্মেরকাহিনী তাঁকে পরলোকের সঙ্গে ও সংযুক্ত করে দিয়েছিলো। অ্যাবিডোস (Abydos) অঞ্চলকে কেন্দ্র করে Osiris এর সমাধি মনে করা হত এবং এই অঞ্চলে বৃহৎ সমাধি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মিশরীয়রা মনে করতেন Abydos এর সাথে নিজেদের সংযুক্ত করলে পরলোকে অমরত্ব লাভ করা যাবে। এই ভাবে Abydos মিশরীয়দের অন্যতম প্রধান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে Osiris এর পুনর্জন্মের উৎসব মিশরে পালিত হতে থাকে। মনে করা হয় মৃত্যুর পর Osiris বিচার করে মানুষকে অমরত্ব দান করবেন।

ওসাইরিসের সাথেই উল্লেখ কার যায় তার পত্নী Isis ও পুত্র Horus এর কথা। Isis মিশরের মাতৃদেবী হিসাবে ফ্যারাওর দেবীমাতা রূপে প্রতিভাত হতেন। তিনি ওসাইরিসের পত্নী হিসাবে, তাঁর স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করণের কাজে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি নিজ পুত্রকেও তিনি রক্ষা করেন। তাই তিনি মিশরীয়দের কাছে আদর্শ স্ত্রী ও মাতার প্রতিমূর্তি হিসাবে উপস্থাপিত হন। অনেক সময় তাকে ডানা যুক্তরূপে কল্পনা করা হয়। যেখানে ঘুড়িরূপে তিনি Osiris কে জীবিত করার প্রয়াস করেন। নতুন রাজতন্ত্রের সময় তিনি গাভী রূপে পূজিত হতে শুরু করেন। আইসিসের উপাস্থাপনা মিশর অতিক্রম করে রোম অবধি বিস্তৃত ছিল। এমনকি মিশরে খ্রিষ্টানদের প্রবেশের পরও তাকে উপাসনা করা হত।

ওসাইরিস পুত্র Horus মিশরীয় রাজতন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে, পিতা Osiris তাঁর ভ্রাতা Seth কর্তৃক নিহত হলে মাতা Isis এর সাহায্যে দীর্ঘযুদ্ধের পর খুল্লতাতকে পরাস্ত করে ওসাইরিস পুত্র Horus সিংহাসন লাভ করেন। মিশরের জীবন্ত রাজারা Living Horus রূপে পরিচিত হতেন এবং মৃতরা Osiris এর সাথে সংযুক্ত থাকতেন। এইভাবে মিশরের রাজতন্ত্র বৈধতা পেত। মৃতরাজারা মমিকরণ ও সমাধিদানে নেতৃত্বদানকারী Horus হিসাবে কাজ করেছেন এইরূপ মনে করা হত। এইভাবে দেবতার কিংবদন্তী মিশরীয় রাজতান্ত্রিক বিকাশে ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩.৫ ঃ আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ

অষ্টাদশবংশীয় নবম ফ্যারাও আমেনহোটেপের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন। তিনি সৌরদেবতা হিসাবে আতেনকে উপস্থাপিত করতে প্রয়াসী হন। মধ্যবর্তী রাজবংশের সময়কাল থেকে সৌরচক্র হিসাবে আতেনের কথা জানা যায়। তবে অষ্টাদশবংশের শাসনকাল থেকে আতেন Aten, সূর্যদেব Amun এর বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত হতে শুরু করে। Re-Herakhty ইহার সাথে আত্তীকৃত হন এবং আতেন ক্রমশ Heliolition Atum এবং Theban Amune-Re র চেয়েও উচচ মর্যাদার অধিষ্ঠিত হন।

কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে আতেনকে তাঁর স্বীয় মর্যাদা পুরোহিততন্ত্র নয়, বরং রাজা স্বয়ং প্রদান করেন। চতুর্থ আমেন হোটেপ আতেনকে অন্য সমস্ত দেবতার থেকে উচচতম মর্যাদা প্রদান করেন। এই সময়কালে মিশরের

ইতিহাসে প্রথমবার একেশ্বরবাদের প্রচলন ঘটে। একে 'আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ' বলা যেতে পারে। তাঁর পঞ্চম বা ষষ্ঠ রাজ্যবর্ষে চতুর্থ আমেনহোটেপ আখেনতাতেন (আতেনের দিক চক্রবাল) নামক স্থনে (বর্তমান এল আর্মানা) স্থানান্তর করেন। এখানে আতেনকে উদ্দেশ্যেকরে মন্দির নির্মিত হয় এবং ফ্যারাও নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন, আখেনাতেন (আতেন ভৃত্য)। অতপর তিনি সক্রিয়ভাবে অন্য সকল দেবতাদের আরাধনা বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হন। তিনি মন্দিরগুলি বন্ধ করতে আদেশ জারি করেন এমন আমুনমূর্তি ও নাম ভেঙ্গে দিতে বা মুখ বিকৃত করে দিতে চেষ্টা করেন।

সূর্যের পূর্ববর্তী রূপগুলি যথা Re, Herakhty, Khepri, Atum এবং amun কে বাদ দিয়ে আতেনকেই একমাত্র জীবনদায়ী শক্তি ও দেবতারূপে উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি আখেনাতেন নিজ ও নিজপরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঘোষণা করেন যে আতেন তাকেই দর্শন দিয়েছেন। তিনি আতেনের নির্দেশ সকলকে প্রদান করেছেন।

তবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন মিশরের জনসাধারণ থেকে শুরু করে পুরোহিততন্ত্র কেউই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। যদিও রাজদরবার এই নবধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, এবং এটি সেই সময়ে ছিল রাজধর্ম। এই দেবতার না ছিল মূর্তি না ছিল কিংবদন্তী, না সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ। সাধারণ মানুষ চিরাচরিত দেবতাদের উপাসনা করতেন। তাদের গৃহীত পুরাতন দেবতাদের উপাসন হত। কিন্তু আইনত রাজপরিবার ব্যতীত কারো মূর্তি এই সময় গৃহ বা মন্দিরে রাখার অনুমতি ছিল না। এই সময়ে আখেনাতেনের স্ত্রী নেফারতিতি রাজনৈতিকভাবে প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। আখেনাতেনের সময়ে মিশরীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ব্যপক পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়েছিল।

তবে এই সংস্কারবাদী চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আখেনাতেন পুত্র তুতেনখাতেন ফ্যারাও হন এবং নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখেন তুতেনখামুন। তিনি আমুন উপাসনা পুনরুদ্ধার করেন। আখেনাতেনকে ধর্মদ্রোহীরূপে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর সমস্ত মূর্তি, রাজধানী ধূলিসাৎ হয় এবং আমুন প্রধান দেবতা হিসাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার পাশাপাশি, আতেনকে দেবতা নিচয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদ তাঁর সময়কালের পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪ ঃ হিট্টাইট আক্রমণ, মিশরীয় আইন ব্যবস্থা, মমিকরণ প্রথা সমূহ (Unit-7)

৪.১ ঃ মিশরীয় ইতিহাসে বৈদেশিক হিট্টাইট আক্রমণ, সন্ধি ও গুরুত্ব

মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস হিট্টাইট আক্রমন এবং তাদের বিরুদ্ধে মিশরের যুদ্ধ এবং শান্তিস্থাপন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সংক্রান্ত তথ্য মিশর ও সিরিয়ার লেখমালার মাধ্যমে পাওয়া যায়। প্রধানত বিখ্যাত কাদেশের যুদ্ধ (Battel of Kadesh)-এর ষোড়শ বৎসর পর আনুমানিক 1259 খ্রিঃ পূর্বাব্দে মিশরীয় হিটাইটদের মধ্যে 'চিরস্থায়ী সন্ধি' (Silver treaty) স্বাক্ষরিত হয় এই সন্ধি, যাতে স্বাক্ষরকারী বিবাদমান দুই পক্ষের লেখমালাই ঐতিহাসিক খুঁজে পেয়েছেন। হিট্টাইট রাজধানী হাট্টুসা (বর্তমান তুরস্ক) তে পাওয়া গেছে, যা ইস্তানবুল প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে সংরক্ষিত। অন্যদিকে এই আবিষ্কারের বহু পূর্বে 1828 খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এইগুলি মূলত থিবসে

দ্বিতীয় রামেসিসের মন্দির সমূহ, কার্ণাকের আমুন মন্দির গাত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই লিপিগুলি মিশরীয় বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাসের অধ্যয়নে উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান।

মধ্যসিরিয়া অঞ্চলে হিট্রাইট শক্তির উত্থানের মাধ্যমে হিট্রাইট ও মিশরীয়দের সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। মিত্তানি শক্তির পতনের পর হিট্রাইটরা কাদেশ বেং আমুররুতে মিশরীয় সামন্তদের ওপর স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করে। আখেনাতেন এর সময়কালে হাতছাড়া হওয়া এই রাজ্যগুলি মিশরীয়রা কখনোই মেনে নিতে পারেনি, সেই কারণে তারা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়েছেন এই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে। এই বিষয়ে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় প্রথম সেটির (Seti-I) এর রাজত্বকালে তিনি একটি আক্রমণ কাদেশ ও আমররু জয় করলেও তা ধরে রাখতে পারেননি, একটি সন্ধির মাধ্যমে তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়।

1247 BC নাগাদ সেটিপুত্র দ্বিতীয় রামেসিস হিট্রাইট শক্তিকে উৎপাটিত করার জন্য প্রচুর সেনাবাহিনী নিয়ে কাদেশ অভিমুখে অগ্রসর হন। হিট্রাইট রাজ দ্বিতীয় মুয়াতাল্লি তাঁর সহযোগীদের কাছ থেকে স্বীয় রাজ্য রক্ষার্থে সেনা সংগ্রহ করেন। কাদেশের সন্নিকটে রামেসিস তাঁর সিংহভাগ বাহিনী অপেক্ষা অগ্রগমন করলেন। হিট্রাইট বাহিনী, মিশরীয় 'আমুন সেনা'-কে অতর্কিত আক্রমণে তাদের ছত্রভঙ্গ করে। আমররু থেকে সাহায্যকারী বাহিনী এসে উপস্থিত হওয়াতে ফ্যারাও হিট্রাইট রথারূঢ় বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

যদিও এই যুদ্ধে মিশরীয়রা সসম্মানের প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল, তা সত্ত্বেও রামেসিস যেভাবে নিজ মহিমা কীর্তনের প্রেক্ষাপট হিসাবে এই যুদ্ধের যা ফলাফল চেয়েছিলেন, তা সম্ভবপর হয় নি। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রামেসিস এই যুদ্ধে প্রদর্শিত আত্মবীরত্ব, স্বদেশে প্রচার করেন। বিভিন্ন মন্দির গাত্রে রথারূঢ়, ধর্ণুবাণধারী রামেসিস এর চিত্র অঙ্কিত হয়। যদিও যুদ্ধে তিনি আংশিক জয়লাভ করেন, কিন্তু তাঁর বৃহত্তর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। হিট্রাইটরা আমরু অধিকার করে তাদের ও মিশরের মধ্যে মধ্যবর্তী অঞ্চলের দৈর্ঘ্য আরো বিস্তৃততর করে।

সিরিয়ার অভিযানের ক্ষয়ক্ষতির পরেও রামেসিস তাঁর রাজ্যের অষ্টমবর্ষে পুনরায় অপেক্ষাকৃত সফল একটি অভিযান পরিকল্পনা করেন। সুরক্ষিত কাদেশ নগরটি বা আমবরু অভিযান না করে ফ্যারাও এবার দাপুর নগর অধিকার করেন। তিনি এই নগরকে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। দাপুর জয় করে মিশরীয়রা ফিরে গেলে এই নগর পুনরায় হিট্রাইটদের আনুগত্য স্বীকার করে। তার রাজ্যের দশমবর্ষে দ্বিতীয় রামেসিস পুনরায় মধ্যসিরিয়ার হিট্রাইট সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণে প্রয়াসী হন, এই যুদ্ধেও একইভাবে অনেক অঞ্চল দখলীকৃত হলেও সেইগুলি পুনরায় হিট্রাইট অধিকারে ফিরে যায়। এই রকম কিছু বিক্ষিপ্ত যুদ্ধবিগ্রহ হলেও কাদেশের যুদ্ধই ছিল এই দুই শক্তির শেষ সম্মুখ সমর। এইভাবে হিট্রাইটদের বিনাশ সম্ভব পর নয় অনুমান করে রামেসিস উভয় শক্তির মধ্যে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শেষ পর্যন্ত 1259 BC নাগাদ তৃতীয় হাট্টুসিলিস ও দ্বিতীয় রামেসিস একটি চিরস্থায়ী শান্তিতে আবদ্ধ হন।

এই শান্তি চুক্তিতে প্রাচীন নিকেটপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ আর্ন্তজার্তিক শান্তিচুক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। উদ্দেশ্যরূপে এই চুক্তিতে উভয়পক্ষ নিজেদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার কথা বলেন। উভয়ে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করে যে তারা কেউ পরস্পরের রাজ্য অভিযান করবেন না। সিরিয়ার বিতর্কিত ভূখণ্ড নিয়ে তারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে অগ্রগামী হবেন। তারা এই ভূখণ্ডের অধিকারের জন্য কখনোই ব্যয়বহুল যুদ্ধ যাত্রায়, অগ্রগামী হবেন না।

দ্বিতীয় একটি ধারায় স্থির হয় যে, স্বাক্ষরকারী দুইপক্ষ যদি কোন তৃতীয় পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়, অথবা তাদের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা যায়, তাহলে একে অপরকে সেনা দিয়ে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক দেশদ্রোহীদের আশ্রয়দান না করে তাদের দেশের হাতে হস্তান্তরের কথা ঘোষিত হয়। হিট্টাইটদের লেখমালা অনুসারে রামেসিস, হিট্টাইট রাজ হাট্টুসিলিসের উত্তরসূরীদের সহায়তাদানের অঙ্গীকার করেন। সন্ধির সাক্ষী হিসাবে হাত্তি ও মিশরীয় দেবতাদের আহ্বান করা হয় এবং তাদের নামও এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করণের মাধ্যমে এই চুক্তিকে দৈবমর্যাদা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বংশ পরম্পরা পুত্র—পৌত্রাদি ক্রমে এই চুক্তি বজায় রাখার অঙ্গীকার করা হয়।

কোন কোন মিশরতত্ত্ববিদরা এই চুক্তিকে শান্তি হিসাবে দেখেছেন, আবার কেউ একে দেখেছেন মৈত্রী চুক্তি হিসাবে। James Breasted (1906) মন্তব্য করেন এটি কেবল মাত্র মৈত্রী নয়, বরং এটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তি ছিল। তবে Alan Gardiner এবং S.Langdon মনে করেন এটি কেবল যুদ্ধ বন্ধ করার চুক্তি ছিল। তাদের পূর্বসূরীরা অনুবাদের তারতম্যের জন্য শান্তির ভিক্ষাকে শান্তি হিসাবে কল্পনা করেছেন। অপর একটি বিষয়, ঐতিহাসিকরা গভীরভাবে আলোচনা করেন সেটি হল যে দুই শক্তির মধ্যে কে আলোচনা শুরু করেন। অনেকের মতে যেহেতু হিট্টাইটরা তাদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন তাই তিনি হয়তো আলোচনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু Donald Magnetti দেখিয়েছেন যে নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে 'maat' এর ঐতিহ্য ধরে রাখা ফ্যারাওয়ের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, তাই রামেসিসের পক্ষে আলোচনা শুরু করায় বাধা ছিল না। সবশেষে বলা যায়, হিট্টাইট ও মিশরীয় শান্তিচুক্তি নিৎসন্দেহে তাদের যুগের তুলনায় অত্যন্ত অগ্রগামী এক পদক্ষেপ ছিল।

৪.২ ঃ মিশরীয় আইন ব্যবস্থা

মিশরীয় সমাজে আইন শৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থার ওপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। মিশরীয় প্রশাসন বিভিন্ন বিভাগে, মন্ত্রীপরিষদও সহকারী আমলাতন্ত্রের মধ্যে বিতাড়িত থাকলেও সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা রাজা বা ফ্যারাওর ওপর ন্যস্ত ছিল। চতুর্থ রাজবংশের সময় থেকেই তিনি Horus (হোরাস) এর জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে গণ্য হতে শুরু করেন। 'Maat' ছিল সততা, ন্যায় ও বিচারের দেবী কিন্তু এই শব্দটি স্থিতাবস্থা ও স্থায়িত্বকেও বোঝাত। ইহা নৈতিকতার ধারণার সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। সেই কারণে যে কোন অন্যায় বোঝাত। ইহা নৈতিকতার ধারণার সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল। সেই কারণে যে কোন অন্যায় কার্যকে Maat এর ধারনার পরিপন্থী হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

মিশরে সেই অর্থে কোন রকম লিখিত আইন ব্যবস্থা ছিল না। এর পরিবর্তে ফ্যারাওদের বিচারের রায়ের ওপর ভিত্তি করে অলিখিত আচরণবিধি প্রচলিত ছিল।

যদিও আদালতের নথিগুলি লিপিকারদের দ্বারা রচিত এবং সংরক্ষিত থাকতো। এই রায়গুলি পরবর্তীকালে বিচারের সময় স্মরণে রাখা হত। বিচারের জন্য জেলা ও নগর আদালত রাখা হত। সেখানে স্থানীয় সম্মানীয় নাগরিক বা স্থানীয় কর্মচারীরা বিচার পরিচালনা করতেন। অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ মোকদ্দমাগুলির বিচার রাজার নিযুক্ত প্রতিনিধি বা স্বয়ং ফ্যারাও করতেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আদালতে নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেতেন। পাশাপাশি নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকারী ছিলেন সকলে। তবে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া অধিক সন্দেভাজনদের নিরপরাধ নয় বরং অপরাধী মনে করা হত। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শারিরীক নির্যাতন করা হত। অপরাধ প্রমাণ না হলেও তাদের প্রহার করা হত।

বিচারের পর শাস্তিবিধান করা হত। অপরাধীকে শাস্তি হিসাবে প্রহারের দণ্ড দেওয়া যেত। পাশাপাশি অপরাধের মাত্রা অনুসারে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, নিলাম, হাত, নাক কর্তন প্রভৃতি করা যেত। অনেক সময় অপরাধিকে দেশত্যাগের আদেশ দেওয়া হত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার একমাত্র ফ্যারাও রীতি ছিল। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অধিকার একমাত্র ফ্যারাওর ছিল। বৈবাহিক জীবনে বিশ্বাসভঙ্গকে তখনই গুরুতর অপরাধ মনে করা হত যদি যার সঙ্গে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তিনি যেটিকে নিয়ে ন্যায়ের আবেদন করতেন, পরকীয়ার লিপ্ত স্ত্রীকে স্বামী ক্ষমা করতে পারতেন, কিন্তু বিচারের জন্য আবেদন করা হলে এবং তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুর হত। স্ত্রীর নাসিকাছেদ এমনকি জীবন্ত দাহ করার বিধান ছিল। অপর পক্ষে স্বামীর একই অপরাধে সহস্র ঘা আঘাত করার বিধান ছিল, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত না।

মিশরের কোন আইনজীবী ব্যবস্থা ছিল না। অভিযুক্তকে রক্ষীগণ এবং বিচারপতিরা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সাক্ষীদের বয়ান পরীক্ষা করা হত এবং সেই অনুসারে বিচার করা হত, তাই সাক্ষীদেরও মারধর করা হত, যাতে তারা সত্যি কথা বলে। এমনকি নিরপরাধ প্রমাণিত হলেও সরকারী নথিতে চিরকাল সেই ব্যক্তি কখনো অভিযুক্ত হয়েছিলেন সেই ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকতো। এই বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক ছিল। সেই কারণে ব্যক্তিগত কারণে প্রতিবেশী বা পরিবারের কেউ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনলে, সেই অভিযোগ মিথ্য প্রমাণ হলেও অভিযুক্তকে অপমানিত হতে হত।

এই কারণে মিথ্যা অভিযোগকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত। নিরপরাধকে শাস্তি বিধান করা হলে তা দৈবনির্ভর রাজততন্ত্র, দেবশাসক ফ্যারাও এবং তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারতো। সেই কারণে মিথ্যা সাক্ষ প্রদানকারীর ভাগ্যে অপেক্ষা করত কঠোর ও ভয়াবহ শাস্তি। যেকোন আদালতকে স্বজ্ঞানে ভুল পথে পরিচালিত করার প্রয়াস করত, তাকে অঙ্গচ্ছেদ থেকে নিমজ্জন করে হত্যা যে কোন দণ্ড প্রদান করা হত। এইভাবে সন্দেহ ভাজনের সকল সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখে দোষী সাব্যস্ত করা হত এবং দণ্ডবিধঝান করা হত।

খুন, ধর্ষণ, চৌর্যবৃত্তি এবং সমাধিমন্দির লুণ্ঠনকে মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গবিকৃতি যোগ্য অপরাধ বলে মনে করা হত। খুনিদের প্রহার করে কুমীরদের ভোজনের জন্য দেওয়া হত, অথবা জীবন্ত দগ্ধ করা হত। চোরদের হাত পা কেটে দেওয়া হত। পিতা-মাতাকে হত্যাকারী সন্তানদের ভয়ঙ্করতম মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, কিন্তু সন্তানঘাতী পিতা মাতাকে কেবল মৃত সন্তানকে তিন দিন রাত ধারণ করে থাকতে হত।

প্রখ্যাত মিশরবিদদের মতে, অন্যান্য সমকালীন সভ্যতা সমূহের তুলনায় মিশরীয় সভ্যতার আইনব্যস্থা তার পরিকাঠামো সম্পর্কে খুবই অল্প তথ্য সংরক্ষিত রেখেছে। তবে ইহা ধর্মীয় অনুশাসনকেন্দ্রিক ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এই রকম ধারণা করা হত যে মানুষদের স্বয়ং ঈশ্বর আইনের ধারণা প্রদান করেছেন। এবং আইনের শাসন দেবতারাই বহন করেন। এইভাবে মিশরে আইন ও তাকে কেন্দ্রকরে শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

৪.৩ ঃ মৃত্যু ও মমিকরণ

মিশরীয়রা মৃত্যুর পর জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন তিনটি প্রধান আত্মা মানবদেহে বাস করে। (1) জীবনী শক্তি (ka), (2) ভ্রাম্যমান আত্মা (Ba) ও (3) একটি পক্ষীরূপধারী আত্মা। তৃতীয় আত্মাটি মৃত্যুর

সাথেই নক্ষত্রলোকে যাত্রা করলেও প্রথমদুটি আত্মা তাদের ত্যাগকরা দেহের ওপর নির্ভর করে থাকে। তাই দেহের যথাযথ সংরক্ষণ হওয়া জরুরী। প্রাথমিক পর্বে মিশরীয়রা বালির মধ্যে দেহ কবর দিতেন, যেস্থানে অনেক দেহ সুরক্ষিতভাবে থাকতো। সেখান থেকে এই ধারণার সূত্রপাত বলে অনেকে মনে করেন।

মিশরীয় মতে দেবতা ওসাইরিস ছিলেন সেই দেবতা যিনি মৃত্যুর পর কিছুকালের জন্য জীবন্ত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি মৃত্যুলোকের অধিপতি হন। পাশাপাশি পুনর্জন্মের দেবতা বলেও তাকে অভিহিত করা হয়। এই থেকে ধারণা হয় যে মিশরীয়রা পুনর্জন্মের অধিকারী চতুর্থ রাজবংশের সময় থেকে প্রত্যেক ফ্যারাও দেবতা Horus এর জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যিনি মৃত্যুতে পিতা Osirisএর সাথে এক হয়ে যাবেন ও দেবতাদের সঙ্গে অমর জীবন প্রাপ্ত হবেন। প্রথমদিকে মনে করা হত কেবল ফ্যারাও অমরত্বের অধিকারী কিন্তু মধ্যবর্তী বংশের শাসক Senuret-I এর প্রভাবে এই রূপ ধারণা হয় যে সকল মানুষ অমরত্বের অধিকারী। অতপরঃ পূর্ববর্তীকালে রচিত 'Book of the Dead' এবং মধ্যবর্তী সময়ে রচিত 'Coffin text' এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দরিদ্রতম মানুষের সমাধিতেও 'Book of the Dead' দেওয়া হয়।

সময়ের সাথে সাথে মিশরীয়দের সমাধি দানের প্রথা উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। তারা মৃতদেহকে সংরক্ষিত করার জন্য নতুন ধরনের প্রক্রিয়ার অবতারণা করে। এই প্রথা মমিকরণ প্রথা নামে প্রসিদ্ধ। 'Mummmy' শব্দটি এসেছে আরবিক 'Mummya' শব্দ থেকে যা বিটুমেন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সম্ভবত রেজিন (Resin) আবৃত কিছু নিম্নমানের মমি থেকে এইরূপ ধারণা প্রাথমিকভাবে করা হত। মনে করা হয়, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব 2600 অব্দে চতুর্থ রাজবংশে সময়ে মমিকরণ সূত্রপাত হয় এবং প্রায় তিন হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল।

মমিকরণকারী মিশরীয়রা ইহা অনুধাবন করেছিলেন যে দেহ সংরক্ষণের জন্য দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি নিষ্কাশন ও দেহটি শুষ্ককরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তারা লবণ সংগ্রহ করতেন বিভিন্ন মরুহ্রদ থেকে যা এই সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারতেন। যেহেতু মনে করা হত পরলোক অস্তমিত সূর্যের দিক তাই নীলনদের পশ্চিমতটে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহকে নিয়ে যেতেন। সেখানে দেহটিকে স্নান করানো হত। অতপরঃ মমিকরণ ক্রিয়া শুরু করা হত। সহজতম সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল পাকস্থলী খালি করে, দেহগহ্বর পরিষ্কার করে, দেহটিকে চল্লিশদিন Natron (লবণ বিশেষ) দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা। এটি ছিল সবচেয়ে কমদামী পদ্ধতি। অপেক্ষাকৃত মধ্যমমানের পদ্ধতিতে দেহে একটি দ্রাব্য রাসায়নিক প্রবেশ করিয়ে সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গকে গলিয়ে বের করে নেওয়া হত। অতপরঃ লবণ দিয়ে দেহকে শুষ্ক করা হত। তবে এর চেয়ে সর্বাধিক মূল্যবান একটি পদ্ধতি ছিল, যাতে দেহ সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকতো।

এই মূল্যবান পদ্ধতিতে একটি কাঠের পাটাতনের ওপর দেহটি রেখে যকৃৎ, ফুসফুস, পাকস্থলী ও অন্ত্র সমূহ নিষ্কাশিত করা হত। দেহের পাশ্ববর্তী অঞ্চল ছেদ করে এগুলি বের করে আনা হত। অষ্টাদশবংশের পূর্ববর্তী সময়কাল পর্যন্ত মস্তিষ্ককে অবিকৃত রাখা থাকলেও এই সময় থেকে একটি ধাতব তারের সহায়তায় নাকের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কটি ও নিষ্কাশন করা হত। যদিও হৃদযন্ত্রটি সরানো হত না। দেহ গহ্বরটি মশলা ও মদ্যদ্বারা ধৌত হোত। এরপর দেহের ভেতরে কাঠের গুঁড়ো, খড় প্রবেশ করিয়ে শুষ্ক করার প্রক্রিয়া চালানো হত। এরপর সেই দেহটিকে একটি পাথরের টেবিলে শুইয়ে চল্লিশ দিন ধরে লবণের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হত। এরপর দেহ থেকে খড়, বালি প্রভৃতি বের করে সেটিকে আবার ধৌত করা হত। এরপর রেজিন সিক্ত গজকাপড়, কাঠের গুড়ো ওNatron

খণ্ড দিয়ে সেটিকে পুনরায় ভর্তি করা হত। দেহটিকে বাইরের দিয়ে তেল, মোম, দুধ, মদ্য এবং মশলা মাখানো হত। এরপর কাটা অংশটি জুড়ে দিয়ে পুরোদেহটি রেজিন দিয়ে আবৃত করে, কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হত। অনেক সময় কাপড় দিয়ে মোড়ার পূর্বে গহনা, প্রসাধনী ও বস্ত্র দেওয়া হত। 'Wetyw' রা এই পদ্ধতির পালন করতেন। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শৃগালের মুখোশ পরিহত 'hevy Sesth' বা 'Controller of Mysteries' গণ। তারা শৃগাল মুখী দেবতা Anubis-এর অনুকরণ করতেন। ব্যাণ্ডেজ বাধাতে পনের দিন সময় লাগতো। কারণ প্রতিটি পর্যায়ে পুরোহিতরা নির্দিষ্ট প্রথা পালন করতেন। ব্যাণ্ডেজের বিভিন্ন স্তরে তাবিজ দেওয়া হত। এইভাবে দেহটিকে মুখোশ পরিয়ে কফিনে শোয়ান হত। এইভাবে মৃত্যুর সত্তর দিনের মাথায় মমিকরণ সম্পন্ন হত।

মমিকরণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল পিরামিড। মৃত ফ্যারাওদের মমিকে তাদের নামাঙ্কিত পিরামিডে সমাহিত করা হত। তৃতীয় রাজবংশের ফ্যারাও Dioser-এর জন্য সর্বপ্রথম ধাপযুক্ত পিরামিড নির্মিত হয়েছিল 2650 BCE মেমফিসের নিকটস্থ সাকারাতে। এটি আদিমতম সমাধিক্ষেত্রের থেকে উন্নততর সমাধি ব্যবস্থা ছিল। এই সময়ে চতুর্দশরাজবংশের Sneferu-র সময়েও ধাপযুক্ত পিরামিড ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরে প্রকৃত আকারের পিরামিড নির্মিত হয়। পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যরূপে নির্মিত গিজার পিরামিড Khufu আমলে বানানো হয়। এখানে Khufu পুত্র Kfafre এবং পৌত্র Menkaure-র পিরামিড ছিল। Khufu-র পিরামিডটি প্রায় 146 মিটার (480 ফুট) উঁচু, এর ভিত্তিভূমি 230 মিটার (755 ফুট) বর্গক্ষেত্র। এটি এখনও বিশ্বের উচ্চতম প্রস্তর নির্মিত নির্মাণ।

মনে করা হয় সম্ভবত প্রায় ২০ বছর ধরে প্রায় ৪০০০ জন বা আরও অধিক শ্রমিক এই নির্মাণটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। পূর্বে মনে করা হত যে এই শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল দাস শ্রমিক বর্তমানে মনে করা হয়, অধিকাংশই দক্ষ শ্রমিক ও তখন শিল্পী ছিলেন, কেবল বন্দী ক্রীতদাস দ্বারা এইরূপ নিখুঁত পরিকল্পনা ও নির্মাণ সম্ভব নয়। পিরামিডের মধ্যে মমিকৃত দেহগুলি রাখা হত। বেশিরভাগ পিরামিড ও সমাধি পাওয়া গিয়েছে Valley of Kings-এ। এখানে ফ্যারাওদের সাথে তাদের রাণী, শিশু এ এমনকি অভিজাতদেরও সমাধি এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই সমস্ত রাজকীয় পিরামিডের বিপুল ধনৈশ্বর্য সঞ্চিত থাকত। যা পরলোকের জন্য ফ্যারাওদের অর্পণ করা হত। যদিও অধিকাংশই পরবর্তীকালের দস্যুরা অপহরণ করে, তা সত্ত্বেও তুতেনখামেনের সমাধিতে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি সেই সময়ের রাজকীয় সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। এইভাবে দেখা যায় প্রাচীন মিশরের সংস্কৃতিতে মমিকরণ ও পিরামিডের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেহ সংরক্ষণ ও পিরামিড নির্মাণের দক্ষতা মিশরীয়দের বিজ্ঞান চেতনার অগ্রগতিরও প্রমাণ বহন করে যেখানে দেহবিদ্যা, জৈবরসায়ণ এবং স্থাপত্যশৈলী, সবদিকেই তারা পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

৫ ঃ উপসংহার

বর্তমান আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে প্রাচীন মিশরে নীলনদকে কেন্দ্রকরে একটি শক্তিশালী মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যা মানবসভ্যতার ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। এ.কে.এম. শাহনওয়াজ; বিশ্বসভ্যতা।

২। Published by Parra gem; Ancient Egypt.

৩। B. Trigger; Ancient Egypt: A Social History.

৪। Burns and Ralph, World Civilizations.

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। মিশরের ইতিহাস অধ্যয়নের সম্ভাব্য উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। মিশরের সমাজচিত্র ও সেই সমাজের নারীর অবস্থান কেমন ছিল?

৩। প্রাচীন মিশরীয় রাজতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা কর।

৪। হিট্টাইটদের সঙ্গে মিশরীয়দের সম্পর্কের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৫। মিশরীয় ধর্মব্যবস্থার উল্লেখ করে, আখেনাতেনীয় একেশ্বরবাদের বর্ণনা কর।

৬। মমিকরণের সাথে পরলোক বিশ্বাসের সম্পর্ক কি? মমিকরণের বিবরণ দাও।

Block / পর্যায়–৪

Age of Antiquity : Greece

প্রাচীনগ্রিস

সূচীপত্র ঃ

---

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও গ্রীকধর্ম (Unit-8)

২.১ ঃ গ্রীসে সভ্যতার বিস্তার

২.২ ঃ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ও আন্তঃসম্পর্ক

২.৩ ঃ গ্রীক ধর্মীয় চেতনা

৩ ঃ গ্রীসের সমাজ কাঠামো (Unit-9)

৩.১ ঃ সামাজিক ব্যবস্থা

৩.২ ঃ হেলট ও পেরিকোইসদের অবস্থান

৩.৩ ঃ নারীর স্থান

৩.৪ ঃ গ্রীক-পারসিক সংঘাতঃ

৪ ঃ ধ্রুপদী সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ব্যবস্থা (Unit-10)

৪.১ ঃ গ্রীকসাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি

৪.১.১ঃ কাব্য, সাহিত্য, নাটক

৪.২ ঃ অলিম্পিকস

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১) গ্রীসে সভ্যতার বিস্তার কিরূপে হল?

২) নগররাষ্ট্র সমূহ কিভাবে গড়ে ওঠে?

৩) তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল?

৪) গ্রীকদের ধর্মীয় চেতনা কেমন ছিল?

২ ঃ গ্রীসের নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ও গ্রীকধর্ম (Unit-8)

২.১ ঃগ্রীসে সভ্যতার বিস্তার

বিশ্ব ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতা সমূহের অন্যতম হল গ্রীক সভ্যতা গ্রীকউপদ্বীপে মানব বসতির আদিমতম চিহ্ন পাওয়া যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০অব্দে। অনুরূপ সময়কালেই ক্রীট এবং সাইক্লেডে মিনাওয়ান সভ্যতার সূত্রপাত হয়। যদি এই সভ্যতা ছিল গ্রীক পূর্ব সভ্যতা (2000 BCE-1600BCE), ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপ ক্রীটে এই সভ্যতার আবিষ্কার করেন আর্থার ইভান্স। এই আবিষ্কার প্রাচীন ঐতিহাসিক থুকিডিডিসের মতকে সত্য প্রমাণ করে। তিনি ক্রীটে একটি প্রাচীন সভ্যতার উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন।

আনুমানিক 2000BC নাগাদ ক্রীটে প্রথম প্রাসাদ এবং বহুতল ও সভাগৃহকে কেন্দ্রকরে বহুতল গড়ে ওঠে। এই সমস্ত নির্মাণ Cnossus Phaestos এবং মালিয়া (Mallia) অঞ্চলে নির্মিত হতে থাকে। এই সমস্তক্ষেত্রে নিকট প্রাচ্যের মিশ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রীটবাসীরা হস্তীদন্ত ও অন্য বিলাসদ্রব্য আমদানীর জন্য রত্ন, সুরা ও বস্ত্র রপ্তানি করতে দক্ষিণ (মিশর) ও পূর্ব (আরব) দেশে বাণিজ্য করতে যেত। মিশরীয় নথিপত্রে ক্রীটবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রীট সমাজ শান্তিপূর্ণ হলে প্রকৃতি কখনই এই সুন্দর সভ্যতার সাথে সদয় থাকে নি। 1700BC তে একটি ভূমিকম্পে প্রথমবারের জন্য সকল প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়।

খ্রীঃপূর্ব 1700-1500 BC সময়কাল, যাকে ঐতিহাসিক ইভান্স পরবর্তী মিনওয়ান সভ্যতা ও অন্যান্যরা পরবর্তী প্যালাশিয়াল বলেছেন, অতিদ্রুত সেই সমস্ত ভগ্নপ্রাসাদসমূহকে পুনর্নির্মাণ করেন। এই সভ্যতা সুন্দর মৃৎপার, রত্নসমূহ এবং শিল্প কার জন্য সমাদৃত। Cnossus এর বৃহৎ প্রাসাদে জলপ্রবাহের সুব্যবস্থা ছিল। গৃহগুলি চার থেকে পাঁচতলা অবধি সুউচ্চ ছিল। এবং দেওয়াল গাত্রে নারী, পুরুষ, পশু-পাখির চিত্র অঙ্কিত থাকতো। Cult of Bull (ষাঁড় উপাসনা) বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। ক্রীট ব্যতিরেকে সাইক্লেড ও অন্য ঈজিয়ান দ্বীপ সমূহে এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল থির (স্যান্টেরি) 1600 BC এর পর মূল গ্রীক ভূখণ্ডে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেলে Evans ও কোন কোন ঐতিহাসিক মিনাওয়ান সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু একথা উল্লেখ যে মাইসিনীয় গ্রীকরা সর্বদাই স্বতন্ত্র ছিল। সম্ভবত তারা মিনাওয়ান শিল্পীদের নিয়ে গিয়ে এই শিল্প কার্য সৃষ্টি করাতেন।

এই শান্তিপূর্ণ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র খিরা, প্রকৃতপক্ষে একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর গড়ে উঠেছিল। এই আগ্নেয়গিরি সহসা জাগ্রত হবার কারণে খিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই অগ্ন্যুৎপাত অন্য দ্বীপ সমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এবং খিরাকে লাভার তলার সমাধিস্থ করে। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় বিতর্কিত হলেও ঐতিহাসিক এবং ভূতত্ত্ব বিদগন আনুমানিক 1460BC সময়কে এই ঘটনার জন্য সঠিক বলে চিহ্নিত করেছেন। অতঃপর গ্রীক ভাষাভাষীরা 1450BC সময়ে ক্রীটের প্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু 1380 খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই প্রাসাদ পুনরায় ধ্বংস হয়। এই সময়কালে 'Post Palatial' কাল বলা হয়। অতঃপর c1100BC নাগাদ জেরিয়ান গ্রীকদের আক্রমণে এই সভ্যতার পতন হয়।

খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রকে গ্রীক উপদ্বীপে বিভিন্ন ছোট নগরকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ ব্রোঞ্জযুগীয় সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। 2000BC নাগাদ বহিরাক্রমণে সেই সভ্যতার পতন ঘটে, অন্যদিকে C160BC নাগাদ মাইসীনিয়াতে নতুন সভ্যতার সূত্রপাত হয়। হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি মাইসিনীয়া কে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বলে উল্লেখ করেছেন। যে বক্তব্যটি সমর্থিত হয় সমসাময়িক হিট্টাইট শাসকদের নথিপত্রে। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হয় না, যে প্রাচীন গ্রীস মাইসিনীয়ার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

প্রাক ধ্রুপদী গ্রীক সংস্কৃতি হিসাবে মাইসিনীয় সংস্কৃতিকেই চিহ্নিত করা যায়। মাইসিনীয় সংস্কৃতির ওপর পূর্ববর্তী ও উন্নততর মিনাওয়ান সভ্যতার প্রভাব স্পষ্ট ছিল। স্পার্টার নিকটে স্বর্ণপাত্রের গাত্রে ষাঁড় এবং লম্বাচুলের যুবকদের চিত্র এই প্রভাবকে নিশ্চিত করে। কিন্তু তারা শিকার ও যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। একটি সমাধি ক্ষেত্রে (c.160BC) প্রাপ্ত সুবর্ণ মুখোশ দাড়ি, গোঁফ সমন্বিত গ্রীক যোদ্ধার মুখ, ক্রীটের তুলায় সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। c.1460BC এর থিরা প্রলয়ের পর সম্ভবত পরিতক্ত মিনাওয়ান প্রাসাদ সমূহে গ্রীকরাই অধিকার করে। লিখনশৈলীর কিছু ধরণ ক্রীট থেকে গ্রীকরা গ্রহণ করেন টিরিয়ান, থিবস, অর্কমেনাস এবং এথেন্স, পাইলস প্রভৃতি কেন্দ্রে এই প্রভাব পাওয়া যায়। পাইলসে (Pylos) খননকার্য করে একটি মাইসিনীয় প্রাসাদ আবিষ্কৃত হয়। এইভাবে মাইসিনীয় সংস্কৃতি উত্তরে খেসালি, ঈজিয়ান অতিক্রম করে মিলেটাস এবং পূর্বে সাইপ্রাস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

মাইসিনীয় সংস্কৃতি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে সমৃদ্ধ হয়েছিল। এই সমৃদ্ধি বাণিজ্য এবং লুন্টন উভয়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল। এই সময়কাল মূলত কিংবদন্তীমূলক, থুকিডিডিসের রচনায় যার উল্লেখ মেলে। গ্রীক পুরাবস্তু, মূলত মৃৎপাত্রের নিদর্শন পশ্চিমে সিসিলি থেকে পূর্বে সিরিয়া অবধি পাওয়া গেছে। মাইসিনীয়রা মিনাওয়ানদের Outpost গুলি 1400BC এর মধ্যে অধিকার করে নিলেও অতিদ্রুত বাণিজ্যে আরো অগ্রগতি করতে শুরু করে। মাইসিনীয়রা তাদের নগরগুলিকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Citadel) কে কেন্দ্র করে নতুন নগর প্রকার গড়ে তোলেন। সিংহদুয়ারের ধারণা, দুটি স্তম্ভে সিংহের প্রতিকৃতি এই নতুন ভাবনার মূলে ছিল।

এই সময়কালের অন্যতম বিতর্কিত বিষয়গুলি ট্রয়ের যুদ্ধ। হোমারের রচিত ইলিয়াড ও ওডিসি মহাকাব্যে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। কিন্তু হোমারের রচনা (8th Centure BCE) যেহেতু প্রস্তাবিত অনেক পরবর্তী সময়কালের, তাই ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা সমূহের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্ধিহান। দীর্ঘকাল ধরে চারণ কবিদের দবারা গীত জনপ্রিয় লোকগীতিগুলি এবং কিংবদন্তীগুলির ঐক্যবদ্ধ করণে ফলে এই মহাকাব্যের রচনা হয়েছিল। উনবিংশ শতকের গবেষকরা ট্রয়কে অস্তিত্বহীন কাল্পনিক কাহিনী বলে নস্যাৎ করে দেন। প্রাচীন গ্রীসের মানুষদের

এই কাহিনীকে সত্য মনে করার প্রবণতাকে তারা শিশুসুলভ ভ্রান্তি বলে মনে করতেন। তাদের মতে, পুরো মহাকাব্যই ছিল হোমারের কবি কল্পনার স্ফুরণমাত্র। কিন্তু জনৈক্য জার্মান ব্যবসায়ী Heinrich Schleiemann হোমারের কাব্যের যথাযথ প্রমাণ করতে উত্তর পশ্চিম তুরস্কে খননকার্য শুরু করেন। তিনি সেই অঞ্চলে নগরের অবশেষ পান এবং 1873 খ্রিষ্টাব্দে একটি সম্পদভাণ্ডারের সন্ধান পান। সেটি ট্রয়রাজ প্রিয়ামের ভাণ্ডার বলে তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু সেগুলি আরো প্রাচীন ছিল। অন্যদিকে 1876 খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাইসিনীয়া অঞ্চলে খনন করে একটি রাজমুখোশকে গ্রিকরাজ অ্যাগামেমন এক মুখাবয়ব রূপে চিহ্নিত করেন। তা সত্ত্বেও সেই আবিষ্কার ও ট্রয়ের সম্ভাব্য যুদ্ধের তারিখ থেকে বহুপূর্বের ছিল। কিন্তু তাঁর এই আবিষ্কার গ্রীক কিংবদন্তী গুলিকে অনেকটাই প্রতিষ্ঠা দেয়। মূলত ট্রয় নগরীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

মনে করা হয়, ভূমধ্যসাগরে ট্রয় একটি বাণিজ্যিক রাষ্ট্র ছিল। যেটি কৃষ্ণসাগার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। যেটি গ্রীসের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই যুদ্ধের সম্ভাব্য তারিখ ছিল 1250BC - 1190 BC, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন, উক্তস্থানে গ্রিকরাজ অ্যাগামেমনন, তাঁর পলায়নশীল স্ত্রীকে উদ্ধারের জয় এই নগরী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন কিমা, সেই ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ, কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট, খ্রিঃপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে সাধারণ যুদ্ধের ফলে এই নগরীর পতন আসন্ন হয়ে পড়েছিল।

অতঃপর 1200BC-800BC গ্রীক ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে পরিচিত। এই সময়ে সমস্ত মাইসিনীয় কেন্দ্রগুলি অজানা শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। Pylos-এর মতে কিছু কেন্দ্র পরিত্যক্ত হয়, কেবল মাত্র এথেন্স নিজের নগরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, কিংবদন্তী অনুসারে রাজা Codrus এর আত্মবলিদানের বিনিময়ে। অন্য মাইসিনীয় নগরবাসীরা সাইপ্রাস, ইফিসাস প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করে। এই সময়কালে অক্ষরজ্ঞানহীন বিচ্ছিন্ন ও অনুন্নতভাবে প্রবাহিত হয়।

এই সময় 1050 BC থেকে মৃৎপাত্র নির্মাণ কৌশল নতুন পরিবর্তন আসে। এথেন্সে এই নতুন Protogeometric/প্রাক জ্যামিতিক Style এর সূচনা হয়। এই নতুন শিল্পকলাকে হেলেনীয় শিল্পকলা হতে থাকে। এক্ষত্রে বলা প্রয়োজন যে 'গ্রীক' একটি রোমান শব্দ, প্রকৃত পক্ষে গ্রীকরা নিজেদের হেলেনীস বলত। 1100BC থেকে সহজ ডোরিয়ান বস্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। কাঠের তৈরী গৃহ নির্মাণ হতে শুরু হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রীক সভ্যতা পুনরুত্থিত হতে থাকে যা c. 800BCE নাগাদ ধ্রুপদী সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল।

গ্রীকজাতি ঈজিয়ান অঞ্চলে ও গ্রীক উপদ্বীপে আধিপত্য স্থাপনকারী ইন্দো-ইউরোপীয়ান জাতি গোষ্ঠী ও ভূমধ্যসাগরীয় জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে তৈরী হয়। এর মধ্যে ক্রীয়, আগুনীয়, ইত্তলীয় ও গেরিয়দের মিশ্রণ ঘটে। গ্রীকরা নিজেদের, দেবতা ডিয়কেলিনের পুত্র হেলেন (Hellen) এর বংশধর মনে করত বলে তাদের সভ্যতা হেলেনিয় সভ্যতা নামে বিখ্যাত।

২.২ ঃ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণা ও উদ্ভব

800 খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে গ্রীক সভ্যতা ক্রমশ উন্নত হতে শুরু করে। এই সময় থেকে গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হয়, বিভিন্ন মহাকাব্য হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি রচিত হয়যএই সময় গ্রীসের রাজনীতিতে নগর কেন্দ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ধ্রুপদী যুগে (c.500-c.300BC) গ্রীস কখনোই কেন্দ্রীয় শাসনাধীন শক্তিশালী রাষ্ট্র

ছিল না। তার পরিবর্তে ইহা বিভিন্ন স্বতন্ত্র নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা পোলিশ (Polis) নামে পরিচিত। এই রাষ্ট্রগুলিকে নগররাষ্ট্র (City State) বলার পরিবর্তে নাগরিক রাষ্ট্র (Citizen State) বলা অধিক যুক্তি সংগত হবে।

এইরূপ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পশ্চাতে মূলত গ্রীসের ভৌগোলিক ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী ছিল। বৃহৎ নদী উপত্যকা অথবা সমভূমির অনুপস্থিতিতে গ্রীসে বিভিন্ন পর্বত বেষ্টিত উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত ছিল। সেইরূপ বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে এইরূপ স্বাতন্ত্র স্বাভাবিক ছিল। এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রীসের সভ্যতাকে পৃথিবীর অন্য সভ্যতা অপেক্ষা পৃথক রূপে চিহ্নিত করেছিল। গ্রীক সভ্যতা বিভিন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের বিভক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। মূল ভূখণ্ডে এথেন্স, থিবস ও মেগরা ছিল নগররাষ্ট্র, পেলোপনেসাস অঞ্চলে ছিল স্পার্টা এবং কোরিন্থ, এশিয়া মাইনরের তীরে ছিল মিলেটাস ইত্যাদি। নগর রাষ্ট্রগুলি ছিল বিভিন্ন আকৃতির। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় ছিল এথেন্স ও স্পার্টা।

কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যাতীত গ্রীক নগর রাষ্ট্র সমূহের রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা ছিল প্রায় অভিন্ন। রাজনৈতিক, অভিজাততান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অতিক্রম করে সবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চমশতকে গ্রীসের একটি অংশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে।

যদিও প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র পরিচিত ছিল, তা সত্ত্বেও এগুলির কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। নগর রাষ্ট্র (Polis) অধিকাংশ জনগণ নগরে বাস করতেন। নগরের কেন্দ্রস্থলে সাধারণভাবে কোন পবিত্র ধর্মস্থান বা মন্দির থাকতো। এই মন্দিরটি সাধারণভাবে নগরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নির্মাণ ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে থেকে নগরপ্রাচীরের অস্তিত্ব দেখা যায় (ব্যতিক্রম—স্পার্টা), খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে এই নগররাষ্ট্র গুলিতে নগর পরিকল্পনার নিদর্শন পাওয়া যায়, যেখানে নগরের নির্দিষ্ট স্থান ব্যক্তিগত, সর্বজনীন বা ধর্মীয় স্থানরূপে পৃথকীকৃত হয়। অনেক নগররাষ্ট্র সাধারণ সভাগৃহ এবং প্রেক্ষাগৃহ থাকত। যা রাজনৈতিক এবং বিনোদনের জন্য ব্যবহৃত হত।

আবার বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের পৃথক সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। নগররাষ্ট্র কেন্দ্রিক বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে প্রতিটি নগররাষ্ট্র (Polis)-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ও একজন নগরদেবতা থাকতেন। উদাহরণ স্বরূপ এথেন্সের দেবী এথেনা। আরো কিছু বাস্তবধর্মী বৈশিষ্ট্য থেকে এই নগর রাষ্ট্রগুলির পৃথক চরিত্র পাওয়া যায়। প্রতিটি নগর রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমানা, লিখিত আইন ব্যবস্থা, মুদ্রায় নগরের চিহ্ন (এথেন্সের মুদ্রায় পেঁচা), বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য এবং বিভিন্ন নগরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে নগরগুলি পৃথক চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

অনেক সময় সমমনস্ক (বোলিস) নগররাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক সমঝোতায় মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থরক্ষা করতেন। এই নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যের ধারা দেখা যায়, প্রতি চারবৎসর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়ার সময়, এবং অগ্রীক পারসীক শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চমশতক)।

এবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নগররাষ্ট্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। স্পার্টা গ্রিক নগররাষ্ট্রের ক্রমবিকাশে একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র নিয়ে স্পার্টার উত্থান হয়েছিল। ডোরীয় বংশীয় স্পার্টানরা ছিল মূলত যোদ্ধা জাতি। 800 খ্রিঃ পূর্বাব্দের মধ্যে তারা লোকেনিয়ার উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টমশতকের শেষার্ধে তারা

উর্বর মাইসেনীয় উপত্যকা নিজ দখলীকৃত করে। অতঃপর তারা আর্গস অধিকার করে। স্থানীয় বাসিন্দারা স্পার্টার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে স্পার্টানরা কঠোরভাবে সেই বিদ্রোহ দমন করে। বিদ্রোহীদের দাসে পরিণত করা হয়। বিদ্রোহ ও যুদ্ধের আশংকায় স্পার্টা একটি যুদ্ধকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থারক্ষেত্রে ভিন্ন পরিবার থেকে নিযুক্ত দুই জন রাজা রাষ্ট্রে সামরিক, ধর্মীয় ও আইনগত বিষয়ে নেতৃত্ব দিতেন। এছাড়া ৩০ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যক্রম, সভা আহ্বান এনব বিচার বিষয়ক দিকগুলি পর্যালোচনা করতেন। এছাড়া যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হত সভা বা এসেম্বলী (Assembly)। Assembly থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হত যারা এফর (Ephor) নামে পরিচিত। এরা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সম্পত্তির বন্টন, নাগরিকদের জীবনযাত্রা প্রভৃতি ছাড়াও দেশের আইনব্যবস্থার ওপর খবরদারি করতে পারতো। এসেম্বলী কাউন্সিলের গৃহীত প্রস্তাব বর্জন করতে পারত। এফরদের পাঁচবছর অন্তর নির্বাচন করা হত। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ ছিল দেশের জনগোষ্ঠীর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। এই ব্যক্তিদের যোগ্যতা হিসাবে প্রচুর ধনশালী হতে হতো এবং সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করতে হত।

প্রাচীন গ্রীসের এটিকা অঞ্চলে এথেন্সের অভিন্ন হয়ে পড়েছিল। কিংবদন্তীর রাজা Theseus এটিকার বিভিন্ন অঞ্চলকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। এটিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা এথেন্সে এসে বসবাস শুরু করেন ও এথেনীয় নামে পরিচিত হন। প্রাচীন এথেন্সের রাজা কড্রস (Cordus) ডোরিয় আক্রমণ প্রতিরোধ কালে রাজ্য রক্ষার্থে নিজ প্রাণ উৎসর্গকৃত করেন। দেবী এথেনাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করার কারণে এই নগররাষ্ট্রের নাম হয় এথেন্স। এটিকার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এথেন্স রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এথেন্স অনেকগুলি পদের উদ্ভব হয়েছিল। প্রথমদিকে পোলেমার্চ নামক (Pole march) নামক প্রধান সেনাপতি পদ সৃষ্টি করা হয়। পরে রাজার বিকল্প একটি পদ সৃষ্টি করা হয় যার নাম ছিল আর্কন, তার মেয়াদ আজীবন, পরে তা দশবছর এবং খ্রীঃপূর্ব ৬৮৩ থেকে ৬৮২ নাগাদ তা কমে হয় একবছর। রাজা বেসিলিয়াস নামে পরিচিত ছিলেন। তাদের আর্কন বেসিলিয়াস বলা হত। তারা প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করতেন।

ক্রমে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোত্রপ্রধানের সংসদ শাসন পরিচালনা করতেন। এই সংসদের নাম ছিল 'এরিয়পেগম (Areopagus), ভূতপূর্ব আর্কনরা এই সংসদের সভ্য হতেন। গ্রামে এই সংসদ রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংস্থায় পরিণত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে ৬৩০ অব্দের মধ্যে থেসমথেটিয়া নামক ৬টি পদের কথা জানা যায়। আর্কন, বেসিলিয়াস এবং পোলেমার্চ এই ৬টি পদ মিলে Nine Archons নামে গ্রীক রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিচিত লাভ করেন।

২.৩ ঃ গ্রীক ধর্মীয় চেতনা

গ্রীকরা বিভিন্ন দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তারা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। প্রতিনগরের একজন করে মুখ্যদেবতা থাকলেও মোটামুটিভাবে গ্রীসের একটি একরকম দেবতা নিচয়, এবং তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল।

গ্রীক কিংবদন্তী অনুসারে, গ্রীক দেবতাদের অনেকগুলি প্রজন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার যে গ্রীকধর্ম প্রাক্ ইন্দো ইউরোপীয় ধর্ম থেকে উদ্ভূত বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন। সেক্ষেত্রে অন্যান্য

ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সাথে গ্রীক দেবতাদের নামগত কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়। যেমন—গ্রীক দেবতা 'Zeus Pater' এর সঙ্গে বৈদিক 'দ্যৌপিতাঃ'। আবার 'Athena'-র সঙ্গে বৈদিক উষার অপর নাম 'অহনা'। সর্বপ্রথম উইলিয়াম জোনস এই বিষয়টি আলোকপাত করেন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সম্ভবত সুপ্রাচীনকালের একটি একই ভাষাগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মানুষেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার ফলে এইরূপ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এরা ইন্দো-ইউরোপীয় বা প্রচলিত কথায় আর্য বলে পরিচিত।

গ্রীক কিংবদন্তীর মধ্যে দেবতাদের পিতৃঘাতী স্বত্বার উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিদেবতা Uranus (আকাশ) এবং Gaia (পৃথিবী)-র সন্তানরূপে জন্ম হয়, প্রথম প্রজন্মের দেবতাদের, যারা Titan নামে পরিচিত, উক্ত Titan দের প্রধান ছিলেন Kronos তিনি প্রথম জীবনে তার পিতার দ্বারা বন্দী ছিলেন ও পরে পিতা Uranus-কে হত্যা করে ক্ষমতায় আসীন হন। অতঃপর Kronos তার সন্তানদের ভক্ষণ করতেন। কনিষ্ঠ পুত্র কোনভাবে রক্ষা পান, এবং পরবর্তীকালে তিনি পিতাকে বাধ্য করেন তাঁর সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীদের পুর্নজীবিত করতে বাধ্য করেন। এরপর সকলে মিলে Kronos এবং Titan দের পাতালে নির্বাসিত করেন। এই কনিষ্ঠ পুত্রই Zeus.

কিংবদন্তীর অনুসারে এরপর থেকে Zeus এর নেতৃত্বে তাঁর ভ্রাতা ভগিনী ও পুত্রকন্যারা অলিম্পিক পর্বত থেকে শাসন শুরু করেন। এই কিংবদন্তীগুলি বিশ্লেষণ করলে একটি স্তরহীন সমাজব্যবস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে দেবতা একত্রভাবে তাদের সাধারণ মানুষদের বিনাশ করেন।

গ্রীক দেবতাদের মধ্যে Zeus ছিলেন দেবরাজ ও আকাশের দেবতা, সমুদ্রের দেবতা ছিলেন Poseidon, পাতালের দেবতা ছিলেন Hades। যুদ্ধপ্রধান গ্রীকজাতি যুদ্ধদেবতা হিসাবে উপাসনা করত Zeus পুত্র Ares-তে Apollo ছিলেন সূর্যদেব, পাশাপাশি তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। Apollo-র যমজ ভগিনী Artemis-এর মধ্যে উপজাতীয় দেবীসত্ত্বা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন কুমারী দেবী। Hera ছিলেন Zeus পত্নী এবং তিনি দেবীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। Zeus কন্যা Athena জ্ঞান ও যুদ্ধ পরিকল্পনার দেবী ছিলেন। গৃহস্থালী ও উনুনের (অধি) দেবী ছিলেন Hestia। গ্রীকদের শিল্পী দেবতা বা নির্মাণ সম্পাদন করতেন Hephasteus। তিনি দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করেন। এছাড়া প্রেমের দেবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন Aphrodite। শস্য ও ফসলেরদেবী বা ভূদেবী রূপে উপাসিতা হতে Demetor। এছাড়া Dionysus ও Hermes ছিলেন উল্লেখ যোগ্য দেবতা। এদের একত্রে Olympian God's বা অলিম্পিক পর্বত নিবাসী দেবতা বলা হত।

গ্রীসের ধর্মীয় আরাধনায় ফল, ফুল শস্য ও মদ্য উৎসর্গীকৃত করে হত। তবে প্রাচীন গ্রীসের ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোনো পুরোহিতন্ত্র গড়ে ওঠেনি। পারিবারিক পূজায় পিতা পৌরোহিত্য করতেন। আর রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মঅনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতেন নগর ম্যাজিস্ট্রেট।

গ্রীসে পুরোহিতেরা যাবতীয় কর্তৃক রাষ্ট্রের হাতেই সংরক্ষিত ছিল। রাষ্ট্র নিয়োজিত কর্মকর্তারা মন্দিরের সম্পত্তি, অর্থ, দাস প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করত। মন্দিরের পুরোহিত হিসাবে কোন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হত। প্রাচীন গ্রীসে পারিবারিক দেবতা, সাধারণ নাগরিকের দেবতা ও রাষ্ট্রীয় দেবতাদের আলাদা সত্ত্বা ছিল।

নাগরিকদের দেবতা আরাধনার জন্য চমৎকার মন্দির তৈরি করা হত। মন্দিরের মধ্যে থাকতো দেবমূর্তি। উৎসবের সময় এ সমস্ত দেবমূর্তিকে পরিচ্ছন্ন করে কাপড় পরানো হতো। ধর্মীয় আরাধনা হিসাবে ধর্ম, শোভাযাত্রা, প্রার্থনা, উৎসর্গ প্রভৃতি করা হত।

রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত গ্রীসে সাংস্কৃতিক সমন্বয় বর্তমান ছিল। রাজাদের শাসনকালে (১২০০-৭৫০ খ্রিঃ) ডেলফিতে সমগ্র জাতির দেবতা Apollo-র আরাধনা শুরু হয়। ডেলফির এই দেবতাপূজা পরিচালনায় সকল নগররাষ্ট্র অংশ নিত। এই ঘটনা গ্রীকদের সংস্কৃতিগত ঐক্যের পথ সুগম করেছিল।

দর্শন

ধর্মের পাশাপাশি গ্রীক চিন্তাবিদরা মানুষ, সমাজ ও ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তাকরতে গিয়ে একটি সুচিন্তিত সমৃদ্ধ দর্শন উপহারদেন। বিভিন্ন দার্শনিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কিত কুসংস্কার ও কিংবদন্তী আশ্রিত ব্যাখ্যার পরিবর্তে বস্তুনিষ্ঠ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পৃথিবীর সৃষ্টির উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকে হোমারের মহাকাব্যে এইরূপ অভিমত পাওয়া যায় যে, দেবতারা মানবিক গুণ সম্পন্ন এবং তারা জগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দায়ী। বৈজ্ঞানিক ব্যাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন গ্রীকদার্শনিক থালেস (Thales)। তিনি সূর্যগ্রহণকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে জলকে সৃষ্টির উৎস বলে মনে করতেন।

গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সফিস্ট গণ। তারা মনে করতেন কোন বক্তব্যই চিরসত্য নয়। তারা বর্ণিত বক্তব্যকে প্রমাণ করতে বলতেন। এইভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রচলন করেন তারা। সফিস্ট চিন্তার অনুসারী অন্যতম দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস। তিনি মনে করতেন প্রতিটি বিষয়ই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার করে নিতে হবে। তিনি মনে করতেন সম্মানিত আসন, জ্ঞানী ব্যক্তিদেরই প্রদান করা উচিত। পরিবার বা রাষ্ট্রে বিধান নয়, নিজের বুদ্ধিও বিবেচনায় যা সঠিক তাই করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। ৩৯৯ খ্রীঃপূর্বাব্দে নগররাষ্ট্রে পূজ্য দেবতাদের অস্বীকার ও তরুণদের বিপদগামী (যুক্তিবাদী) করে তোলার অপরাধে শাসক গোষ্ঠীর দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সক্রেটিসের একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন প্লেটো। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Republic'-এর বিষয়াবলীতে শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন রূপ যেমন রাজতন্ত্র, অভিজাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন কোন দেশের নেতৃত্বে দার্শনিকদের থাকা খুব জরুরী, তারাই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি দীক্ষাগুরু সক্রেটিসের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করে ছিলেন। এইভাবে গ্রীসে একটি দর্শন চিন্তাধারা গড়ে ওঠে।

৩ ঃ প্রাচীন গ্রীসের সমাজ কাঠামো (Unit-9)

৩.১ ঃসামাজিক ব্যবস্থা

সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত জীবনচর্চাই হল ইতিহাস। তাই প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস অধ্যয়ন করার সময় প্রাচীন গ্রীসের সমাজব্যবস্থা, তার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস আঞ্চলিক প্রভেদ, প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা

একান্তভাবে প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে গ্রীকরাষ্ট্র অনেকগুলি পৃথক পৃথক নগররাষ্ট্র ছিল। নগররাষ্ট্রগুলির পরিস্থিতি অনুসারে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালিত হত।

এথেন্সে প্রাথমিকভাবে সমাজ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। যথা— অভিজাতবর্গ (Euprtridae), সম্পন্নকৃষক (Georgi), এবং বণিক (Deminurgi) । এছাড়া কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমজীবি গোষ্ঠী ছিল, যারা দাস না হয়েও নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই সময় জন্ম সূত্রের অভিজাতবর্গ নির্ধারিত হত। কিন্তু খ্রীঃপূর্ব সপ্তম শতক থেকে এই ধারণায় বদল দেখা যায়। আর্থিক সমৃদ্ধির ওপর ভিত্তিকরে নাগরিকদের তিনভাগে ভাগ করা হতে থাকে। যথা— (i) সমৃদ্ধতম শ্রেণী (Pentacosimedimini) (ii) সমৃদ্ধ শ্রেণী (Hippes) (iii) অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ শ্রেণী (Zeugiae)

এছাড়া একটি চতুর্থত শ্রেনীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এদের বলা হত থাটেস (Thates)। নাগরিক হলেও এদের পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হত না। জমির মালিক হলেও এদের জমির এলাকা ও ফসলের দাম কমছিল। সালন এদের বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করেছিলেন।

চূড়ান্তভাবে বা সাধারণভাবে যদি গ্রীসের সমাজকে দেখা যায়, তাহলে একে সাধারণত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব।

(1) **পুরুষ নাগরিক ঃ** এরা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল (i) ভূম্যাধিকারী (Aristoi) (ii) দরিদ্র চাষী (Periokoi) এবং (iii) মধ্যবিত্ত বা (শিল্পী ও বণিক)

(2) **আধা দাস শ্রমিক ঃ** এই প্রসঙ্গে স্পার্টায় helot-দের কথা বলা যায়।

(3) **নারী ঃ** সমস্ত শ্রেণীর নারীরাই এর অন্তর্ভূক্ত কিন্তু নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন তারা।

(4) **শিশু ঃ** ১৮ বছরের নিচের শিশুরা এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(5) **দাস ঃ** 'douloi' গণ যারা নাগরিক ও সামরিক দায়িত্ব পালন করত।

(6) **বিদেশী অনাবাসী** (xenoi) রা বিদেশী নাগরিক (metoikoi) যারা নাগরিকদের তুলনায় নিম্নতর ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অর্থবানদের সামাজিক অবস্থা দৃঢ়তর ছিল না। পাশাপাশি দরিদ্র কৃষক ও দাসদের অবস্থা ছিল সঙ্গিন। এই বিষয়টির মধ্যে চলে আসে স্পার্টার সমাজের দুই শ্রেণী helot ও periokoi এর অবস্থানের প্রসঙ্গ যেটি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

গ্রীকসমাজে অভিজাতদের অবস্থান ছিল সর্বোচ্চ। এরাই ছিল ভূসম্পদের মালিক। প্রশাসনিক উচ্চপদে এদের অবস্থান। এরা সাধারণ ও সামরিক উভয়শিক্ষায় পারদর্শী ছিল। তবে এথেন্সে অনেক সময় সাধারণ নাগরিকদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হত। বণিক শ্রেণী ছিল ধনবান গ্রিসের ভূমি অনুর্বর হওয়ায় খাদ্যশস্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিশর ও মেসোপটেমিয়া থেকে আমদানী করা হত। বণিকরা এইসব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। অন্যদিকে কৃষিদ্রব্য কম থাকার ফলে বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার্থে শিল্পদ্রব্য গড়ে ওঠে। বিভিন্ন খনি, জাহাজ, তৈরী, মদ এবং মৃৎপাত্র নির্মাণে শ্রমিকদের দক্ষতা ছিল সবচেয়ে বেশি। মৃৎপাত্র নির্মাণ অত্যন্ত উৎকৃষ্টতা লাভ করে।

তাদের তৈরী সাধারণপাত্র, তৈলপাত্র, পানপাত্র প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। এগুলি প্রাচীন গ্রীসে বস্তুগত সংস্কৃতির উৎকর্ষতার পরিচয় বহন করে। কৃষিজীবী সম্প্রদায় গম ও বার্লি উৎপাদন করত। এছাড়া প্রচুর পীচ ও মসুর ডাল উৎপাদন করত। অন্য ফসলের মধ্যে ছিল জলপাই ও ডুমুর। এছাড়া গবাদি পশুপালন করা হত। গ্রীসের কৃষিজীবী সম্প্রদায় ছিল মুক্তনাগরিক এবং এরা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করত। অন্যদিকে ভূমিদাসরা ছিল মালিকদের অধীনস্থ। স্পার্টা ও পেলোপনেসীয় অঞ্চলে অভিজাতরা প্রচুর ভূমিদাস রাখত। এরা জীবনের বিনিময়ে প্রভুর জমিতে শ্রম দিত। এই ভূমিদাসদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। গ্রীক সমাজে এদের অবস্থান ছিল অসহায়। অনেকে ঋণ শোধ করতে না পেরে ভূমিদাসে পরিণত হন। ৫৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সলোন তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছিলেন। গ্রীক সমাজ ক্রীতদাস ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কায়িক শ্রমের বেশিরভাগ তাদের দিয়ে করান হত। সমাজে তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

শিশুদের অল্পবয়স থেকে কঠোর নিয়মে রাখা হত। স্পার্টার সমাজ ব্যবস্থায় সকল শিশুর বাঁচার অধিকার ছিল না। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রকে শ্রম দিতে পারবে এমন শিশুকেই জীবিত রাখা হত। বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নিলে বা কোন শিশু অসুস্থ বা দুর্বল প্রতিপন্ন হলে তাকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা করার বিধান ছিল। প্রত্যেক শিশুকে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার জন্য তাদের পিতা বাধ্য ছিলেন। বালকদের সাতবৎসর থেকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হত। তাদের পর কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা আরোপ করা হত। সহ্যশক্তি বাড়াতে তাদের স্বল্প পরিমাণ খাদ্য দেওয়া হত। সারা শরীরে নির্মম ভাবে চাবুক মারা হত। এইভাবে তাদের যোদ্ধা হিসাবে গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল। এইভাবে স্পার্টার সমাজে একটি রাষ্ট্রেনিয়ন্ত্রণ যোদ্ধা শ্রেণী গড়ে তোলা হয়।

অন্যদিকে এথেন্সে পূর্ববর্ণিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এথেন্সের কাইলন, অন্যএকটি নগররাষ্ট্র মোগরার সাহায্যে ক্ষমতা দখলে চেষ্টা করেন। অতঃপর সেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে ড্রাকো (৬২১ খ্রিষ্টপূঃ) একটি সামাজিক বিধান সংকলন করেন। তবে কঠোর ও নির্দয় আইন ছাড়া এই ব্যবস্থা দেশের নাগরিকদের দুর্দশা মেটাতে পারেনি। কৃষকরা ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় গ্রীসের সমাজ সংস্কার করেছিলেন সলোন। তিনি জমিদারির সীমা নির্দিষ্ট করা কৃষকদের সুবিধা প্রদানের চেষ্টা করেন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে বউল নামে নতুন নির্বাহী সংসদ গঠন করে, প্রতিজাতি থেকে একশ জন সদস্য মিলে চারশত জন নির্বাচন করা হত। এই চারজাতি, যারা মিলে এটিকা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সালোনের পর পিসিশট্রেটস এবং তারপর ক্লিমস্থেনিস (৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) এথেন্সের সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যান। ক্লিসথেনিস প্রাচীন গোষ্ঠীবর্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র নাগরিকদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্যে তিনি চারজাতির বদলে এথেনীয়দের দশ জাতিতে বিভক্ত করেন। বউলের সদস্য সংখ্যা ৪০০ থেকে বাড়িয়ে ৫০০ করা হয়। তিনি বছরকে দশভাগে ভাগ করেন। সেই প্রত্যেকটি সময়ে সভ্যদের মধ্যে ৫০ জন বউলকে পরিচালনার ভার পেতেন। এই রকম দশটি কমিটি গঠিত হয়, যেগুলি প্রাইটেনিস নামে পরিচিত ছিল। তবে তখনো পোলমার্চের কর্তৃত্ব স্বীকৃত ছিল।

এইভাবে দেখা যায় গ্রীসের সামাজিক ব্যবস্থা অনেকটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সামাজিক বিন্যাস্কে অনেকটা বদলে দিত।

৩.২ ঃ হেলট ও পেরিকোইসদের অবস্থান

প্রাচীন গ্রীসের সমাজ কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হল, সমাজ কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা। এই অংশ ছিল সর্বাধিক অবহেলিত নগররাষ্ট্র হিসাবে রাজ্যবিস্তারকালে স্পার্টা Loconia (ল্যাকোনিয়া) এবং Messenia (মেসেনিয়া) অধিকার করলে সেই অংশের আদি অধিবাসীদের Helot বলা হত।

যদিও তাদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ক্রিটিয়াস (Critias) এর মতে তারা সম্পূর্ণ রূপে দাস। অন্যদিকে Pollux এর মতে তারা মুক্ত নাগরিক ও দাসদের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত। তারা সাধারণভাবে ছিল ভূমিতে আবদ্ধ। মূলত কৃষিকাজে যুক্ত ছিল। হেরোডোটাসের মতে ৪৭৯ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে প্ল্যাটাইয়া যুদ্ধের সময় হেলট জনসংখ্যা স্পার্টানদের সাতগুণ ছিল।

যদিও হেলটগণ কৃষিতে যুক্ত থেকে স্পার্টান অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ ছিল, তাসত্ত্বেও স্পার্টানরা হেলটদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক মনে করতেন। স্পার্টানরা হেলটদের অবদমিত করে রাখতেন, এবং শরৎকালে হেলটদের সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, হত্যালীলা সংঘটিত করতেন অ্যারিস্টটল হেলটদের স্পার্টার চিরশত্রু রূপে চিহ্নিত করেন। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাস ও ভয় তাদের মধ্যে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ করত। ঐতিহ্য অনুসারে হেলটদের আক্রমণে ভয়ে স্পার্টারা সর্বদা তাদের বর্শা এবং বর্ম সর্বদা সঙ্গে নিয়ে থাকতেন। প্লুটার্কের বর্ণনা অনুসারে স্পার্টানরা হেলটদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় আচরণ করতেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক Prience এর মতে হেলটদের কুকুরের চামড়ার তৈরী পোশাক পড়তে বাধ্য করা হত। খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হত সীমিত।

তবে কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক ঐতিহাসিকরা হেলটদের অবস্থানের পুনর্মূল্যায়ণের কথা বলেছেন। কুকুরের চামড়ার পরিবর্তে তারা মনে করেন চর্মজাত বস্ত্র হেলটদের পরিধান করতে হত। ছিল দরিদ্র কৃষকদের ব্যবহার্য পোশাক। আবার হেলটদের খাদ্য সীমিত ছিল, এই ধারনাও সম্ভবত ঠিক নয়, কারণ তাদের কায়িক পরিশ্রমের পরিমাণ ছিল প্রচুর। ঐতিহাসিক J. Ducat এর মতে হেলটদের প্রতি স্পার্টানদের আচরণ অনেকটাই আদর্শগত সংঘাত ছিল। যেখানে হেলটদের বাধ্য করা হত, নিজেদের মানসিকভাবে হেয়রূপে মনে করতে।

অনেক সময় হেলটদের নিযুক্ত করা হত, নাগরিকদের ব্যক্তিগত কাজ সম্পাদন করতে। এছাড়া স্পার্টানদের ব্যক্তিগত Kteroi তে তাদের কাজ করতে হত। আবার অনেক helot স্পার্টানদের শিক্ষালাভের সময় তাদের সাথে থাকতেন। আবার কিছু হেলটকে শিল্পী হিসাবেও নিযুক্ত করা হত। স্পার্টানদের বিস্তৃত জমিতে হিলটরা বাস করত, এবং সেই জমিচাষ করে উৎপন্ন ফসলের একাংশ মালিককে দিত। এ্যানডরুজের মতে সব হিলটদের অবস্থা আর্থিক দিক দিয়ে খারাপ ছিল না। কেননা উদ্বৃত্ত ফসলের একটা অংশ এরা নিজেদের জন্য রাখত। এ্যানডরুস এদের সম্পূর্ণ রকমের ক্রীতদাস বলেছেন। প্রাচীন লেখকদের বর্ণনা সেখানে তাদের ক্রীতদাসও স্বাধীনদের মধ্যবর্তী বলেছেন তার অর্থ হল এই যে হিলটদের কেবল ইচ্ছামত ক্রয় বিক্রয় করা যেত না। তারা ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ক্রিটিয়াসের মতে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলানায় স্পার্টায় স্বাধীনরা ছিল বেশী স্বাধীন এবং ক্রীতদাসরা ছিল পূর্ণতরভাবে ক্রীতদাস। আবার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হিলটরা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের বলা হত নূতন নাগরিক। এরা অন্য হিলটদের ঘৃণা করত। প্রয়োজনে সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত হিলটদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে

ব্যবহার করা হত। এই হিলটদের সংখ্যা নাগরিকদের তুলনায় কম ছিল না। আবার স্পার্টান পিতাও হিলট মাতার সন্তান ছিল, নাগরিক আর না হিলট ।

পেরিকোইস ঃ পেরিকোইসরা ছিল স্পার্টার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা ছিল ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে পরাধীন। স্পার্টান নাগরিকদের সাথে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না। তাদের ওপর ছিল অতিরিক্ত করভার। উইল ডুরানটের মতে, ভৌগোলিক দিক দিয়ে তারা স্পার্টানদের পরিবেষ্টিত করেছিল। সামাজিক দিক দিয়ে তারা ছিল স্পার্টান অ হিলটদের মধ্যস্থলে। তারা ডোরিয় ভাষা ব্যবহার করত। তাই জাতিগতভাবে ল্যাকি মিডিয়ান বলতে স্পার্টান অ-পেরিওকোইস উভয়দেরই বোঝাত। সম্ভবত প্রথমে অল্পসংখ্যক ডোরিয়ান স্পার্টায় বসতি স্থাপন করেন পড়ে সেখান থেকে তাদের অধিকার প্রসারিত হয়, সেই সময় পেরিওকোইসদের তাদের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল। এরা ছোট শহর ও গ্রামে বাস করত। স্পাটানদের তত্ত্বাবধানে তারা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে তারা সাধারণ গ্রীকদের মত শান্ত জীবন যাপন করত। স্থানীয় বিষয় পরিচালনার ভার তাদের ওপর ছিল। ফিনলের মতে, পেরিওকোইস সম্প্রদায়গুলি ছিল অসমাপ্ত নোলিস। তারা হিলটদের মত কখনও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেনি। শান্তি, সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগের জন্য তারা স্পার্টানদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে স্পার্টানদের জন্য প্রয়োজনীয় বাণিজ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য তারা উৎপাদন ব্যবস্থা তাদের হাতে ছিল।

এইভাবে স্পার্টায় হেলট ও পেরিওকোইস সম্প্রদায় তাদের সামাজিক অবস্থান বজায় রেখেছিল।

৩.৩ ঃ নারীর স্থান

যেকোন সমাজের অধ্যয়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল নারীর স্থান। প্রাচীন গ্রীসে নারীদের অধিকার পুরুষদের তুলনায় সংকুচিত ছিল। তারা ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার বা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ লাভের থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীর অবস্থান ছিল গৃহস্থলীতে এবং তার জীবনের লক্ষ্য ছিল শিশুদের লালন পালন করা। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এ প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য সূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে এথেন্সের পুরুষ লেখকদের থেকে প্রাপ্ত। সকল নগররাষ্ট্রের সামাজিক চরিত্র সর্বদা এরকম ছিলনা। স্পার্টায় নারীদের কিছুটা ভিন্নভাবে দেখা হত। তাদের পুরুষদের মতই শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হত। তারা ভূমির অধিকারী ছিলেন এবং মদ্যপানের ও অধিকার তাদের ছিল।

এছাড়াও আরো কিছু ধরনের নারীদের কথা জানতে পারা যায়, যাদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য খুবই সীমিত। এরা মূলত বিভিন্নধরনের কার্যকলাপে যুক্ত থাকতেন। এছাড়া বেশকিছু ব্যতিক্রমী নারী যেমন লেবসের সাপ্পো কবি হিসাবে, সাইরেনের অ্যারেট দার্শনিক হিসাবে, যোদ্ধা হিসাবে স্পার্টার গোরগো (Gorgo) এবং এথেন্সের Aspasda এবং চিকিৎসক হিসাবে, এথেন্সের Agnodica উজ্জ্বল ব্যতিক্রমের নমুনা রেখেছিলেন।

অন্য অনেক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মতো শিশুকন্যাদের পরিত্যক্ত হবার সম্ভাবনা গ্রীসে অনেক উজ্জ্বল ছিল। নাগরিকদের শিশুদের পঠন, লিখন, গণিতের শিক্ষা দেওআ হত। কন্যাদেরও অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হলেও নৃত্য, সঙ্গীত ও জিমন্যাস্টিকের ওপর জোর দেওয়া হত, যাতে তারা নাগরিক উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত তৈরী করা।

বিবাহযোগ্য নারীকে বিবাহদানের বিষয়টি তার পিতা পরিচালনা করতেন। নারীর জন্য স্বামী নির্বাচন করতেন পিতা এবং হবু জামাতার কাছ থেকে কন্যাপণ গ্রহণ করতেন। যদি কন্যা পিতৃহীন হত, তাহলে অন্যকোন অভিভাবক পিতার দায়িত্ব পালন করতেন। বিবাহের বিধান ছিল, গ্রীক সমাজে পূর্ণবয়স্কনারীর অবিবাহিত থাকার অধিকার ছিল না।

বিবাহিত গৃহী নারীদের মূলকাজ ছিল গার্হস্থ্য কার্যকলাপ সম্পাদন করাও সন্তানদের প্রতিপালন করা। যদি তাদের আর্থিকঅবস্থা সম্পন্ন হত, তাহলে তারা ক্রীতদাসদের সহায়তা পেত। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষদের সাথে যোগাযোগকে সুদৃষ্টিতে দেখা হত না। নারীদের উলের কাজে ও বুননের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হত। তারা আত্মীয় স্বজনের কাছে যেতে পারতেন। গৃহ থেকে বাইরে যাবার স্বাধীনতা তাদের ছিল। পাশাপাশি নাগরিকদের উৎসবে ও ধর্মীয় কার্যকলাপ সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তবে নাগরিকদের উৎসবে ও ধর্মীয় কার্যকলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তবে নাগরিক রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি কোন নারীর নাম উচ্চারণ জনসমক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

আইনি দৃষ্টিতে বিবাহিত নারী স্বামীর অধীনস্থ ছিলেন। অ্যারিস্টটলের মতে নারীর নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে। তবে বাস্তব জীবনে পরিবারে নারী পুরুষ সমতার জীবন যাপন করতেন। অন্যদিকে নারীকে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হলেও পুরুষরা বহুনারীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারতেন। পরিবারের মর্যাদা হানিকারণ নারীকে সামাজিক উৎসব থেকে বহিষ্কার করা যেত।

নারীর যদি ভ্রাতা জীবিত থাকতেন তাহলে পিতার সম্পত্তির কোন অংশ তিনি পেতেন না। তিনি যদি একমাত্র সন্তান হতেন তাহলে তার স্বামী বা অভিভাবক সেই সম্পত্তির অধিকার পেত। এইসব ক্ষেত্রে কোন অবিবাহিত নারী কোন সম্পত্তির অধিকার পেলে তাকে কোন পুরুষ আত্মীয়কে বিবাহ করতে হত। তবে উপহার হিসাবে প্রাপ্ত গয়না ও বস্ত্র তার নিজস্ব সম্পত্তি রূপে গণ্য হত।

নাগরিক শ্রেণী ব্যতিরেকে ও অন্য অনাগরিক শ্রেণীদের অবস্থান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । দাসী হিসাবে তারা সবধরনের কাজকের্ম লিপ্ত থাকতো। তারা দোকানের কাজ করত। এই সমাজে গণিকাদের বিষয়ে অনেকের তথ্য পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলায় পারদর্শী ছিলেন। এছাড়া বেশ কিছু নারী পূজারিনীর কথা পাওয়া যায়। মূলত, এরা Demeter, Aphredite,ও Dionysos এর উপাসক ছিলেন। এরা সম্ভবত কুমারী ছিলেন। Thesmophoria fertility উৎসবে কেবল নারীদের প্রবেশধিকার ছিল। এথেন্সে প্রতিবছর চারজন নারীকে নির্বাচন করা হত এথেনার উপাসনা করার জন্য। অন্যদিকে ডেলফির Oracle ছিলেন একজন বয়স্কা নারী।

এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীন গ্রিসে নারী পুরুষের অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরা বেশি অধিকার ভোগ করতেন, সেই তুলনায় নারীদের অধিকার ছিল সীমিত। তবে স্পার্টার মতো কিছু ব্যতিক্রম ও আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

৩.৪ ঃ গ্রীক-পারসিক সংঘাত

গ্রীক সভ্যতার বিকাশমান পর্যায়ের পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী সভ্যতা পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে গ্রীক সভ্যতার সংঘাতের

পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই সময়ে পারস্য বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগ্রাস করে গ্রীসের উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছিল। পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের নেতৃত্বে এশিয়ামাইনরের গ্রীক উপনিবেশ আইওনীয়া পারসীকদের হস্তগত হয়েছিল। অতঃপর দূরবর্তী রাজধানী সুসা থেকে এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন এই বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে এই স্থানের নিয়ন্ত্রণের ভার তিনি প্রাদেশিক শাসকদের অর্পণ করেন। আইওনীয়া ও লিডীয়াকে একজন স্যাট্রাপের অধীনে শাসন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই শাসক ছিলেন গ্রীক। এরা পারস্যের প্রতি অনুগত্য থাকতেন। অতঃপর শক্তিবৃদ্ধি করে দারায়ুস অধিকার করেন থ্রেস ও ম্যাসিডোন। এটি ছিল পারস্য কর্তৃক গ্রিস আক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ।

ইতিমধ্যে এথেন্সের স্বৈরশাসক হিপিয়াস জনগণ কর্তৃক ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়ে স্বীয় হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের মানসে পারসীক শাসকদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সার্দিসের স্যাট্রাপ Artaphernes-এর সাহায্যে প্রার্থনা করলে তিনি এথেনীয়দের নির্দেশদেন হিপিয়াসকে সসম্মানের ফিরিয়ে নেওয়া জন্য। অবশেষে এথেনীয়দের সাথে পারসিকদের দ্বন্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ছিল ভিন্ন। ন্যাকসস দ্বীপে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটায় পরাধীন গ্রীকরা পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ এথেন্স জড়িয়ে পড়ে। প্রথমে নগররাষ্ট্র থেকে স্বৈরাচারীরা বিতাড়িত হতে থাকেন, অতঃপর পারস্যের বিরুদ্ধে নগররাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান করা হত। এই আহ্বানে এগিয়ে আসে এথেন্স ও ইরিত্রিয়া।

বিদ্রোহী সার্দিস নগরী অধিকার করার পর বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দক্ষিণ দিকে ক্যারিয়া থেকে পার্সীয়দের বিতাড়িত করা হয়। কিন্তু প্রাথমিক আঘাত কিছুটা আত্মস্থ করে পার্সীয়রা বেশ কিছু অঞ্চল পুনার অধিকার করে। গ্রীকদের প্রতিরোধের মুখেও দারায়ুসের সেনারা মাইলেটা অঞ্চল অধিকার করে। মূলত গ্রীকদের সম্মিলিত শক্তি ছিল বিশৃঙ্খল, ফলে তারা পরাজিত হয়। এভাবে সমস্ত দ্বীপ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এইভাবে বিদ্রোহ অবদমিত হলে, পারস্যরাজ দারায়ুস ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের পর পুনরায় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। একই সাথে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তিপ্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে পারস্যের নৌবহর অগ্রসর হয়ে থ্যাসোস, থ্রেম, ও ম্যাসিডনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দারায়ুসের মূল উদ্দেশ্য ছিল এথেন্স ও ইনিরনিয়াকে শাস্তি দেওয়া। এই দুই রাষ্ট্র বিদ্রোহীদের সমর্থন করে সার্টিক নগরী ধ্বংস করেছিল। এই সময় বিতাড়িত হিপিয়াস দারায়ুসকে প্ররোচিত করতে থাকে এথেন্স আক্রমণ করার জন্য।

পারসিকরা ঈজিয়ান সাগর অতিক্রম করে গ্রিস আক্রমণের পরিকল্পনা নেয়। যেসব নগররাষ্ট্র পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, তাদের আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ মাটি ও জল পাঠাতে বলা হয়। এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পারস্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ডেটিস ও দারায়ুসের ভ্রাতুষ্পুত্র আটাফার্নেস। এর সাথে যুক্ত হন হিপিয়াস। পারস্য ৬০০ জাহাজের একটি বিরাট নৌবহর গড়ে তোলে। একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী নিয়ে দারায়ুস এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিভিন্ন দ্বীপ জয় করে তারা ইরিত্রিয়াতে উপস্থিত হয়, সাতদিন প্রতিরোধের পর কিছু নগরবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় এই নগররাষ্ট্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর দ্রুত পার্সীয় দ্রুত এথেন্সের দিকে অগ্রসর হয়, তারা ম্যারাথন উপসাগরে ঘাঁটি স্থাপন করে। এথেনীয়রা শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা ও নগররক্ষার্থে প্রতিবেশী স্পার্টার কাছে সাহায্যের আবেদন করে, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্পার্টার পূর্ণিমা অতিক্রান্ত না হলে আক্রমণে অস্বীকার করে। প্লেটিয়াবাসীদের সাহায্য নিয়ে মাত্র

৯০ টি যুদ্ধজাহাজও আট হাজার সেনা নিয়ে তারা প্রবল পরাক্রান্ত পারসীক শক্তির মুখোমুখি হয়। এথেন্সের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ম্যারাথন প্রান্তরে শত্রুসেনাকে আক্রমণের কথা বলা হয়।

৪৯০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সেপ্টেম্বরে ম্যারাথনে গ্রীক পার্সীয় চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়, শক্তিরদিক থেকে অনেক পিছিয়ে থাকলেও দেশাত্মবোধকের উদ্দীপনা ও সফল যুদ্ধ কৌশলের প্রয়োগের ফলে এথেন্স জয় ছিনিয়ে আনে। ১৯২ জন গ্রীক সৈন্যের মৃত্যু হলেও পারসীক সৈন্যরা নিহত হয় ছয় হাজার চারশত জন। পারসিকরা এই অপ্রত্যাশিত পরাজয় মেনে নিতে পারেনি।

দারায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম জারক্সেস (Xeroxes-I) তাঁর বাহিনী নিয়ে গ্রীসের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান। এদিকে সম্ভাব্য পারসিক আক্রমণ মোকাবিলার জন্য গ্রীকরা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি পুনরায় অধিকার করতে শুরু করে। তাঁর অধীনে ছিল ষাট হাজার সৈন্য। ৪৮০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ জুলাই মাসে পার্সীয় স্থলবাহিনী থার্মোপলীতে এসে পৌঁছায়। অন্যদিকে তাদের নৌবাহিনী ক্যাসথানীয়াতে এবং সেপিয়াস অন্তরীপের মধ্যে উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রবল ঝড়ের মধ্যে তাদের উল্লেখযোগ্য জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। থার্মোপলিতেও ম্যারাথনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অতঃপর Xeroxes প্রতিশোধের মানসে এথেন্সের দিকে অগ্রসর হলে এথেন্সের দূর্গরক্ষী বাহিনী প্রবল প্রতিরোধ করেন। অন্যদিকে গ্রীকবাহিনী সামামিস এ সমবেত হয়। এই অঞ্চলে গ্রীকনৌবহর পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করে, অতঃপর ২০সেপ্টেম্বর সংঘটিত সালামিসর ঘোরতর নৌযুদ্ধ পার্সীয়দের চূড়ান্ত বিপর্যয় সংঘটিত হয়।

গ্রীক-পারসিক যুদ্ধের অন্তিম পর্ব দেখা যায় আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে পারসীক সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে । ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নেতৃত্বে গ্রীসে ঐক্যসাধন হয়। তিনি নগর রাষ্ট্রদের নিয়ে হেলেনীয় সংঘ গঠন করেন, কিন্তু ৩৩৮ খ্রীঃ পূর্বে তিনি গুপ্ত ঘাতক কর্তৃক নিহত হন।

অতঃপর আলেকজান্ডার পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৩৩৩ খ্রীঃ পূর্বে তিনি পার্সীয়দের পরাস্ত করে তাদের অধিভূক্ত এশিয়ামাইনর ও মিশরের অংশ দখল করে নেন। আরবেলার যুদ্ধে ৩৩১ খ্রীঃ পূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুস পরাস্ত হন। ৩৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে তৃতীয় দারায়ুস তাঁর নিজ লোকের হাতে নিহত হলে আলেকজান্ডার বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব প্রাপ্তহন এবং গ্রীকের সঙ্গে পারসীরদের অবলুপ্ত হয়।

৪ ঃ গ্রীকসাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি (Unit-9)

কোন প্রাচীন সভ্যতা ও তার সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য আমাদের সমকালীন সাহিত্যিক তথ্য সূত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। সমকালীন সাহিত্যসূত্র যেহেতু সেই সময়ের মানুষদের রচনা সেই কারণে এই তথ্য সূত্রগুলিতে সমকালীন সমাজের অনেকাংশের প্রতিফলন পাওয়া যায়। গ্রীকসাহিত্যকে বর্তমান আলোচনায় আমরা দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব, যথা (১) ধ্রুপদী কাব্য-সাহিত্য-নাটক এবং (২) গ্রীক ইতিহাস চর্চা।

৪.১.১ গ্রীক কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায় যে গ্রীকরা তাদের ঐতিহ্যময় বীরদের জীবনকাহিনীর প্রতিশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাদের প্রাথমিক কাব্যসাহিত্যে বীরগাথা মূলক সাহিত্যের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক সাহিত্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ্য কবি হলেন হোমার। তার বিখ্যাত কাব্য ছিল খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতকে রচিত মহাকাব্য ইলিয়ড ও ওডিসি।

এইকাব্যসমুদয়ে এশিয়া মাইনরে ট্রয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। ট্রয়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে গিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দেলিপ্ত গ্রীকরা যে স্বজাত্যবোধের পরিচয় দিয়েছিল, তার প্রতিফলন হোমারের লেখায় পাওয়া যায়।

গ্রীক জীবন যাত্রায় জটিলতা বৃদ্ধি পেলে তা কাব্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। এযুগের কবি হিসাবে প্রথমেই হেসিয়ডের (Hesiod ৭৫ খ্রীঃপূর্ব)। তার কবিতায় কৃষকদের জীবনযাত্রার চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছিল। হোমারের রচনায় যেমন কিংবদন্তী ও দৈব নির্ভর উপাদান অনেক বেশি ছিল হেসিয়ডের রচনায় তার পরিমাণ অনেক কমে আসে। তার পড়ে কাব্য জগতে উল্লেখযোগ্য নাম হল গীতিকবি সাপজো ও কবি পিন্তার। গীতিকাব্যে গ্রীক জনগণের জীবনযাত্রা তারা প্রতিফলিত করেছেন।

নাট্য সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এসকাইলাসের রচিত দুটি নাটক প্রমেথুয়াস বাউন্ত ও আগামেমনন। নাটকে সাধারণত গ্রীক ধর্ম ও সাধারণ জীবনের প্রতিফলন ঘটে। উন্মুক্ত মার্কে ও প্রায় বৃত্তাকার মঞ্চে নাট্য অভিনয় করা হত। গ্রীক জগতে সৃজনশীল নাট্যকার ছিলেন সফোক্লিস, তিনি প্রায় একশতর বেশী নাটক রচনা করেন। দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল এন্টিগনে (Antigone) ও ইলেকট্রা (Electra) ।

এইভাবে দেখা যায় গ্রীক সৃজনশীল সাহিত্য গ্রীক সমাজ ব্যবস্থার সুন্দর চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল।

৪.২ ঃ অলিম্পিকস

ক্রীড়া জগতে অলিম্পিকস অত্যন্ত প্রাচীন ও সুবিধিত ক্রিড়া প্রতিযোগিতা। প্রাচীন গ্রীসে দেবতা জিউসের সম্মানার্থে এক ধরনের উৎসব আয়োজিত হত। পরবর্তীকালে দৌড়, জ্যাভলিন এবং কুস্তিপ্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছিল। এই অলিম্পিকস প্রতিযোগিতা বিভিন্ন নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবস্থা ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে প্রথম অলিম্পিকস এর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৭৭৬ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে। রোমান সাম্রাজ্যে ৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট থিওডোসি কর্তৃক বাধা প্রদত্ত হবার পূর্বে প্রতি চারবছর অন্তর ইহা অনুষ্ঠিত হত।

এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গ্রীসের অভ্যন্তরীণ কূটনীতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। অলিম্পক চুক্তি অনুসারে, এই সময় বিভিন্ন নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিনাবাধায় যেতে পারতেন। এই ক্রীড়া পইতযোগিতা গুলি নগররাষ্ট্রদের কাছে নিজেদের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণের চাবিকাঠি রূপে প্রতিভাত হত। এইসময় নগররাষ্ট্রদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ থাকতে এই উৎসব কেবলমাত্র অলিম্পিয়াতেই অনুষ্ঠিত হত। বিজয়ীকে অলিভ পাতার মানপত্র এবং মুকুট উপহার দেওয়া হত।

এই প্রতিযোগীতাতে কেবল গ্রীসের অধিবাসী যাদের পূর্বপুরুষ গ্রীক তাদেরই অংশ গ্রহণ করতে হত। গ্রীসের প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও মত পার্থক্যের জন্য যে রাজনৈতিক অনৈক্য দেখা দিয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এক নগররাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতার বদলে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলতে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

৫ ঃ উপসংহার

প্রাচীনকালে গ্রীসে একটি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে তোলে। সেই সভ্যতার প্রভাব পরবর্তীকালে রোমান ও অন্যান্য সভ্যতার উপরে পড়েছিল। ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রীক সভ্যতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে প্রতিভাত হয়েছে। এই হেলেনীয় সভ্যতা পরবর্তীকালে ভারতীয় ইতিহাসেও আলেকজাণ্ডারের মাধ্যমে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। প্রাচীন গ্রীসের সমাজ ও সংস্কৃতি—সুজাত ভদ্র ও কুনাল চট্টোপাধ্যায়।

২। বিশ্বসভ্যতা—এ কে এম শাহ নওয়াজ।

৩। প্রাচীন যুগের গ্রীসের ইতিহাস—সুনীল চট্টোপাধ্যায়

৪। গ্রীসের ইতিহাস — সুপ্রতীম দাস।

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। নগররাষ্ট্র বলতে কি বোঝ? গ্রীসে নগর রাষ্ট্রের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। গ্রীক পার্সীয় যুদ্ধের গতিপথ আলোচনা কর।

৩। গ্রীক সমাজে হেলট ও পেরিকোইসদের কিরূপ অবস্থান ছিল?

৪। গ্রীক দেবতাদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। গ্রীসে সভ্যতার বিস্তার কি প্রকার হল?

৬। গ্রীক ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে টীকা লেখ।

Block / পর্যায়–৫

The birth of Classical Civilisation : Pax Romania

রোমন সভ্যতার ইতিহাস

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ রোমন সভ্যতার বিকাশ, পাত্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক (Unit-11)

২.১ ঃ এট্রুসকান

২.২ ঃ রোমান সভ্যতার বিকাশ

২.৩ ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক

৩ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আইন (Unit-12)

৩.১ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি

৩.২ ঃ রোমান আইন

৪ ঃ রোমান দাসপ্রথা ও নারীদের অবস্থান, গ্ল্যাডিয়েটর (Unit-13)

৪.১ ঃ রোমান দাসপ্রথা

৪.২ ঃ নারীদের অবস্থান

৪.৩ ঃ স্পার্টাকাস ও গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহ

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) রোমান সভ্যতার বিকাশ কেমন করে হল?

২) রোমান সমাজ সংস্কৃতি কেমন ছিল?

৩) দাস ব্যবস্থা ও দাস বিদ্রোহের প্রকৃতি কেমন ছিল?

২ ঃ রোমান সভ্যতার বিকাশ, পাত্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক (Unit-11)

২.১ ঃ এট্রুসকান

দুই লক্ষ বছর আগের প্যালিওলিথিক যুগেও সমগ্র ইতালি জুড়ে আধুনিক সভ্য মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। রোমান পূর্ববর্তী ইতালীয় জাতিসমূহ যেমন উম্ব্রিয়ান, ল্যাটিন (যারা রোমানদের কাছ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলো), ভোস্কি, সামনিট, চেলটিক এবং লিগুইররা ছিলো ইতালির উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দা, অনেকে ছিলো ইন্দো-ইউরোপীয় গোত্রের; তবে মূল ঐতিহাসিক মানুষগুলো ছিলো উত্তরাধিকারসূত্রে ইস্ট্রুস্কান, ইলিত্মিময়ান ও সিসিলীয় সিকানী এবং প্রাক-ঐতিহাসিক সার্দিনিয়ান গোত্রের।

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তদশ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে মাইসেনিয়ান গ্রিকরা ইতালির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও সপ্তম শতাব্দীতে গ্রিকরা সিসিলীয়ার উপকূলের পুরো জায়গা জুড়ে ও ইতালি উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশে মানিয়া গ্রেয়েসিয়া নামে উপনিবেশিক বসতি গড়ে তোলে। এদের সাথে ফোনেসিয়ানরাও সারদিনিয়া ও সিসিলিয় উপকূলে বসতি নিবাস স্থাপন করে। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে প্রাচীন রোমে একটি ক্ষুদ্র কৃষি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো। পুরো শতাব্দী জুড়ে মেডিটারিয়ান সাগর বেষ্টিত বিশাল সাম্রাজ্য, যেখানে আদি গ্রিক ও রোমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে এক নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো। এই সভ্যতার একটি অংশ বর্তমান আইন, প্রশাসন, দর্শন এবং কলার মধ্যেই টিকে আছে পশ্চিমীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হিসেবে।

এযুগে আল্পসের উত্তরে পার্বত্যাঞ্চল থেকে সর্বপ্রথম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর জনগণের আগমন ঘটে। পশুপালক ও পৃথিবী এই জনগোষ্ঠী ইতালিতে ঘোড়া ও ও দুই চাকাওয়ালা গাড়ি নিয়ে আসে এরা ব্রোঞ্জ সংস্কৃতির ধারক ছিল পরে এক হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সময়কাল থেকে ইতালিতে লোহার ব্যবহার শুরু হতে থাকে। ধারণা করা হয় ইটালি ও রোমের জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ ছিল এই ইন্দো ইউরোপীয় জাতি। এট্রুসকান নামে পরিচিত জাতি ইতালির ইতিহাস গড়ে তুলেছিল।

এট্রুসকানরা কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেননি, টাইবার নদীর উত্তর ও দক্ষিণে এরা বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের শহর ছিল পাহাড়ের ওপর, তাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। শহরগুলি ছিল দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। এক পাশে ছিল সমাধি ক্ষেত্র। এদের নিজস্ব বর্ণরীতি ছিল, তবে তাদের বেশি লিপি পাওয়া যায় না। রাজধানী ইত্তুরিয়াতে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল এদের সময়।

এদের শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক, অভিজাতরা রাজাকে সাহায্য করত। জনসাধারণের বেশীরভাগ মানুষ ছিলেন দাস বা ভূমিদাস। ইটালিতে বারোটি এট্রুসকান নগর জোটবদ্ধ হয়েছিল বলে জানা যায়। তারাই রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ধীরে ধীরে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করে তাদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। পরে রোমের নেতৃত্বে ইটালীয় জাতিসমূহের উত্থানে এদের পতন ঘটে।

২.২ ঃ রোমান সভ্যতার বিকাশ

আমরা এই আলোচনার আরম্ভে সমৃদ্ধ রোমান সভ্যতার কথা বলেছি। বিশ্বসভ্যতায় এক বিস্ময়কর নাম

রোমান সভ্যতা। আমাদের মনে রাখতে হবে একটি বিশেষ সময়ের, অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দী অবধি রোমান সভ্যতার নারীর জীবন পর্যালোচনা করা হয়েছে এই পর্যায়ে। রোমান সভ্যতা দুই অংশে বিভক্ত। (ক) রোমান রিপাবলিক ও (খ) রোমান সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৫০৯ সালে রোমান রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে রোমান রিপাবলিকের পত্তন হয় এবং টিকে ছিল সুদীর্ঘ ৪৮২ বছর। খ্রিস্টপূর্ব ২৭ সালে রোমান রিপাবলিকের পতন হয় যখন রোমান সিনেটের পক্ষ থেকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম শাসক জুলিয়াস সিজারকে অপরিমেয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

রোমান সাম্রাজ্য প্রাচীন রোমান সভ্যতার একটি পর্যায় ছিল, সাম্রাজ্যটি একজন সম্রাটের নেতৃত্বে থাকা সরকারের দ্বারা পরিচালিত হত এবং রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ ভূমধ্যসাগরের চারিদিকে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খ্রিঃপূঃ ১০০-৪০০ খ্রিঃ পর্যন্ত রোম পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহত্তম নগরী ছিল, এবং রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ৫০-৯০ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছিল (যা তৎকালীন সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ২০% ছিল)। এর আগে গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে রোমে বিরাজমান ৫০০০ বছরের রোমান প্রজাতন্ত্রে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। অস্থিরতার ঐ সময়ে জুলিয়াস সিজারকে স্থায়ী ডিক্টেটর বা ন্যায়পালিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪৪-তে তাকে কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যা করে। ফলস্বরূপ গৃহযুদ্ধ এবং হত্যালীলা অব্যাহত থাকে। সিজারের পোষ্য পুত্র অক্টাভিয়ান খ্রীঃ পূঃ ৩১-এ এক্টিয়ামের যুদ্ধে মার্ক এন্টনী এবং ক্লিয়পেট্রাকে পরাজিত করে। এরপর অক্টাভিয়ান অদমনীয় হয়ে উঠে এবং খ্রীঃ পূঃ ২৭-এ রোমান সিনেটে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অসীম ক্ষমতা দেয়ার সাথে অগাস্টাস উপাধি প্রদান করে যা রোমান সাম্রাজ্যের শুরুর একটি মাইফলক।

রোমান প্রজাতন্ত্র প্রায় ১৪০০ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। এর প্রথম দুই শতক রাজনৈতিক সুস্থিরতা এবং সমৃদ্ধির কারণে এদের ''রোমান শান্তি''র যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। অক্টেভিয়ানের বিজয়ের পর রোমান সাম্রাজ্যের পরিসর নাটকীয়ভাবে সম্প্রসারিত হয়। ৪১ সালে কেলিগুলার হত্যার পর সিনেটে পুনরায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রেইটোরিয়ান দেহরক্ষী বাহিনী ক্লডিয়াসকে সম্রাট ঘোষণা করে। ক্লডিয়াসের নেতৃত্বে রোমানরা ব্রিটানিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে। অক্টেভিয়ানের পর এটাই ছিল সর্ববৃহৎ রাজ্য বিস্তারের ঘটনা। ক্লডিয়াসের পরবর্তী সম্রাট নীরো ৬৮ সালে আত্মহত্যা করার পর পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হয়। গৃহযুদ্ধ এবং বিদ্রোহের (ইহুদী-রোমান যুদ্ধ) সময় চারজন সেনাধ্যক্ষকে সম্রাট ঘোষণা করা হয়। ৬৯ সালে ভেসপাসিয়ানে বিজয় লাভ করে এবং ফ্লেভিয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। তার পুত্র পরবর্তী সম্রাট টাইটাস রোমের বিখ্যাত কলোসিয়াম নির্মাণ করেন। টাইটাসের অল্প সময়ের রাজত্বের পর তার ভাই ডমিটিয়ান রোমান সিংহাসনে আরোহণ করে এবং দীর্ঘকাল রাজত্বের পর হত্যার বলি হয়। এরপর সিনেট পাঁচজন সম্রাটকে বাছাই করে। এর দ্বিতীয় সম্রাট ট্রাজানের শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়।

কমডাসের রাজত্বকালে অস্থিরতা আর পতনোন্মুখ গতি পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ১৯২ সালে তাকে হত্যা করা হয়, পঞ্চম সম্রাটের শাসনামলে। এরপর সেপ্টিমাস সেভেরাস সম্রাট হয়। ২৩৫ সালে আলেকজাণ্ডার সেভেরাসের হত্যার পর রোমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং রোমান সিনেটে মাত্র ৫০ বছরের ভিতরে ২ জন লোককে সম্রাট ঘোষণা করে। ডিয়ক্লেটিয়ানের শাসনকালে দেশ চার ভাগে ভাগ করে

প্রত্যেকটি অংশে একজন নির্দিষ্ট শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয় যার ফলস্বরূপ দেশে পুনরায় সুস্থিরতা আসলেও প্রথম কনস্টেন্টাইন-এর শাসনকালে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে এর অবসান ঘটে, এবং সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে তিনি একছত্র সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন। কনস্টেন্টাইন রোমান রাজধানী বাইজেন্টাইনে স্থানান্তর করেন এবং তার সম্মানার্থে কনস্টান্টিনোপল হিসেবে জায়গাটির নতুন নামাকরণ করা হয়। নগরীর পতনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এটি ছিল প্রাচ্যের রাজধানী। তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার পর রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে এটা গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য) বিশ্বের এক অগ্রণী শক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়। সংযুক্ত রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট প্রথম থিয়ডসিয়াসের মৃত্যুর পর ক্ষমতার অপব্যবহার, গৃহযুদ্ধ, বহিরাগত আগ্রাসন, অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা ইত্যাদি কারণে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য ক্রমশ হ্রাস পায় বলে মনে করা হয়।

২.৩ ঃ প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্ক

অভিজাত শ্রেণীর হাতে অধিক ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হওয়ায় রোমে জনগণ কর্তৃক আন্দোলন শুরু হয় এসময় রোমের জনসাধারণ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন গোষ্ঠীপতিদের বংশধর ভূস্বামী ও অভিজাতরা ছিল প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণীভুক্ত। এরা একচেটিয়াভবে সিনেটের সদস্য পদ দখল করেছিল অপরদিকে ক্ষুদ্র কৃষক ও বণিকদের সমন্বয়ে সাধারণ নাগরিকরা ছিল প্লেবিয়ান শ্রেণীভুক্ত। এরা প্যাট্রিসিয়ানদের উপর নির্ভরশীল ছিল। প্লেবিয়ানরা এদের রাজনৈতিক সমর্থন দান করতো, প্লেবিয়ানরা প্যাট্রিসিয়ানদের খামারে কাজ করত। এদের এদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হতো। সাধারণত এসেম্বলীর সদস্যভুক্তি ছাড়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের আর কোন ভূমিকা ছিল না। প্লেবিয়ানরা শোষিত হতেন। প্যাট্রিসিয়ানদের পক্ষে সহজ ছিল তাদের শোষণ করা। ঋণীগ্রহীতাকে দাস হিসেবে বিক্রি করার অনুমতি ছিল। অত্যাচারিত প্লেবিয়ানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

প্যাট্রিসিয়ানরা চাপের মুখে কিছু অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 450 খ্রিষ্টবূর্বাব্দে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। প্লেবিয়ানরা সিনেটে তাদের 10 জন প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার লাভ করে। এরা ম্যাজিস্ট্রেট নামে পরিচিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন সিদ্ধান্তের উপর ভেটো প্রয়োগ করতে পারত বলে সাধারণ মানুষের কল্যাণ বিরোধী সিদ্ধান্তের উপর ভেটো প্রয়োগ করা হতে থাকে। সাধারণ জনগণের সভা অ্যাসেম্বলি আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করে। প্লেবিয়ানদের আন্দোলনে অপর একটি সাফল্য ছিল রোমান আইনের সংকলন। এতদিন মুখে মুখে প্রচলিত আইনকে ধারাবাহিকভাবে সংকলিত করার ব্যবস্থা নেন রোমান সম্রাট। 12টি ব্রোঞ্জের পাতে এই আইন লিখিত হয়। হেবিয়াস কর্পাস নামে পরিচিত এই আইন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সাধারণ মানুষের অন্তিম বিজয় হয়েছিল নিজের শ্রেণী থেকে নির্বাচন করার অধিকার প্রাপ্তি। এছাড়াও উচ্চপদে নিয়োগ কার্যকর হয়। এভাবে রোমান প্রজাতন্ত্রে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ ক্রমে কমে আসে। খ্রিঃ পূঃ 390 অব্দের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা উন্নত হয় ফলে সরকারি কাজে সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করতে থাকে এভাবে ধীরে ধীরে অভিজাত রোমান প্রজাতন্ত্র একটি গণতান্ত্রিক চরিত্র লাভ করে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় রোমান প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য প্রতিবেশীর অধিকার খর্ব করে নাই।

৩ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং আইন (Unit-12)

৩.১ ঃ রোমান ধর্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন রোমীয় সাম্রাজ্যের লোকেদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল, তেমনই তারা বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করত। যদিও রোমীয়দের কাছে ইহুদি ধর্মকে হয়তো অদ্ভুত বলে মনে হতো, কিন্তু তারা এটাকে রিলিজিও লিকিটা অর্থাৎ এক স্বীকৃত ধর্ম বলে বিবেচনা করত আর তাই এটাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

বিভিন্ন ধরনের পৌত্তলিক উপাসনা, স্থানীয় ধর্মীয় দলগুলোর মধ্যে প্রচলিত ছিল। গ্রিক পৌরাণিক কাহিনি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল আর ভবিষ্যৎবাণী জনপ্রিয় ছিল। প্রাচ্যের তথাকথিত রহস্যজনক ধর্মগুলো ভক্তদেরকে অমরত্ব প্রদানের, সরাসরি দর্শন দানের এবং রহস্যময় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলত। এই ধর্মগুলো সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। প্রথমদিকে মিশরীয় দেবতা সেরাপিস ও দেবী আইসিস, অরামীয় মৎস্যদেবী আটারগাটিস এবং পারসিক সূর্য দেবতা মিত্র উপাসনাকারী ধর্মীয় দলগুলো রোমে জনপ্রিয় ছিল।

বাইবেলের প্রেরিত বইটি প্রাথমিক খ্রিষ্ট ধর্ম ধর্ম ছাড়াও চারিদিকে বিদ্যমান পৌত্তলিক পরিবেশ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। উদাহরণস্বরূপ, কুপ্রের (সাইপ্রাসের) রোমীয় দেশাধ্যক্ষের সঙ্গে একজন ইহুদীর যোগাযোগ ছিল। লুস্ত্রার স্থানীয় লোকেরা পল এবং বার্ণবাকে ভুলবশত ভুলবশত গ্রিক দেবতা মারকুরি (হার্মিস) ও জুপিটার (জিউস) বলে মনে করেছিল। ফিলিপীতে থাকাকালীন পল এক দাসীর মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা ছিল বা ভবিষ্যৎ বলত। আথীনীতে (এথেন্সে) প্রেরিত উল্লেখ করেছিলেন যে, এর অধিবাসীরা ''বড়ই দেবতাভক্ত।'' এছাড়, সেই নগরে তিনি একটা বেদিও দেখেছিলেন, যেটার ওপরে লেখা ছিল, ''অপরিচিত দেবের উদ্দেশে।'' ইফিষের অধিবাসীরা দীয়ানা (আর্টিমিস) দেবীর উপাসনা করত। মিলিতা দ্বীপে লোকেরা বলেছিল যে, পল ছিলেন একজন দেবতা কারণ সাপের কামড়ে তার কিছুই হয়নি। এই ধরনের পরিবেশে, খ্রিষ্টানদের সেই প্রভাবগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকার প্রয়োজন ছিল, যেগুলো তাদের বিশুদ্ধ উপাসনাকে কলুষিত করতে পারত।

রোমীয় ধর্ম ঃ তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রোমীয়রা এই নতুন দেবদেবীদের গ্রহণ করে নিয়েছিল কারণ তারা মনে করেছিল যে, তাদের দেবদেবীরাই ভিন্ন রূপে অন্যত্র বিদ্যমান। বিদেশি ধর্মীয় দলগুলোকে নির্মূল করার পরিবর্তে, রোমীয় বিজয়ীারা সেগুলো গ্রহণ করে নিয়েছিল। যার ফলে সাংস্কৃতিক একীকরণ সম্ভবপর হয়ে ছিল। এভাবে রোমের ধর্ম এর বিভিন্ন সংস্কৃতির জনসংখ্যার মতোই বিবিধ হয়ে উঠেছিল। রোমানরা একই সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করতে পারত।

রোমের আদি দেবদেবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল জুপিটার, যাকে অপ্টিমাস ম্যাক্সিমাস বলা হতো, যে-অভিব্যক্তিটির অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বমহান। তিনি নিজেকে বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতেন বলে মনে করা হতো। জুপিটারের বোন ও স্ত্রী জুনো, যিনি চাঁদের দেবী ছিলেন তিনি নারীদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নজর রাখতেন বলে কথিত ছিল। জুপিটারের কন্যা মিনার্ভা ছিলেন বিভিন্ন হস্তশিল্প, বৃত্তি, কলা ও যুদ্ধের দেবী।

রোমীয়রা বহু সংখ্যক দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। ল্যারেস এবং পিনাটেস ছিল পরিবারের দেবতা। ভেস্তা ছিলেন চুল্লির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দুই মুখবিশিষ্ট জেনাস ছিলেন সমস্ত কিছুর আরম্ভের দেবতা। প্রতিটা পেশার নিজ নিজ রক্ষক দেবতা বা দেবী ছিল। রোমীয়রা এমনকী বিশ্বাস করত যে, বিভিন্ন ধারণা, মতবাদ ও গুণাবলির জন্যও দেবদেবী রয়েছে। প্যাক্স (শান্তি), স্যালুস (স্বাস্থ্য), পুডিকিটিয়া (বিনয় ও সতীত্ব), ফিডেস (বিশ্বস্ততা), ভারটুস (সাহস) এবং ভলুপ্টাস (আনন্দকে) রক্ষা করত। রোমীয়দের প্রকাশ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটা কাজ দেবতাদের ইচ্ছাতেই সম্পাদিত হয় বলে বিশ্বাস ছিল। তাই, কোনো কাজে এক অনুকূল ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য রীতিগত প্রার্থনা, বলিদান এবং উৎসবের মাধ্যমে উপযুক্ত দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চল ছিল।

দেবদেবীদের ইচ্ছা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার একটা উপায় ছিল, শুভ-অশুভ লক্ষণ খোঁজা। এই অভ্যাসগুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল, বলিকৃত পশুর অন্ত্র পরীক্ষা করা। এইরকম মনে করা হতো, এই অঙ্গগুলোর অবস্থা ও বাহ্যিক রূপ ইঙ্গিত করে যে, দেবদেবীরা তাদের কাজকে অনুমোদন করেছিল নাকি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে, রোমীয়রা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে, তাদের প্রধান দেবদেবীরা ও গ্রিকদের নির্দিষ্ট কিছু দেবদেবী একই ছিল—জুপিটারই ছিলেন জিউস, জুনোই ছিলেন হেরা ও এইরকম আরও অন্যান্য দেবদেবী। এছাড়া, রোমীয়রা গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোকেও গ্রহণ করেছিল। এই কাহিনীগুলো কোনোভাবেই দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করত না, যাদের মানুষের মতো একইরকম দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা উপস্থাপিত করা হয়েছিলও।

সম্রাট উপাসনা ঃ অগাস্টাসের শাসনকালে (খ্রিঃ পূঃ ২৭ থেকে খ্রিঃ পূঃ ১৪ সাল পর্যন্ত) সম্রাট উপাসনা শুরু হয়। বিশেষ করে প্রাচ্যের গ্রিকভাষী প্রদেশগুলোতে, অনেকেই অগাস্টাসের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিল, যিনি দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধের পর শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনগণ এমন একজন কর্তৃপক্ষের অধীনে স্থায়ী সুরক্ষা পেতে চেয়েছিল, যাকে তারা সম্মান করত। তারা এমন একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চেয়েছিল, যা ধর্মীয় ভেদাভেদ দূর করতে, দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে এবং সেটার ''পরিত্রাতার'' অধীনে বিশ্বকে একতাবদ্ধ করতে পারবে। ফল স্বরূপ, সম্রাটকে একজন দেবতা হিসেবে দেখা হতে শুরু হয়।

যদিও অগাস্টাস জীবিত থাকাকালীন তাকে একজন দেবতা বলে ডাকতে অনুমতি দেননি কিন্তু তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, রোমের মূর্ত প্রতীক হিসেবে এক দেবী—রোমা দিয়াকে—যেন উপাসনা করা হয়। অগাস্টাসের মৃত্যুর পর তাকে একজন দেবতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এভাবে এই প্রদেশগুলোতে রোম ও সেইসঙ্গে এর শাসকদের প্রতি উপাসনা প্রদান করা ও দেশপ্রেম দেখানো হয়েছিল। এই নতুন সম্রাট উপাসনা, যা শীঘ্র সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশের এক উপায় হয়ে উঠেছিল।

ডমিশিয়ান, যিনি খ্রিঃ ৮১ থেকে খ্রিঃ ৯৬ সাল পর্যন্ত সম্রাট ছিলেন, তিনিই ছিলেন প্রথম রোমীয় শাসক, যিনি দেবতা হিসেবে উপাসনা পেতে চেয়েছিলেন। তার সময়েই, রোমানরা ইহুদিদের থেকে খ্রিস্টানদের আলাদা করেছিল এবং তাদেরকে একটা নতুন ধর্মীয় দল হিসেবে মনে করে তাদের বিরোধিতা করেছিল। সম্ভবত ডমিশিয়ানের শাসনকালেই, প্রেরিত জনকে ''যীশুর সাক্ষ্য'' প্রযুক্ত পাট্‌ম দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য বইটি জন এর নির্বাসনে থাকাকালীন লেখা হয়েছিল। এই বইয়ে তিনি আন্তিপার এর বিষয়ে উল্লেখ করেন, যিনি সম্রাট উপাসনার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পর্গামে নিহত হয়েছিলেন। সেই সময়েই হয়তো সম্রাট-শাসিত সরকার এইরকম বিষয় চালু করেছিল, যেন খ্রিষ্টানরা রাষ্ট্রীয় ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান পালন করে। এটা হোক বা না হোক, এই আলোচনার শুরুতে উল্লেখিত ট্র্যাজেনের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছিল, খ্রিঃ ১১২ সালের মধ্যে প্লিনি দাবি করেছিলেন, যেন বিথুনিয়ার খ্রিষ্টানরা এই ধরনের আচারঅনুষ্ঠান পালন করে।

তার কাছে আনা বিষয়গুলোকে প্লিনি যেভাবে মীমাংসা করেছিলেন, সেইজন্য ট্র্যাজেন প্লিনির প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে-খ্রিষ্টানরা রোমীয় দেবদেবীদের উপাসনা করতে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ''কিন্তু'', ট্র্যাজেন লিখেছিলেন, ''একজন ব্যক্তি যখন নিজেকে খ্রিস্টান বলে অস্বীকার করেন এবং আমাদের দেবদেবীর কাছে মিনতি করার দ্বারা প্রমাণ দেন যে, তিনি একজন খ্রিষ্টান নন, তখন তার অনুতাপের জন্য যেন তাকে (পূর্বের যেকোনো সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও) ক্ষমা করে দেওয়া হয়?''

রোমীয়রা এমন কোনো ধর্মের কথা কল্পনাই করতে পারত না, যে-ধর্ম এর অনুসারীদের কাছ থেকে একাগ্র ভক্তি চায়। রোমের দেবদেবীরা এইরকম একাগ্র ভক্তি দাবি করেনি, এইরকম মনে করা হতো যে, রাষ্ট্রীয় দেবদেবীর উপাসনা করা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত করত। তাই, তাদেরকে উপাসনা করতে অস্বীকার করা দেশদ্রোহিতা বলে বিবেচনা করা হতো। প্লিনি যেমন বুঝতে পেরেছিলেন, অধিকাংশ খ্রিস্টানকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছু করানোর কোনো উপায়ই ছিল না। অসংখ্য প্রাথমিক খ্রিস্টান প্রতিমাপূজারূপ সম্রাট উপাসনার পরিবর্তে বরং মৃত্যুবরণ করাকে বেছে নিয়েছিল।

৩.২ ঃ রোমান আইন

রোমান সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে রোমান আইন ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বড় অবদান হিসেবে দেখা হয়। সিনেটের সদস্যগণের সম্মতিক্রমে প্রণীত আইনগুলো রোমান সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। রোমানদের আইনব্যবস্থায় গ্রিক আইনের কিছুটা অবদান রয়েছে। গ্রিকদের ন্যায় রোমে বিশ্বাস করা হতো, আইন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ নিজের অধিকার রক্ষা করার সুযোগ পাবে। রোমানদের আইনগুলো লিখিতরূপে সংরক্ষিত থাকতো। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে সর্বপ্রথম লিখিত রোমান আইন প্রচলিত হয়। ইতিহাসের পাতায় Twelve Tables বা বারো টেবিল নামে পরিচিত সেই আইনের মাধ্যমে রোমে এক নতুন যুগের সূচনা হয়।

প্রায় বারোটি ধাপে রোমের সকল নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রণীত সেই বারো টেবিল আইনটি আজও ইতিহাসবিদ্‌গণের নিকট এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু শুরুর দিকে রোমানদের আইনগুলো কিছুটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল রাজ্যজুড়ে। ফলে সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন সম্ভব হতো না।

৫৩৪ সালে সম্রাট জাস্তিনিয়ান সর্বপ্রথম রোমান সাম্রাজ্যের সকল আইন একীভূত করার প্রকল্প হাতে নেন। বর্তমান পশ্চিমী আইনে রোমানদের পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তা মূলত সম্রাট জাস্তিনিয়ানের পদক্ষেপের

ভবিষ্যৎ ফসল হিসেবে গণ্য হয়। রোমের আইনের ক্ষমতাবলে কোনো নাগরিক সরাসরি রোমের রাজদরবারে ফরিয়াদ জানাতে পারতো। নাগরিক ব্যতীত সাধারণ জনগণের জন্য অবশ্য সেই সুযোগ ছিল না। তাদের ভরসার পাত্র হিসেবে থাকতেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ। কিন্তু মাঝে মাঝে আইনের কোপানলে পড়েই অত্যাচারিত হতো সাধারণ জনতা। অত্যাচারী শাসকগণ নিজেদের সুবিধামতো আইন প্রণয়ন করতেন। যেমন—সম্রাট ইচ্ছে করলেই কাউকে হত্যা করতে পারবেন। এজন্য তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। এর ফলে ভুক্তভোগী হতো রোমের শ্রমজীবী জনতা।

৭৫৪ খ্রিস্টপূর্বের আগে রোমে স্বেচ্ছাচারীদের দাপট বিদ্যমান ছিল। বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ করা হত। বিশৃঙ্খল রোমে ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্য তখন রোমান পণ্ডিতগণ বারো টেবিলের আইনের সূত্রপাত করেন। সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিশেষ কমিশনের তত্ত্বাবধানে সর্বপ্রথম দশ ধারার আইন প্রস্তুত করা হয়। ৪৫০ খ্রিস্টপূর্বে তখন দ্বিতীয় আইন বিষয়ক কমিশন গঠিত হলে আরো দুটি টেবিল যোগ করে মোট ১২ ধারার আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম শ্রমজীবী জনতার জন্য কিছু অধিকার এবং প্রয়োজনে বিচারের ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। বারো টেবিল আইনকে রোমান আইনি ব্যবস্থার ভিত্তি প্রস্তর রূপে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এই আইন প্রণয়নের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল রোমের সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য। রোমের অভিজাত শ্রেণীর নাগরিক ব্যতীত অন্য কেউ যোগ্যতা থাকলেও ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা এর সমতুল্য পদে আসীন হতে পারতো না। তাই অবদমিত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহ করার হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু রোমের রাজনৈতিক কাঠামোতে সেই নেতাদের অবদান ছিল অনেক। তাই সম্রাট সিদ্ধান্ত নিলেন, সবার জন্য আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে যেমন সমাজের সাধারণ নেতৃত্ব এবং জনগণের অধিকার বাস্তবায়িত হলো, তেমনি অভিজাত শ্রেণীর সাথে বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা সম্ভবপর হল।

বারো টেবিল আইন তৈরি করার পূর্বে রোমের দশজন বিশেষজ্ঞ গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে পরিভ্রমণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে তারা গ্রিসের বিভিন্ন আইন, অনুশাসন ও প্রথা নিয়ে অনুসন্ধান করেন। গ্রিক সাম্রাজ্যের বর্তমান দক্ষিণ ইতালি অঞ্চলের বিভিন্ন আইনের অনুকরণে তৈরি হয় বারো টেবিল আইন।

রোমকে প্রথম পেশাজীবী আইনজীবীদের জন্মস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। নতুন আইন ব্যবস্থা প্রণীত হলে এরা জনগণের নিকট সহজ ভাষায় তা উপস্থাপন করত। প্রাচীন গ্রিসে কিছু মানুষ আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য হতো, এরা আসামীদের আইনের বিভিন্ন নিয়ম শিখিয়ে দিতেন। বিচারকার্যে তারে আর কোনো ভূমিকা ছিল না। আসামীর নিজে থেকেই মামলায় লড়াই করতে হতো।

কিন্তু রোম গ্রিক সাম্রাজ্যে এই চমৎকার কৌশলকে আরো একধাপ এগিয়ে নিলো। রোমের আসামীরা নিজেদের হয়ে মামলা লড়তে পারতেন না। বরং আইন শিখিয়ে দেয়া মানুষগুলোই আসামীর হয়ে মামলা লড়তে পারতো। এভাবে শুরু হয় ওকালতি নামক একটি পেশা। উকিলদের অভিজ্ঞতা এবং সাফল্যের উপর ভিত্তি করে অ্যাডভোকেট, কসিদিসি (Causidici), জুরিস প্রুদেন্ত প্রভৃতি পদবী চালু হয়। আইনজীবীরা রোমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকে। ফলে খুব দ্রুত পেশাটি সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিছুদিন পর উকিলরা চড়ামূল্যের বেতন নেওয়া শুরু করলেন। এর মাধ্যমে রোমানদের অনেকেই আইনজীবীদের উপর থেকে ভরসা হারিয়ে

ফেলেন। প্রাচীন রোমে যেকোনো মামলা দুই ভাগে পরিচালিত হতো। প্রথমে সিনেটের সামনে আসামী এবং তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো একসাথে বলা হতো। তখন একজন ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত নিতেন মামলা পরিচালনা করবেন কি না।

মামলা চলাকালীন সময়ে যদি কোনোপক্ষ কোনো ভুল শব্দ উচ্চারণ করে কিংবা নিয়ম ভঙ্গ করে, সেক্ষেত্রে মামলার রায় তার বিরুদ্ধে যেত। মামলায় শুনানি এবং উকিলদের আক্রমণ, যুক্তি খণ্ডন শেষে বিচারপতি হিসেবে বিবেচনা অনুসারে একজন সিনেটর মামলায় দণ্ড প্রদান করতেন।

প্রাচীন রোমে প্রতিটি নাগরিকের পদমর্যাদা অনুযায়ী আইন ভিন্ন হতে। সাম্রাজ্যের নীতি অনুযায়ী একজন রোমান হয় নাগরিক, না হয় মুক্ত মানুষ হিসেবে সমাজে বাস করে। এমনকি পরিবার প্রধান কিংবা সদস্যদের জন্যেও ভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। রোমান জনপ্রশাসন আইন অনুযায়ী শুধু একজন রোমান নাগরিকই পারবেন সাম্রাজ্যের সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে। এখানে জানিয়ে রাখা ভালো, প্রাচীনকালে সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হতো না। এখন যেমন জন্মগতভাবে যে কেউ একটি দেশের নাগরিক হতে পারে, পূর্বে সে নিয়ম প্রচলিত ছিল না। নাগরিকরা পদমর্যাদা অনুযায়ী সিভিস, ল্যাতিনি, পেরেগ্রিনি ইত্যাদি পদবীর অধিকারী ছিলেন। বিদেশিদের জন্য রোমান সাম্রাজ্য কোনো বিশেষ সুবিধ প্রদান করতে বাধ্য ছিল না। রোমানরা সাম্রাজ্যের বাইরের যেকোনো ব্যক্তিকে 'বর্বর' হিসেবে অভিহিত করতে পারত। তাছাড়া সমাজে আরেক শ্রেণীভুক্ত মানুষ ছিল, যাদের জন্য বলতে গেলে কোনো আইন ছিল না। এরা হচ্ছে দাস শ্রেণীভুক্ত মানুষ। তবে আইন প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ দাসদের নিয়ে আনি রাখার কথা কল্পনাও করেনি।

রোমানদের সবচেয়ে ভয়ানক শাস্তি ছিল ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা। রোমান শাসকগণ সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী কিংবা দস্যুদের ক্রুশবিদ্ধ করতো। খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিস্টকেও এরা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল বলে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বাস করেন। একবার ক্রুশবিদ্ধ করা হলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দোষীকে ঝুলিয়ে রাখর বিধান ছিল। মৃত্যুর পর রোমের ক্ষুধার্ত শকুন এসে বসতো মৃতদেহের গায়ে। কখনো কখনো মরার পূর্বেই শকুনের আক্রমণে চোখ হারাতো দোষীরা। এমন পাশবিক উপায়ে শাস্তি দেওয়ার কারণে রোমান বিচারকদের কুখ্যাতি ছিল। তাছাড়া রোমে সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী সজার পরিমাণ কম বেশি করা হত। দাসরা কোনো অপরাধ করলে তাদের প্রহার করার বিধান ছিল। অনেক ক্ষেত্রে দাসদের মাথায় জ্বলন্ত লোহা দ্বারা বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে দেওয়া হতো।

রোমান নাগরিকদের সাধারণত মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো না। তবে দেশদ্রোহী নাগরিকের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। সাধারণত নাগরিকদের ক্রুশবিদ্ধ করার রীতি প্রচলিত ছিল না। নাগরিকদের জরিমানা করার বিধান ছিল। চুরির অপরাধে দোষী যেকোনো ব্যক্তি তার সামাজিক পদমর্যাদা হারাতো। এমনকি তার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি সম্রাটের আজ্ঞায় বাজেয়াপ্ত করা হতো। মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অপরাধীকে নির্বাসনে পাঠানো হতে পারত। কোনো ব্যক্তি যদি অপর আরেক ব্যক্তির সম্পত্তির কোনোপ্রকার ক্ষতিসাধন করে, সেক্ষেত্রে তাকে সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হতো।

প্রাচীন রোমান শাসন নীতি এবং বারো টেবিল আইন বাতিল হয়ে গিয়েছে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে। হয়তো বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিচার করলে রোমান আইনসমূহকে বেশ বর্বর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু

প্রাচীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন আইনগুলো যুগের আবর্তে পরমার্জিত হয়ে তা আধুনিক যুগের আইনে পরিণত হয়েছে। রোমান আইন ছিল যাত্রার শুরু। ধীরে ধীরে আইনের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অধকার ফিরে পাচ্ছে। একদিন হয়তো পৃথিবীজুড়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এর জন্য প্রাচীন রোমান আইনের পরোক্ষ ভূমিকা কখনোই অস্বীকার করা যাবে না।

তথ্যসূত্র ঃ hppts://roar.media/bangla/main/history/roman-court-how-was-ancient-roman-laws-and-order/

৪ ঃ রোমান দাসপ্রথা ও নারীদের অবস্থান, গ্ল্যাডিয়েটর (Unit-13)

৪.১ ঃ রোমান দাসপ্রথা

রোমান সমাজে সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ছিল দাস সমাজ। তাদের কোনো সামাজিক অধিকার ছিল না। এদের অধিকাংশ সময় কায়িক পরিশ্রম কাজ করান হত। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে মনে করা হয় যে, রোমানরা তাদের বিজিত রাজ্যগুলি থেকে পরাজিত যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে ব্যবহার করতেন। কার্থেজ থেকে অনেক কার্থেজের নাগরিক, ভাগ্যের পরিহাসে রোমান দাসে পর্যবসিত হল। এদের রোমান মালিক ক্রয় বিক্রয় করতে পারতেন। এমনকী গবাদি পশুর ন্যায় এই মানুষদের বাজারে কেনা বেচা চলত। নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে এদের দাম অনুসারে বিক্রয় করা হত। যুদ্ধবন্দি ছাড়াও কোন মানুষ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় নিজ স্ত্রী-সন্তানদের এমনকি নিজেকে কারও নিকট বিক্রয় করতেন, তবে স্বাধীনভাবে জন্মালেও তারা ক্রীতদাস হয়ে যেতেন।

আবার কোন ক্রীতদাস প্রভুর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হলে মুক্ত হতে পারতেন। তবে সেরকম ভাগ্যবান খুবই কম দাস হতে পেরেছিলেন। দাসদের হত্য করলে মালিকদের সেভাবে বিরাট শাস্তি পেতে হত না। কিন্তু এর বিপরীত হলে দাসদের দেওয় হত মৃত্যুদণ্ড। তখন দাসরে প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হতো। সধারণ মানুষ হত্যার চেয়ে দাস হত্যায় নাম মাত্র জরিমান ধার্য করা হয়েছিল। রোমান আইনে দাসদের ব্যক্তিস্বত্ত্বাকে অস্বীকার করা হয়। আইনানুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে দাসদের বস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো।

৪.২ ঃ নারীদের অবস্থান

রোমান সভ্যতার নারীদের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই। কেননা, তৎকালীন রোমান সমাজটি পুরুষতান্ত্রিক ছিল আর তখনকার দিনে নারীদের সম্পর্কে অধিক বিবরণ লিখিত হত না। সুতরাং বৃহৎ রোমান সাম্রাজ্যের নারীদের জীবনের তথ্যাদি সুলভ নয়। এসব কারণে প্রাচীন রোমের নারীদের জীবন সম্পর্কে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। তবে সে অনুমান অযৌক্তিক নয়। বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়েই করা। রাজনৈতিক বিষয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত, অভ্যুত্থান, দাসপ্রথা ও বিবাহ সম্পর্কে মেয়েরা কি ভাবত–সে ব্যাপারে জানার উপায় নেই। রোমান সভ্যতায় মেয়েদের নিজেদের ওপর ও সন্তানের ওপর আইনগত অধিকার ছিল না—এ বিষয়েও তারা কি ভাবত সে ব্যাপারে জানার উপায় নেই।

অভিজাত রোমান নারীর নিজের ওপর সন্তানের ওপর অধিকার না-থাকলেও নাগরিক বলে গণ্য হত। তৎকালীন রোমান সমাজে শিক্ষার অধিকার ছিল কেবল অভিজাত শ্রেণির পুরুষদের। তারা তাদের অবসর সময়ে

নিজস্ব অভিজ্ঞতাই লিখত। মেয়েদের প্রসঙ্গ এলে আত্মীয়স্বজনের কথা লিখত—যারা ছিল রোমান অভিজাত শ্রেণির। বলাবাহুল্য অভিজাত নারীরা রোমান সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র অংশ এবং অল্পবিস্তার হলেও এদের সম্বন্ধেই তথ্য পাওয়া যায়। দরিদ্র রোমান নারীদের সম্বন্ধে তেমন তথ্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যাওয়ার কথাও না। তবে অভিজাত ও দরিদ্র মেয়েদের ভূমিকা একই—সন্তান ধারণ। রোম নগরের অভিজাত মেয়েরা ছিল কার্যত বন্দি। রোমান সমাজের অভিজাত মেয়েদের বিবাহ হত ১২ বছর বয়সে। কখনও কখনও আর কম বয়েসে।

তৎকালে রোমানদের গড় আয়ু ছিল অল্প, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে। একজন রোমান নারীর জীবনধারা ছিল এরকম ঃ বিবাহ হত কম বয়েসে, মৃত্যু হত সন্তান জন্ম দানের সময় অথবা অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার সময়। ভেতুরিনা নামে এক নারীর সমাধিলিপিতে লেখা আছে ঃ ভেতুরিনার ১১ বছর বয়েসে বিবাহ হয়েছিল; সে ছিল ৬ সন্তানের জননী এবং তার মৃত্যু হয়েছিল ২৭ বছর বয়েসে। আয়ুর স্বল্পতার কারণে ক'জন শিশু বড় হবে বেঁচে থাকবে এটি নিশ্চিত ছিল না বলেই নারীকে গর্ভবতী হয়েই থাকতে হত। কর্লেনিয়া নাম এক অভিজাত রাজমাতার ছিল ১২টি সন্তান। অবশ্য মাত্র দুটি ছেলে ও এক মেয়ে বেঁচে ছিল কর্লেনিয়ার।

অভিজাত পরিবারগুলি পুত্রসন্তান আশা করত। কারণ পুত্রসন্তানই বংশের বংশের নাম ও ধারা বজায় রাখতে পারে। রোমান পুরুষেরা চাইত তাদের স্ত্রীরা যেন গর্ভধারণে বিরতি না দেয়। অবশ্য অভাবের কারণে দরিদ্র শ্রেণির নারীর অধিক সন্তান কাম্য ছিল না। পরিবারের ভরণপোষণ করতে গিয়ে অধিক আয় করতে হত। এ কারণে দরিদ্রশ্রেণির রোমান মেয়েদের বাইরে কাজ করতে হত। পরিবারটির বাস গ্রাম হলে চাষাবাদের সাহায্যের জন্য পুত্রসন্তানই ছিল কাম্য, মেয়েরা তো ঐ কাজে দুর্বল! এইপরও রোমান সমাজের অভিজাত সমাজের সঙ্গে নিম্নবর্গের নারী তফাৎ ছিল। অভিজাত সমাজের নারীদের সন্তান ছিল বেশি।

বন্ধ্যাত্ব ছিল বিবাহবিচ্ছেদের অনিবার্য কারণ। তবে সে কারণ ঘটনা ঘটলে মেয়েরাই বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করত যাতে তাদের স্বামী অন্য কারও মাধ্যমে পিতৃত্বের অধিকার অর্জন করতে পারে। সন্তানের জন্ম দেবে কি দেবে না এ বিষয়ে রোমান অভিজাত নারীদের কোনও ভূমিকা ছিল না। স্বামী নবজাতককে (এই ক্ষেত্রে যদি নবজাতকটি কন্যাশিশু হয়) লালনপালন করতে না চাইলে স্ত্রীর সে বিষয়ে বলার কিছু ছিল না। কারণ, তৎকালে সন্তানের ওপর রোমান নারীর আইনগত অধিকার ছিল না। বিয়ের সময় যৌতুক দিতে হবে আবার বংশও রক্ষা করবে না এই অজুহাতে শিশুকন্যাকে হত্যা করা হত। এ কারণে রোমের জনসংখ্যা কমে গিয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিকে রোমান সম্রাট অগাস্টাস উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আইন করে অবিবাহিত থাকাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে বিবাহ ও অধিক সন্তানের জন্মদানকে উৎসাহ দেওয়া হল।

গ্রিসের নারীদের তুলনায় রোমান নারীদের অবস্থান ছিল উন্নত। গ্রিসের নারীরা নাগরিক ছিল না। রোমের নারীরা নাগরিক ছিল না এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। মেয়েদের পুরুষের অধীন বন্দি করে রাখার নানান প্রথা ছিল রোমান সমাজে। রোমান মেয়েদের নিজস্ব নাম থাকত না। তারা পিতা নামের মধ্যাংশ ব্যবহার করত। তবে সেটিকে স্ত্রীবাচক করে নিতে হত। মেয়েদের নাম শুনেই বোঝা যেত মেয়েটির পিতা কে এবং কী তার সামাজিক মর্যাদা। মেয়েরা পরিবারেই ভিতরেই থাকত এবং তার আলাদা কোনও পরিচয় ছিল না।

মেয়ের ওপর পিতা ছিল নিরুঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ, পিতা ইচ্ছে করলে মেয়েকে দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত

কিংবা মেয়ের বিবাহবিচ্ছেদ কার্যকর করতে পারত। সন্তান থাকলেও সেই সন্তানকে ফেলে আসতে হত। সন্তানের ওপর রোমান নারীর বৈধ অধিকার ছিল না কখনও ওদের দেখতেও পেত না। বিবাহের সময় কন্যাদের সম্পদের ওপর অধিকার ছিল পিতার, অর্থাৎ মেয়েরা পৈত্রিক সম্পত্তি শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে পারত না। পুরুষের অধীনে নারীদের বন্দি করে রাখার নানা প্রথা মিছল রোমান সমাজে।

তবে, অভিজাত রোমান নারীরা সন্তানের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। শিশুদের রোমান সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নারীদের উৎসাহ দেওয়া হত। শিশুকন্যাদেরও শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল; কেননা তারাও পরবর্তীকালে সন্তানের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেবে। পুত্রসন্তান বড় হলে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এজন্য মায়েরা তাদের ছেলেদের জন্য অর্থসম্পদ ব্যয় করত। তবে 'ওপিয়ান ল' নামে একটি আইন হয়েছিল। যে আইন অনুযায়ী মেয়েরা ভোগ্যপণ্য—যেমন অলঙ্কার কিনতে পারত না। এর কারণ ছিল যুদ্ধের ব্যয় মেটানো। অবশ্য ১৯৫ খ্রিষ্টপূর্বে অর্থাৎ আইনটি প্রণয়নের ২০ বছর পর তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৫ খ্রিস্টপূর্বের পর অধিবেশন চলাকালে রোমান নারীদের রোমান ফোরামে দেখা গেল। এমন কী নির্বাচনের আগে ভোট দেওয়ার জন্য আত্মীয়দের পক্ষে প্রচার চালায়।

তা সত্ত্বেও রোমান মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। তাদের গতিবিধির ওপর বাবা কিংবা পুরুষ আত্মীয় কিংবা স্বামী নজর রাখত। রোমান সমাজে মেয়েদের মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। মদ্যপানের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। রোমান পুরুষরা মনে করত মদ মেয়েদের পরকীয়ায় উৎসাহিত করবে। তবে রোমান সমাজের অভিজাত স্তরে পরকীয়ার ঘটনা ঘটত। কেননা, বিবাহগুলি হত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশে, সেখানে প্রেম বলে কিছু ছিল না। রোমান নারীদের কখনও অনেক অধিক বেশি বয়সের লোকের সঙ্গে বিবাহ হত। আসলে যার সঙ্গে বিবাহ ঠিক করা হত একজন রোমান নারীকে তাকেই বিবাহ করতে হত।

পরকীয়া জানাজানি হলে পুরুষকে কিছু না বললেও নারীটিকে হত্যা করা হত! রোমান নাগরিক স্নানাগার ছিল চোমান সমাজের অন্যতম বিনোদনকেন্দ্র। রোমান পাবলিক স্নানাগার-এ নারীরাও স্নান করত। কেননা, রোমান জনস্নানাগারটি সব বয়সের সামাজিক শ্রেণি ও লিঙ্গের জন্য ছিল উন্মুক্ত। কখনও কখনও মেয়েদের আলাদা স্নানাগার ছিল। তা না হলে নারীরা সকালে পুরুষরা বিকালে স্নান করতে যেত।

রোমান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারত। নাগরিক স্নান ও সামাজিক নৈশভোজ ছিল উচ্চবিত্ত রোমানদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ডিনার পার্টিতে মেয়েরা স্বামীদের সঙ্গে থাকত। মেয়েরা এম্পিথিয়েটারেও যেত। সেখানে গ্লাডিয়েটর-এর যুদ্ধ ও সার্কাস অনুষ্ঠিত হতো। এমন কী নারী গ্লাডিয়েটর সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে নাট্যমঞ্চে তাদের দেখা যেত না। অবশ্য কোনও কোনও রোমান নারী অন্যদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর ছিল, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও ছিল বেশি। সার্বিক বিচারে রোমান সভ্যতায় রোমান নারীদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। একাধারে সন্তান ধারণ, মা, কন্যা ও স্ত্রী ভূমিকা। নারীদের রোমান নাগরিক মনে করা হত ঠিকই তবে ভোটাধিকার ছিল না। রাজনীতিতেও অংশ নিতে দেওয়া হত না। অবশ্য কোনও কোনও রোমান নারী অন্যদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর ছিল, তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও ছিল বেশি।

তথ্যসূত্র ঃ http://britbanglanews.com/?=5723

৪.৩ ঃ স্পার্টাকাস ও গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহ

ইতিহাসের পাতায় বীর হিসেবে আবির্ভূত স্পার্টাকাস ছিলেন মূলত একজন রোমান ক্রীতদাস। ইতিহাসের পাতায় তার শৈশব জীবন সম্পর্কে তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাই তার বিদ্রোহপূর্ব জীবনের অধিকাংশ তথ্যই অজানা। ইতিহাসবিদগণের মতে, স্পার্টাকাসের জন্ম রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত থ্রেস অঞ্চলের এক গ্রামে, আধুনিক মানচিত্রের বুকে যার অবস্থান বলকান অঞ্চলে। ধারণা করা হয়, তরুণ স্পার্টাকাস তার শক্তিশালী গড়নের কারণে রোমান সেনাবাহিনীতে চাকরি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে অজানা কারণে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।

অনেকের মতে, তিনি সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে ডাকাত দলের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তাই তাকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি রোমান সেনাদের হাতে ধরা পড়েন। চাকরিচ্যুত স্পার্টাকাসের ঠাঁই মিললো দাস বিক্রির হাটে। খুব দ্রুত তিনি এক দিনমজুর ঠিকাদারের নিকট বিক্রি হয়ে যান। বেশ কয়েক বছর ক্রীতদাস হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন করেন তিনি।

তৎকালীন রোমে শক্তিশালী ক্রীতদাসদের বাছাই করে বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ‘গ্ল্যাডিয়েটর’ নাম যোদ্ধায় পরিণত করা হতো। এই গ্ল্যাডিয়েটরদের রোমের বিভিন্ন স্থানে মল্লযুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। সেই নৃশংস ক্রীড়ায় গ্ল্যাডিয়েটররা বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষায় অন্য গ্ল্যাডিয়েটরদের হত্যা করতো। খেলার শেষে একমাত্র জীবিত গ্ল্যাডিয়েটরকে বিজয়ী ঘোষণা করা হতো। রোমের সভ্য নাগরিকগণ এই পাশবিকতাকে বিনোদন মাধ্যম হিসেবে উপভোগ করতেন। সম্রাটের সামনে যুদ্ধ হলে, তার নির্দেশ মোতাবেক পরাজিতর ভাগ্য নির্ধারিত হতো। ভাগ্যক্রমে স্পার্টাকাসও একজন গ্ল্যাডিয়েটর বিক্রেতার নজরে পড়েন। এদের রোমানরা ‘ভাটিয়া’ নামে ডাকতো। সেই ভাটিয়া স্পার্টাকাসকে ক্রয় করে ল্যাপলসের বিখ্যাত নেউস লেন্টুলুস গ্ল্যাডিয়েটর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে স্পার্টাকাস হয়ে গেলেন এক গ্ল্যাডিয়েটর যোদ্ধা। ক্রীতদাসের শেকল থেকে মুক্ত স্পার্টাকাস জড়িয়ে পড়লেন রোমান পাশবিকতার ফাঁদে।

গ্ল্যাডিয়েটর স্কুলের চার দেওয়ালে বন্দি স্পার্টাকাস খুব দ্রুত হাঁপিয়ে উঠলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি বহু সৈনিককে হত্যা করেছেন, কিন্তু এই পাশবিক হত্যাযুদ্ধ তার কাছে সম্পূর্ণ অনৈতিক লাগলো। তার ভেতরে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের আগুনি জ্বলতে লাগলো। রোমানদের স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কোনো লাভ হবে না, এ কথা তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন। তৎকালীন বিভন্ন সম্রাটরা শত চেষ্টা করেও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেননি। তবে স্পার্টাকাস ভয় পেলেন না। তিনি অন্যান্য সহযোদ্ধাদের তার আক্রোশের ব্যাপারে অবহিত করলেন। প্রাথমিকভাবে কেউ সাড়া না দিলেও একদিন এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যোদ্ধাদের সাথে প্রশিক্ষকদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে ঘটনা হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। স্পার্টাকাস এই সুযোগে প্রায় ৭৮ জন গ্ল্যাডিয়েটরকে একতাবদ্ধ করে পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষকদের উপর হামলা করে বসেন। স্কুলের বিভিন্ন অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে স্পার্টাকাস তার দলবল নিয়ে ভিসুভিসাস পর্বতের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যান।

বিখ্যাত দার্শনিক প্লুটার্কের মতে, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহী গ্ল্যাডিয়েটররা অস্ত্র হিসেবে রান্নাঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন লোহার সরঞ্জামকে বেছে নিয়েছিলো। কিন্তু পথিমধ্যে তারা গ্ল্যাডিয়েটরদের অস্ত্র বোঝাই একটি গাড়ি

আবিষ্কার করে। বুদ্ধিমান স্পার্টাকাস সেই অস্ত্র লুট করেন। এর ফলে বিদ্রোহীদের নিয়ে ছোটখাট সেনাবাহিনী গঠন করতে সক্ষম হন তিনি। স্পার্টাকাস নিজে একজন রোমান সেনা ছিলেন। তাই সেনাবাহিনীর আক্রমণের ধরণ সম্পর্কে তিনি সম্যক ধারণা রাখতেন। এই পুরো ঘটনার সময়কাল ছিল ৭৩ খ্রিষ্টপূর্ব।

স্পার্টাকাসের তত্ত্বাবধানে ভিসুভিয়াসের পাদদেশে ক্রীতদাসদের সামরিক প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ততদিনে সমগ্র রোমে স্পার্টাকাসের বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে ক্রীতদাস এবং গ্ল্যাডিয়েটররা গোপনে পালিয়ে এসে সেই দলে যোগ দিতে থাকে। দল ভারী হওয়ার পর স্পার্টাকাস তিনজন গ্ল্যাডিয়েটরকে নেতা হিসেবে নিযুক্ত করলেন। স্পার্টাকাসের সাথে তার স্ত্রী পলায়ন করেছিলো। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তার নাম সম্পর্কে কোনো ধরনের তথ্য লাভ করা যায়নি। ইতিহাসবিদ্‌রা ধারণা করেন, স্পার্টাকাসের স্ত্রী একজন থ্রেসীয় ক্রীতদাসী ছিলো। প্রাচীন পুরোহিতদের ন্যায় সে বিভিন্ন লক্ষণ বিচার করে ভবিষ্যদ্বণী করতে পারতো।

স্পার্টাকাস এবং দাস বিদ্রোহীদের পলায়নের খবর রোমান সিনেটের কাছে পৌঁছে গেলো। কিন্তু তারা দাসদেরকে শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবতে নারাজ ছিলেন। অন্যদিকে স্পার্টাকাসের বাহিনী ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী কোহর্টের সমতুল্য হয়ে উঠলো। ঠিক সেই সময় রোমের বিখ্যাত সেনারা দুটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। তাই রোমে অবস্থানরত সেনা সদস্যের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল। তবে সিনেটের বিশ্বাস ছিল রোমের সাধারণ যোদ্ধারাই পারবে স্পার্টাকাসকে হত্যা করতে। তারা গাইয়াস ক্লডিয়াস গ্লেবার নামক এক সেনাধ্যক্ষের অধীনে প্রায় তিন হাজার বৃদ্ধ এবং অপ্রশিক্ষিত সৈনিকের একটি দল প্রেরণ করে।

প্রাথমিক আক্রমণের ধাক্কায় নব্য প্রশিক্ষিত গ্ল্যাডিয়েটর এবং দাস বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। খণ্ড খণ্ড আক্রমণে বার বার পরাস্ত হতে থাকে দাসরা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্লেবার দাসদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কোণঠাসা করতে থাকেন। কিন্তু স্পার্টাকাস মনোবল হারালেন না। দিনের শেষে যুদ্ধ বিরতি পড়লো। রাত্রিকালে গোপন আক্রমণে ঘুমন্ত রোমান সৈনিকদের বিধ্বস্ত করেন। অতর্কিত হামলায় রোমান সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ওদিকে দাসরা ভিসুভিয়াসের বিভিন্ন গোপন স্থান থেকে অগ্নিতীর নিক্ষেপ করে রোমানদের শিবিরে অগ্নিসংযোগ করে। গ্লেবার কিছু সৈনিকসহ পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করেন। স্পার্টাকাস এবং তার বাহিনী রোমানদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র লুট করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে। গ্লেবার রোমে ফিরে গিয়ে অন্যান্য সিনেটরদের স্পার্টাকাসের শক্তিবলের কথা জানান। কিন্তু সিনেটররা তার কথা বিশ্বাস করলো না। সিনেটে অনেকেই তার বিরুদ্ধে কথা বলে তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আখ্যা দেয়। রোম স্পার্টাকাস দমনের উদ্দেশ্যে এবার পাঠালেন সেনাধ্যক্ষ পাবলিয়াস ভ্যারিনিয়াসকে।

ভ্যারিনিয়াস নিজের দলকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। স্পার্টাকাস পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন তার দলবল নিয়ে। ভ্যারিনিয়াস বাহিনী দাসদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। স্পার্টাকাস ছেলেখেলার মতো ভ্যারিনিয়াসকে এক ধাক্কায় ঘোড়া থেকে ফেলে অপমান করেন। তারপর স্পার্টাকাস বেশ কয়েকটি রোমান অধ্যুষিত অঞ্চল (নোরা, নুসেরিয়া, থুরি এবং মেটাপন্টিয়াম) আক্রমণ করে সিনেটরদের বাসস্থান ধ্বংস করে দেন। এসময়ে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং রাখালরা স্পার্টাকাসের বাহিনীতে যোগ দেয়। এই জয়ের মাধ্যমে স্পার্টাকাসের বাহিনীতে অশ্বরোহী বাহিনীর সংযোজন হয়। ৭২ খ্রিস্টপূর্বের শেষে স্পার্টাকাসের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি হয়েছিল।

রোমানদের অট্টহাসি এবং পরিহাস ধীরে ধীরে গুপ্ত আতঙ্কে পরিণত হয়। এভাবে হয়তো একদিন পুরো রোম স্পার্টাকাসের অধীনে চলে আসবে। কিন্তু রোমান সিনেট এই পরিণতি রুখে দিতে তৎপর হলো। এবার সিনেটররা বেশ শক্তিশালী ফৌজ গঠন করলো। সেনাবাহিনীর সেরা যোদ্ধাদের সমন্বয়ে তৈরি হলো প্রায় বিশ হাজার সদস্যের এক ফৌজ। এবার এই ফৌজকে দু'ভাগ করে রোমান কন্সাল লুসিয়াস গেলিয়াস পাবলিকোলা এবং নেয়াস কর্নেলিয়া ক্লডিয়ানাসের অধীনে ভিসুভিয়াসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হলো।

তখন স্পার্টাকাস তার সহ-অধিনায়ক ক্রিক্সাসের সাথে পুরো বাহিনী নিয়ে আল্পস পর্বতমালা অভিমুখে সফররত ছিলেন। পথিমধ্যে তারা গেলিয়াস বাহিনীর সাথে মুখোমুখি হয়। কন্সাল গেলিয়াসের সুসজ্জিত বাহিনী দুদিক থেকে স্পার্টাকাসদের ঘিরে ধরে। যুদ্ধে ক্রিক্সাস মৃত্যুবরণ করলে স্পার্টাকাস কিছুটা ভয় পেয়ে যান। দক্ষিণ দিক থেকে গেলিয়াস বাহিনী স্পার্টাকাসদের পিছু হটাতে থাকে। কিন্তু বিধিবাম! পেছনে যাওয়ারও সুযোগ নেই। কারণ, উল্টো দিক থেকে ঘিরে রেখেছে লুসিয়াস। স্পার্টাকাস শেষ সম্বল হিসেবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তার নির্দেশে দাসদের অশ্বারোহী বাহিনী পুরাদমে আক্রণণ শুরু করে। ইতিহাসের পাতায় থ্রেসীয়রা অশ্বারোহী হিসেবে সুপরিচিত। তাই তাদের অশ্বারোহীদের সামনে মুখ থুবড়ে পড়লো বোমান প্রতিরোধ।

একের পর এক রোমান সেনাবাহিনীকে হারিয়ে দাসদের আত্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠলো। তাদের সামনে আর কোনো বাধা রইলো না। স্পার্টাকাসের পরিকল্পনা ছিল আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে গাউল প্রদেশে প্রবেশ করা। গাউল প্রদেশে প্রবেশ করা। গাউল প্রদেশ রোমান সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হওয়ায় দাসরা সেখানে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে। এক অজানা কারণে পুরো বাহিনী নিজেদের গতিপথ পরিবর্তন করে পুনরায় রোমে ফেরত আসলো।

ইতিহাসবিদ্দের নিকট আজ পর্যন্ত এই ঘটনার পেছনে মূল কারণ অজ্ঞাত রয়েছে। নেতা স্পার্টাকাসের এই অদ্ভুত আচরণ সত্যিই রহস্যজনক ছিল। অনেকেই ধারণা করেন, দাসদের প্রবল আত্মবিশ্বাসের কারণে তারা পালিয়ে যেতে চায়নি। এমনকি রোমে ফিরে আসার সময় তারা বিভিন্ন রোমান প্রদেশে আক্রমণ করে এবং বিজীয় হয়। স্পার্টাকাস এবার নতুন পরিকল্পনা করলেন। তিনি পুরো বাহিনী নিয়ে মেসিনা প্রণালী অঞ্চলে অবস্থান করলেন। সেখান থেকে জলপথ পাড়ি দিয়ে শ্যামল দ্বীপ সিসিলিতে দাসদের স্বপ্নভূমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন তিনি। কিন্তু স্পার্টাকাসের এজন্য প্রয়োজন বেশ কিছু জাহাজ। পরিচালনার সুদক্ষ নাবিকেরও প্রয়োজন।

স্পার্টাকাস এবার ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন। তিনি সিসিলির জলদস্যুদের সাথে যোগাযোগ করলেন। লুট করা ভিন্ন মূল্যবান অলঙ্কার এবং মোহরের বিনিময়ে বেশ কিছু জাহাজ এবং নাবিক ক্রয় করলেন। জলদস্যুরা অল্প সময়ের মধ্যে স্পার্টাকাসকে জাহাজ এবং নাবিক প্রস্তুত করে দিবে বলে কথা দেয়। কিন্তু এক অজানা কারণে জলদস্যুরা বিশ্বাসঘাতকরা করে বসে। এর ফলে বিপদে পড়ে যায় স্পার্টাকাস। রোমান সাম্রাজ্যের আবদ্ধ ভূমিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে দাসদের ঐতিহাসিক বাহিনী।

স্পার্টাকাস সিসিলি প্রত্যাবর্তন ব্যর্থ হওয়ার পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় পেছন দিক থেকে ধাবমান হাজার হাজার রোমান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ওদিকে রোমান সেনা নেতৃত্বে আবির্ভাব ঘটলো নতুন নেতা মার্কাস লিসিনিয়াস ক্রেসাসের। স্পার্টাকাসের পরবর্তী প্রতিপক্ষ

এই ক্রেসাস রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম নিষ্ঠুর সেনাপ্রধান হিসেবে পরিচিত। এর পূর্বে স্পার্টাকাস তার অধীনস্ত দুই লিজিয়নকে পরাজিত করেছিলেন। সরাসরি নেতৃত্ব না দিলেও ক্রেসাস এই পরাজয়ে অপমানিত বোধ করেছিলেন। তাই তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মুখ ছিলেন। শাস্তি হিসেবে নিজের পরাজিত দুই সেনাধ্যক্ষকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ছাড়াও লিজিয়নের প্রতি দশজনের একজনকে জনসম্মুখে হত্যা করেছিলেন তিনি।

স্পার্টাকাস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানতেন ক্রেসাস তার সবচেয়ে সেরা বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই তিনি প্রথমেই ক্রেসাসকে শান্তি চুক্তির আহ্বান করেন। কিন্তু ক্রেসাস জানতেন তিনি দাসদের থেকে শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে এসেছেন। তাই তিনি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্পার্টাকাস বাহিনীর সীমান্তের চারদিকে দেওয়াল নির্মাণের নির্দেশ দেন। স্পার্টাকাস তাৎক্ষণিকভাবে সুড়ঙ্গের সাহায্যে পলায়ন করার চেষ্টা করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হাজার হাজার দাস সৈনিক পেছনে পড়ে যায়। এর ফলে স্পার্টাকাসের বাহিনী শক্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। দিনশেষে হতাশ স্পার্টাকাস গোধূলির রক্তাক্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবেন। কিন্তু তিনি অশনি সংকেত ব্যতীত আর কিছুই ধরতে পারেন না। ওদিকে ক্রেসাস তৃপ্তির হাসি হেসে চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

স্পার্টাকাসের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি আর পালাতে রাজি হলেন না। যেহেতু তার রোম ত্যাগ করার কোনো পথ খোলা নেই, তাই তিনি ক্রেসাসের মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার সৈনিক নিয়ে তিনি ক্রেসাসকে আক্রমণ করে বসেন। ক্যালেণ্ডারের হিসেবে সময় তখন ৭১ খ্রিস্টপূর্ব। স্পার্টাকাস দুই ধাপে আক্রমণ করার পরিকল্পনা দিলেন। প্রথম ধাপে অশ্বারোহীরা ক্রেসাসের তীরন্দাজদের আক্রমণ করবে। দ্বিতীয় ধাপে স্পার্টাকাস পদাতিক বাহিনী নিয়ে সরাসরি ক্রেসাসকে হত্যা করার চেষ্টা করবে।

কিন্তু যে উদ্যমে দাসরা যুদ্ধ শুরু করেছিলো, অচিরেই সেই উদ্যম হারিয়ে আহত সৈনিকদের আর্তনাদে পরিণত হলো। অশ্বারোহী বাহিনী তীরন্দাজদের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ হলো। ওদিকে স্পার্টাকাসের পদাতিক বাহিনী লিজিয়নদের মুহুর্মুহু আক্রমণে দিশেহার হয়ে পড়লো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্পার্টাকাস বাহিনী পরাজিত হলো। যুদ্ধে স্পার্টাকাস প্রাণ হারালেন। ঠিক কীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে অধিকাংশের মতে, তাকে শত্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছিলো। অন্যান্য দাসদের রোমান আইন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম সাহসী সংগ্রামের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। ইতিহাসবিদ্‌গণ স্পার্টাকাসের শেষ যুদ্ধকে 'তৃতীয় সারভিল যুদ্ধ' নামে চিহ্নিত করেছেন। এইভাবে স্পার্টাকাসের পতনের ফলে গ্ল্যাডিয়েটর বিদ্রোহের পরিসমপ্তি হয়।

৫ ঃ উপসংহার

এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীন রোমে একটি উন্নত সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য ইউরোপের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। রোমান সাম্রাজ্য অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সেই সময়কার সবথেকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহের অন্যতম ছিল। এটি ছিল প্রাচীনকালের এবং পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যসমূহের একটি। ট্রাজানের সময়কালে এর আয়তন ছিল ৫০ লাখ বর্গ

কিলোমিটার, যা ২১ শতকের ৪৮টি জাতিগোষ্ঠীর সম পর্যায়ের। এবং প্রায় ৭ কোটি লোকের বসবাস ছিল যা তৎকালীন বিশ্ব জনসংখ্যার ২১% ধারণ করেছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং স্থায়ীত্বই লেটিন এবং গ্রীক ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আবিষ্কার, স্থাপত্য, দর্শন এবং সরকার গঠনের বিস্তৃতি এবং স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করেছিল।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। **বিশ্বসভ্যতা ঃ** এ কে এম শাহনওয়াজ।

২। The History of the Ancient World : From the Earliest Accounts to the Fall of Rome : Susan Wise Bauer.

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। রোমান ধর্ম ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা কর।

৩। দাস বিদ্রোহের বিবরণ দাও।

Block / পর্যায়—৬

Ancient China

প্রাচীন চীন

সূচীপত্র ঃ

১ ঃ উদ্দেশ্য

২ ঃ সাং, হান ও অন্য প্রাচীন চীনা রাজবংশ (Unit-14)

৩ ঃ চীনা ধর্ম, কনফুসিয়াস, বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম (Unit-15)

৪ ঃ নারীর অবস্থান (Unit-16)

৫ ঃ উপসংহার

৬ ঃ সহায়ক প্রশ্নাবলী

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী।

১ ঃ উদ্দেশ্য

এই অংশটি অধ্যয়ন করে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ঃ

১) চীনের প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস কেমন ছিল?

২) কনফুসীয় মতবাদ কি?

৩) চীনের সমাজ চিত্র কেমন ছিল?

২ ঃ সাং, হান ও অন্য প্রাচীন চীনা রাজবংশ (Unit-14)

চৈনিক সভ্যতাকে হুয়াংহো নদীর দান বলা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে হুয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা অনেক আঞ্চলিক সংস্কৃতি চীনের সভ্যতাকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এই কয়েক হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাসে চৈনিক সভ্যতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদিমতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই কারণে মানব সভ্যতার অন্যতম সুতিকাগার রূপে চৈনিক সভ্যতা পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল থেকে চীনের শাং সাম্রাজ্যের (১৬০০ থেকে ১০৪৬ খ্রিস্টপূর্ব) আমলে লিখিত ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ যেমন 'রেকর্ড অব গ্রাণ্ড হিস্টোরিয়ান' (১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এবং 'বাম্বু এ্যানালস' এ সিয়া সাম্রাজ্য

এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকে শাং সাম্রাজ্যের আমল পর্যন্ত লিখিত কোন দলিল দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার পদ্ধতি চীনাদের অবগত ছিল না।

ঝউ রাজবংশের (১০৪৬ থেকে ২৫৬ খ্রিস্টপূর্ব) সময়কালে চীনের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দী থেকে ঝউ শাসকরা নানারকম অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সমস্যার নিকট নতি স্বীকরা করতে বাধ্য হয় এবং এক সময় সাম্রাজ্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা চীনা পরিভাষায় 'শরৎ' ও 'বসন্ত' পর্যায় (Spring and Autumn period) থেকে শুরু হয় এবং 'আন্তঃরাজ্য যুদ্ধাবস্থা' (Warring States period) এর সময়ে পূর্ণরূপ লাভ করে। এই সময়কালটি ছিল চীনের ইতিহাসের অন্যতম 'ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় শাসনকাল'। এই ব্যর্থ রাষ্ট্রীয় শাসনকালের সর্বশেষ সময়কাল ছিল ১৯২৭ সালে চীনের গৃহযুদ্ধের সময়।

বহু ক্ষুদ্র রাজ্য ও যুদ্ধবাজ শাসকদের শাসনকালে চৈনিক রাজবংশগুলো চীনের একটি অংশ শাসন করত। যার সীমানা বর্তমান জিংজিয়ান এবং তিব্বত পর্যন্ত ছিল। ২২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কিন শি হুয়াং বিভিন্ন যুদ্ধরত রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে কীন বংশের একটি ক্ষুদ্র ''সাম্রাজ্য'' (হুয়াংডি) প্রতিষ্ঠা করে, চৈনিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে শুরু করেন। পরবর্তী রাজবংশগুলো একটি জনপ্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যা ক্রমে তৎকালীন চীনের বিশাল এলাকায় চৈনিক সম্রাটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। চীনের সর্বশেষ সাম্রাজ্য ছিল কিং সাম্রাজ্য (১৬৪৪ থেকে ১৯১২), যার উচ্ছেদের পর ১৯১২ সালে রিপাবলিক অব চায়না, এবং ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত চৈনিক ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে রাজনৈতিক ঐক্য এবং অনৈক্যের চিত্র দেখা যায়, আরো দেখা যায় স্তেপ জাতি দ্বারা চীন শাসিত হবার ইতিহাস। পরবর্তীকালে যারা চৈনিক হান জাতির জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে গেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতির ও রাজনৈতিক প্রভাব, অভিবাসন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও চুক্তি ইত্যাদি আধুনিক চীনের সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা পালন করেছে।

সিয়া সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ থেকে ১৬০০ অব্দ) ঃ প্রাচীন চৈনিক শাসকদের মধ্যে সিয়া সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ থেকে ১৬০০ অব্দ) প্রামাণ্য ইতিহাস সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর তথ্যসূত্র সিমা কিয়ান এর 'রেকর্ডস অব গ্রন্ড হিস্টোরিয়ান'' ও ''ব্যাম্বু এনালস''-এ সংরক্ষিত আছে। যদিও প্রকৃতই এই রাজবংশের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল কিনা সে বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে এই রাজবংশের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিমা কিয়ান লিখেছিলেন যে সিয়া সাম্রাজ্য আনুমানিক ২২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীন শাসন ক্ষমতায় ছিল। যদিও এই তথ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়নি। অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক সিয়া রাজবংশকে এর লি থৌ এবং Henan এর সাথে সম্পর্কিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সেখান থেকে উৎখননের মাধ্যমে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালে নির্মিত একটি ব্রোঞ্জ গলানোর যন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত কিছু মৃৎপাত্রে কিছু প্রাচীন প্রতীক দেখা যায় যা আধুনিক চৈনিক অক্ষরের আদিরূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ঐতিহাসিকরা। ইয়ু দ্য গ্রেট এ বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি খাল খননের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে, এই রাজবংশ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দে মিঙতিয়াও যুদ্ধে বিলুপ্ত হয়।

শাং সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১০৪০ অব্দ) ঃ প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ নির্দেশ করে যে শাং সাম্রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১০৪৬ পর্যন্ত চীন শাসন করে। সাং শাসনামলের প্রমামসমূহ মূলত দুইটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি, Erligang, Zhengzhou এবং Shangcheng উৎস থেকে এসেছে।

চৌ রাজবংশ (খ্রিস্টপূর্ব ১০৪৬ থেকে ২৫৬ অব্দ) ঃ চৌ রাজবংশ চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে পীত নদী অববাহিকায় সাং বংশের অধিকৃত এলাকার উপর চৌ রাজবংশের উত্থান আরম্ভ হয়। একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আদলে চৌ শাসন শুরু হয়েছিল। চৌ শাসকরা সাংদের পশ্চিম দিকে বাস করত। চৌ সেনাপতিদেরকে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল। Muye এর যুদ্ধে চৌ শাসক রাজা উইউ, তার ভ্রাতা চৌ এর ডিউকের সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্য লনিয়ে সাং বাহিনীকে পরাস্ত করে। চৌ রাজা এই সময়ে তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে 'স্বর্গাদেশ' ধারণার প্রচার করেন। এ ধারণাটি তখনকার সময়ে অধিকাংশ সম্রাটকে শাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করেছিল। সাংডি মতে, স্বর্গ (tian) সকল দেবতাদের প্রধান এবং তিনিই নির্দেশ দেন কে পরবর্তী শাসক হবেন। জনমনে বিশ্বাস ছিল যে যদি ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় তাহলে নিশ্চিতভাবে সম্রাট তার স্বর্গাদেশ হারিয়েছেন। তার ফলে শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা হত, এবং তথাকথিত স্বর্গাদেশ প্রাপ্ত অন্য কোন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শাসন পরিচালনা করতেন।

শরৎ-বসন্ত যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৭২২ থেকে ৪৭৬ অব্দ) ঃ খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে, চৈনিক শরৎ ও বসন্তকালে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। এ যুগের নামকরণ করা হয় চীনে তৎকালীন প্রভাবশালী শরৎ বসন্ত ইতিবৃত্ত এর নামে। এই সময়ে, আঞ্চলিক সামরিক প্রধানরা চৌ সম্রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষমতা লাভ করার জন্য পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কিছু বহিরাগত (যেমন কিন জাতি) আক্রমণ শুরু করলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়। চৌ শাসকরা তাদের রাজধানী আরো পূর্বে সরিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে চৌ রাজবংশের দ্বিতীয় ধারা ঃ পূর্ব চৌ এর জন্ম হয়। শরৎ-বসন্ত যুগ ছিল অবিভক্ত চৌ সাম্রাজ্যের বিভক্ত হওয়ার কাল। এ সময়ে কয়েক শত ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান হয়। এই রাজ্যগুলো নামে মাত্র চৌ শাসনধীনে ছিল। তারা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনভাবে শাসন করত। কিছু রাজ্যের শাসকগণ রাজকীয় পদবীও গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার চীন ছিল এসব ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের সমষ্টি। যাদের মধ্যে কিছু রাজ্যের আয়তন একটি গ্রাম এবং একটি কেল্লার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে অনক দার্শনিক মতবারে জন মহয়। এসব মতবা বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, কনফুসীয় ধর্ম, তাও ধর্ম, লিগালিজম এবং মহিজম। তৎকালীন রাজনৈতিক ক্রমধারা ও ঘটনাপ্রবাহ আংশিকভাবে এসকল মতবাদের পিছনে কাজ করেছিল।

আন্তঃরাজ্য যুদ্ধাবস্থা (খ্রিস্টপূর্ব ৪৭৬ থেকে ২২১ অব্দ) ঃ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার পরে, খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর শেষে সাতটি প্রভাবশালী বৃহৎ রাজ্য স্বাধীন চরিত্র বজায় রেখেছিল। বেশ কিছু বছর এই সাতটি রাজ্য পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই সময়টিকে বলা হয় আন্তঃরাজ্য যুদ্ধাবস্থার যুগ বা Waring States period। খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬ পর্যন্ত স্থায়ী হলেও চৌ রাজবংশ মূলত আনুষ্ঠানিক রাজা ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা তাদের কাছে ছিল না।

এই যুগের চূড়ান্ত সম্প্রসারণ আরম্ভ হয় কীন শাসক ইং জেং এর শাসনকালে। তিনি অন্য ছয়টি শক্তিশালী রাজ্যকে একত্রিত করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২১৪ সালে তিনি পার্শ্ববর্তী আরো বেশ কিছু এলাকা, যেমন আধুনিক চীনর Zhejiang, Fujan, Guangdong এবং Guangxi তার রাজ্যভুক্ত করতে সক্ষম হন। তার সম্রাজ্যের আকার

বৃদ্ধি পায় এবং তিনি নিজেকে চীনের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন। চীনের ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম সম্রাট (কিন শি হুয়াং)।

কিন সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব ২২১ থেকে ২০৬ অব্দ) ঃ চীন তখন হান, ওয়েই, চাই, ছি, ছু এবং ইয়ান এই ছয়টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজা কিন শি হুয়াং এই ছয়টি রাজ্যকে একত্রিত করে কিন সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সফল হন। ইতিহাসে তিনি প্রথম চৈনিক সম্রাট হিসেবে পরিচিত। দুর্ধর্ষ তাতার জাতির (মোঙ্গল জাতি) হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তিনি সমগ্র চীনের উত্তরে সীমান্ত জুড়ে একটি বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যা চীনের মহাপ্রাচীর নামে পরিচিত ছিল। যদিও বর্তমানে সেই প্রাচীরের সামান্য কিছু অংশের অস্তিত্ব অবশিষ্ট আছে। কিন সি হুয়াং তার প্রধানমন্ত্রী লী সিং এর সহযোগিতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার কর। এছাড়া শি হুয়াং এর অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হল কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা, এক আইন ব্যবস্থা ও ধারা প্রণয়ন, লেখ্য ভাষার প্রবর্তন, এবং মুদ্রার প্রচলন।

পশ্চিম হান ঃ লিউ বাং হান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এক গৃহযুদ্ধে স্বল্পস্থায়ী কিন বংশের পতন হয়। হান শাসনকাল ছিল চীনের ইতহাসের স্বর্ণযুগ। হান শাসকগণ রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব ও উন্নতির পাশাপাশি পরবর্তি দুই সহস্রাব্দের জন্য চৈনিক সম্রাজ্যকে একটি কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। এই শাসনকালে প্রকৃত অর্থে 'মূল চীন' (China proper বা চীনের ১৮ প্রদেশ) চীনা সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। পশ্চিমের ভূখণ্ডও চৈনিক সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কনফুশীয়, মতবাদ সরকারিভাবে মৌলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মতবাদ চৈনিক সভ্যতার সঠিক রূপায়নে অবদান রাখে। এই শাসনামলে কলা, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন হয়। হান সম্রাজ্যের গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কারণে সমগ্র চীন জাতির মানুষ একসময় ''হান'' হিসাবে পরিচিত ছিল। এই হান জাতি বর্তমান চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী।

সিন সাম্রাজ্য ঃ ৯ম খ্রীস্টাব্দে, দখলদার ওয়াং মাং দাবী করেন যে হান বংশের উপর স্বর্গাদেশ আর বলবৎ নেই। তিনি হান শাসনামলের সমাপ্তি ও স্বল্পস্থায়ী 'সিন' (নতুন) বংশ প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দেন। ওয়াং মাং ভূমি ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পাশাপাশি দাস প্রথা রোহিতকরণ এবং ভূমি জাতীয়করণ পুনর্বন্টনসহ বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সাধারণ কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত এ সকল প্রকল্প ভূমির মালিক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও পরিবারের সমর্থন পায়নি। ক্ষমতার অস্থিরতা বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহের জন্ম দেয় সেই সাথে অনেক অঞ্চল সম্রাটের হাতছাড়া হয়ে যায়। হলুদ নদীর আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটায়; বন্যা ও পলিমাটির আস্তরণ বিশাল এলাকায় কৃষক জনগোষ্ঠীকে বাস্তুচ্যুত করে। ২৩ খ্রিস্টাব্দে একদল ক্রুদ্ধ কৃষক, ওয়াং মাংকে তার Weiyang প্রাসাদে হত্যা করে।

পূর্ব হান ঃ সম্রাট গুয়াংউ জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যে হান বংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন রাজধানী জি'য়ানের কিছু পূর্বে নতুন হান রাজধানী স্থাপন করার জন্য এই নতুন হান সম্রাজ্যের নামকরণ করা হয় পূর্ব হান বংশ। সম্রাট মিং ও জাং, আরো অধিক কর্মক্ষম প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে হানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। পাশাপশি সামরিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রচুর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হানদের হাতে জিয়ংজু সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাষ্ট্রদূত ও সেনাপতি বান চাও পামীর পর্বতের মধ্য দিয়ে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করেন সিল্ক রুটের সূচনা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সুগম হয় সেই সাথে চীনে বৌদ্ধ মতবাদের আগমন হয়।

পূর্ব হান শাসনামল ছিল প্রাচীন চীনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির কাল। বিশেষ করে কাই লুনের কাগজের আবিষ্কার এবং বহুবিদ জ্যাং হেং-এর অগণিত অবদান।

রাজ্যত্রয় (২২০ থেকে ২৮০ খ্রিস্টাব্দ) ঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভূমি দখল, বিদেশী আক্রমণ এবং বিভিন্ন গোত্র ও খোজাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদের কারণে চৈনিক সম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ১৮৪ সালে 'হলুদ পাগড়ি বিদ্রোহ' দেখা দেয়, সেই সাথে সূচনা হয় যুদ্ধবাজ শাসকদের যুগ। এসব সংঘাতের সময়, তিনটি সম্রাজ্য তাদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। এ সময়টি চৈনিক ইতিহাসে রাজ্যত্রয় (Three Kingdoms) হিসাবে পরিচিত। 'রোমান্স অব দ্যা থ্রি কিংডমস্' সাহিত্যকর্মে এসময়কার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চাও কারও ২০৮ সালে চীনের উত্তর অংশ ঐক্যবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে তার পুত্র ২২০ সালে উই বংশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন। উই এর বিরোধী শু এবং উ বংশ তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যার ফলে চীন তিনটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমশ কিন হান শাসনকালের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কিছু বৃহৎ পরিবারের হস্তগত হল।

২৬৫ সালে জিন বংশ উইদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে এবং ২৮০ সালে তারা চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে। তবে এই ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী ছিল না।

জিন সাম্রাজ্য (২৬৫ থেকে ৪২০ খ্রিস্টাব্দ) ঃ অ-হান অভিবাসীদের বিদ্রোহের পর উত্তর চীন হাতছাড়া হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা Luoyang এবং Cdhang'an দখল করে নেয়। এছাড়া রাজপরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত জিন শাসনকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলে। ৩১৭ সালে, একজন জিন রাজকুমার, নানজিং সম্রাট হন। ইতিহাসে এই নতুন সাম্রাজ্য পূর্ব জিন সম্রাজ্য নামে পরিচিত। এই সাম্রাজ্য পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল।

উত্তর চীন কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব রাজ্যের বেশীরভাগই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Xiongnu, Xianbei, Jie, Di এবং Qiang শাসকদের দ্বারা। এসব শাসকরা হান জাতিভূক্ত ছিল না। তার ছিল তূর্কী, মঙ্গল এবং তিব্বতীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

তথ্যসূত্র ঃ Wikipedia.

৩ ঃ চীনা ধর্ম, কনফুসিয়াস, বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম (Unit-15)

চীনা সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম। ধর্মাচরমের মূল আধার ছিল কিছু সামাজিক সম্পর্ক। যেগুলি হল 'সান কাং'; অর্থাৎ ১) পিতামাতা-সন্তান, ২) রাজা-প্রজা, ৩) স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে বন্ধন। এছাড়া ছিল লু-চি বা ছয় বিভাগ ১) ভাইবোন, ২) পিতা-পিতৃব্য, ৩) বংশানুক্রম, ৪) মাতা-মাতুল, ৫) শিক্ষক-ছাত্র, ৬) বন্ধু-বান্ধবী। চীনা মনীষীরা সামাজিক নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মূলত পাঁচটি নীতি যথা উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার, জ্ঞান ও সত্যবাদীতার কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়া পাঁচটি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব নীতিগত শিক্ষার মূল প্রবক্তা চীনের ইতিহাসে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি কনফুসিয়াস।

কনফুসিয়াস নামটি বিশ্বজুড়েই অনেক পরিচিত। চীনে কয়েক হাজার বছর ধরে অনেক সম্মানিত এবং আদৃত মহামানব হিসেবে স্বীকৃত হয়ে এসেছেন। কনফুসিয়াস ছিলেন একই সাথে একজন রাজনীতিবিদ, একজন কবি, একজন ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং সাধু। একই সাথে অনেক কিছুর মিশেল।

৫০১ খ্রিঃপূঃ এ ছোট্ট একটি শহরের গভর্নরের দায়িত্ব নেওয়ার মাধ্যমে কনফুসিয়াসের রাজনীতিতে প্রবেশ। তখন বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ। তার জ্ঞান এবং শিক্ষার খ্যাতি নিশ্চয়ই এর আগে থেকেই ছড়াচ্ছিল। সেই ধারাবাহিকতাতেই রাজনীতির দুনিয়াতে আরোহণ শুরু হয়েছিল। রাজনীততে খুব দ্রুতই তার মেধার পরিচয় রেখেছিলেন। এজন্য একেবারে রাজ্যের বিচারমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্রাটকে কয়েকবার রক্ষা করেছিলেন। আবার তার এই দ্রুত উত্থান সমকালীন অনেক ক্ষমতাসীনদের চোখের পীড়ার কারণ হয়েছিল। এজন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শুরু হয়েছিল। সম্রাট থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কনফুসিয়াসের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে এটা একেবারে পরিবার থেকে শুরু। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসংহত ও সুন্দর সম্পর্ক থাকলে সবচেয়ে বড় পরিবার যে রাষ্ট্র সেখানেও সে বৃহৎ পরিবারের সদস্যরা নিজেদের সাথে মিলে মিশে থাকতে পারবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিবারের শিক্ষা বৃহৎ পরিবারে অনেক কাজে লাগে। তিনি পাঁচটি নৈতিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন, যথা দান, শুচিতা, জ্ঞান, ন্যায়বোধ ও বিশ্বাস।

এজন্য একটা শিশু প্রথম বড় শিক্ষাটা পায় তার পরিবার থেকে। সেখানে পিতা-মাতার আচার-আচরণ শিশুর জীবনে প্রভাববিস্তারকারী ভূমিকা রাখে। পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর মন-মগজ-মনন ও চরিত্র গঠনের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। শিক্ষকদেরকে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা। এজন্য শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে খুব সতর্কভাবে নিজেদেরকে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হয়। কনফুসিয়াস বলেন, 'পচা কাচে নকশা করা যায় না'। এজন্য নষ্ট শিক্ষক, নষ্ট শিক্ষা কাঠামো থেকে বড় মানুষ, ভালো মানুষ বের হওয়া অনেক কঠিন।

একটা দেশের রাজনীতি ও সরকার ব্যবস্থার সাথে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সে দেশের কৃষ্টি কালচার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ভালো সরকার ব্যবস্থার জন্য এ সবকটি উপাদন একসাথে কাজ করতে হবে। জু কুং নামে এক শিষ্য কনফুসিয়াসকে জিজ্ঞেস করেছিল — 'ভালো সরকার কেমন?' এর উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন ঃ 'জনগণকে পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া, দেশের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত সৈন্য সামন্ত রাখা এবং দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করলেই তাকে ভালো সরকার বলা যাবে। এখন এ তিনটি জিনিসের মধ্যে যদি একটিকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে প্রথমে সৈন্য-সামন্তকে ত্যাগ করতে হবে। তারপর বাকি দুটোর মধ্যেও যদি একটিকে ত্যাগ করতে বলা হয় তাহলে সেটা হবে খাবার। কারণ শুরু থেকেই মানুষকে তো মরতে হবে কিন্তু জনগণের আস্থা ছাড়া কোন সরকারই টিকে থাকতে পারে না।'

তাওবাদ একটি ঐতিহ্যবাহী চৈনিক ধর্ম। ঘটনার স্বাভাবিক গতি, নিয়মিত বিবর্তন ও স্বাভাবিক পরিণতি তাওবাদের মূল বিষয়। তাও শব্দের অর্থ ''বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক উপায়'', ''পথ'' বা ''নীতি''। তাও দর্শনের উদ্ভবের কয়েক শত বছর পরে প্রাচীন চৈনিক ধর্মগুলো এই ধর্মের মতবাদগুলো গ্রহণ করেছিল। এই মতবাদ মনে করে জগতে অস্তিত্ব আছে এমন সব কিছুর পিছনেই একটি শক্তি বিদ্যমান থাকে। তাওবাদের মহাজাগতিক ধারণাটি এসেছে Yin Yaang মতবাদ থেকে।

তাও হচ্ছে প্রাচীন চীনের দর্শনের একটি মৌলিক সূত্র। তাও বলতে স্বাব, প্রকৃতি এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক বিধান বুঝাত। একে নীতির সূত্র বা আদর্শ হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। চীনের দর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'তাও' সূত্রের অর্থেরও বিকাশ ঘটেছে। চীনের ভাববাদী দার্শনিকগণ 'তাও'কে একটি ভাববাদী সূত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, আবার লাওজু, সুনজু, ওয়াংচাং প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিক তাওকে বস্তুর প্রকৃতি এবং বস্তুর পরিবর্তনের নিয়ম বা বিধান বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম চীনের বৌদ্ধ ধর্মের একটি শাখা। তা প্রধানতঃ তিব্বতী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, মঙ্গোলিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ছিংহাই প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। তিব্বতী জাতি, মঙ্গোলিয়া জাতি, ইউকুও জাতি, মেনবা জাতি, লোবা জাতি আর থুবা জাতির লোকেরা তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করে। তাদের লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ। পারিভাষা ব্যবস্থার বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দক্ষিণ পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশের সিসানপেননান তাই জাতির স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল, তেন হোন তাই জাতির চিংফু জাতির স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল আর সি মাও প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাই জাতি, পু লাং জাতি, আ ছাং জাতি আর ওয়া জাতির বেশীর ভাগ লোকেরা পালি ভাষা ব্যবস্থার বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করেন। এই ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশী। হান জাতির লোকভিত্তিক হানভাষা ব্যবস্থার বৌদ্ধধর্মালম্বী চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

Source : Wikipedia and other internet sources

৪ ঃ নারীর অবস্থান (Unit-16)

চিনের প্রাচীন সমাজে নারীদের বস্থান ছিল গৌণ। তাদের বিশেষ অধিকার কিছু ছিল ন। কনফুসিয়াসের মতে ''আনুগত্যই নারীর মূল কাজ, শৈশব কৈশোরে পিতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং বিধবা হওয়ার পর পুত্রের। এই আনুগত্য হবে প্রশ্নাতীত এবং একচ্ছত্র'' সেই খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পথটি রুদ্ধ করে দিতে চীনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অজস্র নিয়মাবলী রচনা করেছে। নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্ভাবন করেছে অসংখ্য পদ্ধতি। চীনা মেয়েদের পা ছোট করে রাখার প্রথা সেই নির্মম ইতিহাসেরই অংশ। অথচ এই অমানবিক মানবতাবিরোধী বিষয়ের প্রতি তৎকালীন চৈনিক দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ মদত ছিল এবং সেই সব দার্শনিকদের রচনা নারীদের সম্বন্ধে হীন মন্তব্যে পরিপূর্ণ। যেমন দার্শনিক কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন : A husband may marry twice, but his wife must never remarry. এভাবে নারীকে হীন এবং অধঃপতিত করে দেখালে নারীকে বিকলাঙ্গ করে রাখতে সহজ হত।

চীনে মেয়েদের পা ছোট করে রাখার প্রথা প্রচলিত হয় সুং শাসনামলে। সময়কাল-৯৬০ থেকে ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ। কারও কারও মতে অবশ্য সপ্তম শতকে এই প্রথার উদ্ভব। প্রথম প্রথম এর চর্চা ছিল সীমিত। পরবর্তীকালে অর্থাৎ দশম শতকের পর ব্যাপর হারে ছড়িয়ে পড়ে। কেবলমাত্র অভিজাত সমাজই নয়, এমনকী মধ্যবিত্ত সমাজেও পদ্মপায়ের লোভে মেয়েদের পা বিকৃত করে ফেলা হত। কেবল মাত্র নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা রেহাই পেয়েছিল। যেহেতু এদের কাজ করে খেতে হত। তিন বছর বয়েসি শিশুর পা বিকলাঙ্গ করা হত; এসময় পায়ের বাঁকা হাড় ও আঙুল ঠিক মতো বিকাশ লাভ করে না। সাধারণত শীতকালে এই বিকৃতিকরণ করা হত। এ সময় ঠান্ডায় পা জমে থাকত বলে ব্যথা কম হত। প্রথমে দুটি পা-ই উষ্ণ ভেষজ ও পশুরক্তে ভিজিয়ে নেওয়া হত। এতে পা নরম হত, আঙুলগুলি বাঁকিয়ে বেঁধে ফেলতে সুবিধে হত। এরপর যতটা সম্ভব পায়ের আঙুলের নখ

কেটে ফেলা হত। তারপর ম্যাসেজ করা হত। তুলার ব্যান্ডেজে উষ্ণ ভেষজ ও পশুরক্তে ভিজিয়ে নেওয়া হত। এরপর আঙুল ও বাঁকানো হাড় নীচের দিকে চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলা হত। ভাঙা পায়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ পেঁচিয়ে বাঁধা হত। শিশু তীব্র যন্ত্রণায় কাতরাত। মেয়েরা গোড়ালির ওপর ভর রেখে হাঁটত। পুরুষশাসিত সমাজে পা বিকৃত না করে উপায় ছিল না। কর্মহীন পায়ের মর্যাদা গড়ে উঠেছিল। পা যত ছোট তত অভিজাত। মধ্যবিত্ত সমাজেও চলত প্রতিয়োগিতা—কার মেয়ের পা কত ছোট। যদিও মেয়েরা সংসারের কাজ ঠিকঠাক করতে পারত না। বিকলাঙ্গ পায়ের জন্য নির্মিত বিশেষ জুতা। উচ্চবিত্ত সমাজে কন্যার পা ছোট না থাকলে বিয়েই কঠিন হয়ে পড়ত। তবে পা বিকৃতির মূল উদ্দেশ্য ছিল মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেলা করতে না পারে।

চিনা সমাজে কনফুসীয় এই নারী বিদ্বেষী কুপ্রথা টিকেছিল প্রায় ১০০০ বছর। ১৯১১ সালে চিনে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পর নতুন প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। তার পর এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। পথাটিকে 'চাইল্ড অ্যাবিউজ' বলে আখ্যাহিত করা হয়। তবে সে সময় যাদের পায়ের বাঁধন খুলে ফেলা হয়েছিল তা সত্ত্বেও তাদের পায়ে দীর্ঘকাল ক্ষত বহন করতে হয়েছিল। এমন কী ১৯৯০ সালেও কোনও কোনও চৈনিক বৃদ্ধার পায়ের সমস্যা ছিল।

এইভাবে দেখা যায় যে, প্রাচীন চৈনিক সমাজে যে সমাজ চিত্র পাওয়া যায়, সেখানে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তাদের কোন মর্যাদাময় স্থান ছিল না।

তথ্যসূত্র ঃ http:/sufiborshan.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

৫ ঃ উপসংহার

এইভাবে দেখা যায়, প্রাচীন চীন দেশে একটি উন্নত সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। সেই সংস্কৃতি একটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পাশাপাশি কনফুসীয় দর্শন চীনা সভ্যতার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। এ কে এম শাহনওয়াজ ঃ বিশ্বসভ্যতা

২। Immanuel Hsu : Rise of Modern China.

৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। চীনা রাজতান্ত্রিক ইতিহাস উল্লেখ কর।

২। চীনের ধর্মব্যবস্থার অপর একটি টিকা লেখ।

৩। চীনা সমাজে নারীদের অবস্থান লেখ।

৪। কনফুসিয়াস কে ছিলেন? তার বিভিন্ন মতামত সম্পর্কে কি জান?